আমার ধ্যানের ভারত

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

আমার ধ্যানের ভারত

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদের ভূমিকা সমন্বিত

শ্রীর, কু, প্রভু, কর্তৃক সঙ্কলিত

অনুবাদক
শ্রীশৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

ভূমিকা

আমরা যখন এক নূতন যুগের সন্ধিক্ষণে এসে উপনীত হয়েছি, তখন আমাদের দেশ এবং সমগ্র বিশ্বের সামনে মহাত্মা গান্ধীর ধ্যানের ভারতবর্ষের চিত্র উপস্থাপিত করা সুখের কথা। আমাদের অর্জিত স্বরাজে আমরা ভারতের ভবিষ্যৎ রচনা করা বা নষ্ট করার অধিকার পেয়েছি। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বের এ খুব নগণ্য অবদান নয়। সত্য এবং অহিংসা-রূপ যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী আয়ুধ তিনি প্রয়োগ করেছিলেন, জগতের বহুবিধ রোগের আরোগ্যের জন্য তার প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান। গান্ধীজীকে যে সমস্ত সাধন প্রয়োগ করতে হয়েছিল তাতে যথেষ্ট খুঁত ছিল এ কথা আমরা অবশ্য জানি ; তবে ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে যে, একই অবস্থায় অন্য যে কোন দেশের তুলনায় অল্পপরিমাণ আত্ম-ত্যাগে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। আয়ুধ আমাদের অনবদ্য ছিল ব'লে স্বাধীনতার ফলে যে সমস্ত সুযোগ আমরা পেয়েছি তাও তেমনি অনবদ্য। যিনি আমাদের পরিচালিত করেছেন, এবং যে শাশ্বত আদর্শ তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে, আমাদের জয়ের এবং আনন্দোৎসবের ক্ষণে তাঁকে আমরা ভুলতে পারি না। স্বাধীনতা হচ্ছে এক বৃহত্তর এবং মহত্তর আদর্শে উপনীত হবার উপায়। মহাত্মা গান্ধী যে আদর্শের জন্য কাজ ক'রে গেছেন এবং তিনি ছিলেন যার প্রতীক, তার সুষ্ঠু পরিণতি হচ্ছে তাঁর ধ্যানের ভারতবর্ষ রচনা করা। এ সময়ে তাঁর শিক্ষার ভিত্তি এবং তাঁর আদর্শের মৌলিক উপাদানের কথা আবার আমাদের মনে করিয়ে দেওয়া দরকার। শুধু এই মৌলিক নীতিই নয়, বরং কি ক'রে আমরা আমাদের স্বাধীনতা মারফৎ আদর্শ শাসনব্যবস্থা এবং সমাজ-জীবন রচনা ক'রে এ আদর্শ পরিপূর্তির সহায়তা করতে পারি এবং আমাদের শাসনতন্ত্র মারফৎ বাইরের সব বন্ধন এবং আভ্যন্তরিক বাধা থেকে মুক্ত হয়ে কি ক'রে এই বিরাট দেশের মানবীয় উপাদান আমরা এ কাজে নিয়োগ করতে পারি, এ কথা পাঠকদের কাছে যে গ্রন্থ তুলে ধরে, সবাই তাকে অভিনন্দিত করবে। গান্ধীজীর লেখা থেকে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় এবং হৃদয়গ্রাহী অংশসমূহের নির্বাচন ক'রে শ্রীর, কু, প্রভু তাঁর দক্ষতা সপ্রমাণ করেছেন এবং আমার কোন সন্দেহ নেই যে, এ বিষয়ে গ্রন্থখানি একটি প্রয়োজনীয় সঙ্কলন ব'লে বিবেচিত হবে।

নূতন দিল্লী
৮ই আগষ্ট, ১৯৪৭

রাজেন্দ্রপ্রসাদ

অবতরণিকা

এই গ্রন্থে, মহাত্মা গান্ধীর লেখা এবং বক্তৃতার অংশসমূহ একত্র ক'রে, তাঁর আদর্শের সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র ভারতের আভ্যন্তরিক ব্যবস্থা এবং দুনিয়ার অপরাপর অংশের সঙ্গে তার সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত তার মোটামুটি একটি ধারণা পাঠকদের দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। বিদেশী শাসনের যে শৃঙ্খলভার বিগত দেড় শতাব্দী যাবৎ ভারতের আত্মাকে দাসত্ববন্ধনে বেঁধে রেখে তার আর্থিক, পারমার্থিক এবং নৈতিক উন্নতিকে প্রায় ধ্বংস ক'রে ফেলেছিল, ১৯৪৭ খ্রীঃ অব্দের ১৫ই আগষ্ট ভারত তার কবল থেকে শেষ পর্যন্ত মুক্ত হতে চলেছে। অবশ্য এই স্বাধীনতা-অর্জনের প্রচেষ্টায় বহু জায়গায় তার ঐক্যে ফাটল ধরেছে, সাংঘাতিক অন্তর্দ্বন্দ্বের জন্য মারাত্মক ভাবে নিষ্পিষ্ট। স্বরাজের যে রূপ আজ রূপায়িত হয়ে উঠেছে, তা ভারতের দেশপ্রেমিক সন্তান-সন্ততির বাঞ্ছিত বা যার জন্য এতদিন ধ'রে তারা সংগ্রাম ক'রে এসেছে, সেই স্বরাজ নয়। সুতরাং এ খুবই স্বাভাবিক যে, ভারতের স্বাধীনতার জনক গান্ধীজী আসন্ন স্বাধীনতা সম্বন্ধে উদ্দীপনা বোধ করার মত বিশেষ কিছু খুঁজে পাচ্ছেন না, এবং বৈদিক ঋষিদের মত বলছেন, "আলোয় নিয়ে চল প্রভু অন্ধকারের মাঝ হ'তে"।

ভারতের মুসলমানরা যে "একটি পৃথক জাতি" এই অবাস্তব নীতি গান্ধীজী কখনও মেনে নেন নি। তিনি বলেছেন, "হিন্দুধর্ম এবং ইসলাম যে দু'টি পরস্পরবিরোধী সংস্কৃতি এবং ধর্মমত এ কথা চিন্তা করতেই আমার সমস্ত অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।" তাঁর অভিমত, "আমার কাছে এ রকম নীতি মেনে নেবার অর্থ হচ্ছে ঈশ্বরকে অস্বীকার করা ; কারণ সমস্ত অন্তর দিয়ে আমি বিশ্বাস করি যে, পবিত্র কোরাণে উল্লিখিত ভগবান এবং গীতার ভগবান এক ও অভিন্ন, এবং যে নামেই তাঁকে ডাকা হোক না কেন, আমরা সবাই সেই একই ভগবানের সন্তান। সেদিন পর্যন্ত যে-সব লক্ষ লক্ষ ভারতীয় হিন্দু ছিল, ইস্লাম ধর্ম অবলম্বন করায় যে তাদের জাতীয় সত্তা পৃথক হয়ে গেছে এ রকম মতবাদের বিরুদ্ধে আমি বিদ্রোহ ঘোষণা করব।" আজ যে ভাবে ভৌগোলিক বা সাংস্কৃতিক দিক থেকে ভারত-ব্যবচ্ছেদের প্রচেষ্টা চলছে, সেই রকম যে বরাবর থাকবে এ কথা বিশ্বাস করতে তিনি নারাজ। তিনি বলেন, "দু'টি সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত করলেই ভারতে দু'টি জাতির সৃষ্টি হয় না।" এই বিশ্বাস নিয়ে তিনি বেঁচে আছেন এবং কাজও ক'রে যাবেন যে, ঐক্যের

পথে বিদেশী শাসকবর্গ কর্তৃক প্রোথিত কীলক-রূপ সর্বাপেক্ষা দুরূহ বাধা অপসারিত হওয়া মাত্র এবং বর্তমানে তার প্রতি যে সমস্ত আঘাত হানা হয়েছে তার আরোগ্য হওয়া মাত্র, অদূর ভবিষ্যতে তাঁর ধ্যানের ভারতবর্ষ বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করবে।

এই গ্রন্থের সঙ্কলনকর্তা তাঁর সামনে যে কি কঠিন কর্তব্যভার এবং নিজের যোগ্যতাও যে কত কম, তা জানেন এবং এও জানেন যে, এ রকম ভাবে পাঠক বর্গের কাছে "গান্ধীজীর ধ্যানের ভারতবর্ষের" ছবি তুলে ধারার দায়িত্বও কত গভীর। ভাল ভাবেই তিনি এ কথা জানেন যে, "ইয়ং ইণ্ডিয়া" এবং "হরিজনে"র পাতায় পাতায় এবং তাঁর অন্যান্য লেখা এবং বক্তৃতায় শিল্পী-সম্রাট্ যে চিত্র অঙ্কিত করেছেন, তার তুলনায় এ হবে কত অকিঞ্চিৎকর। গান্ধীজীর নিজেরই ভাষায় সেই চিত্রের সংক্ষিপ্ত রূপ দেওয়া হয়েছে ব'লে সঙ্কলনকর্তা আশা করেন যে, হয়ত সত্যের খুব বেশী অপলাপ করা হয়নি। এ সত্ত্বেও এই গ্রন্থে যে সব ত্রুটিবিচ্যুতি রয়ে গেছে তার জন্য সঙ্কলনকর্তা গান্ধীজী ও পাঠকবর্গ উভয়ের কাছে সত্য সত্যই ক্ষমাপ্রার্থী।

র, কৃ, প্রভু
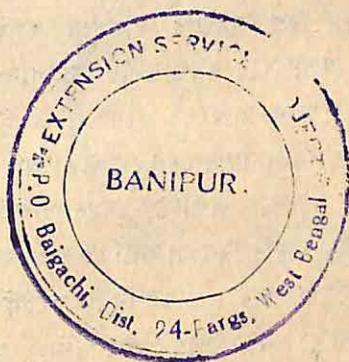
দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

হিংসাজর্জর বিশ্ব আজ শান্তিপিয়াসী। একথা বলা বোধ হয় অত্যুক্তি নয় যে, শান্তির আকূতি কোন রাষ্ট্র বিশেষের একচেটিয়া কৃতিত্ব নয়। পৃথিবীর তাবৎ জনগণই আজ সত্যকার শান্তিকামী। তবে চিরকালই এরকম অবস্থা ছিল একথা জোর ক'রে বলা যায় না। কারণ, একদা শান্তিবাদ বা অহিংসা কোন কোন মহল থেকে গান্ধীজীর মত "ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিবিদ্‌দের অপৌরুষ গোপন করার ছদ্মাবরণ" রূপে ধিক্কৃত হয়েছিল। চরম অহিংসাবিরোধী এবং হিংসা অর্থাৎ পশুবলকে রাজনীতি তথা বিজ্ঞানের উদ্বর্তনের এক প্রেরক-শক্তির মর্যাদা দিয়ে হিংসার দর্শন ও শাস্ত্র রচনাকারী এবং তার নৈষ্ঠিক অনুগামীরাও আজ ঘটনাচক্রে যে শান্তি ও অহিংসার জয়গান করেছেন এবং এ যুগের শ্রেষ্ঠ অহিংসা-ঋত্বিক গান্ধীজীর জীবন-কথা রচনায় পূর্বে যে ভ্রান্তি হয়েছিল, তার সংশোধন করেছেন—এর পিছনেও ইতিহাসের এক অমোঘ বিধান প্রচ্ছন্ন রয়েছে।

একদিকে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে অনুষ্ঠিত দু'টি ভয়াবহ বিশ্বসমরের স্মৃতি ও নিত্য নবীন মারণাস্ত্রের আবিষ্কার, অন্যদিকে ক্ষীণ মাত্রাতে হ'লেও মানুষের বিবেক-বোধের ক্রমবিকাশ হিংসার উপর মানুষের আস্থা টলিয়ে দিয়েছে। তবে লক্ষ্যে উপনীত হবার উপযুক্ত সক্রিয় কার্যক্রম ছাড়া কেবল শুভেচ্ছা বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। কারণ, শান্তি চাওয়া ও হিংসার উপর আস্থা হারানোর অর্থই শান্তি বা অহিংস সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়া নয়।

এ ছাড়া বিশ্ব সমস্যার সমাধান শান্তিময় পদ্ধতিতে করতে চাইলে আমাদের অভ্যন্তরীণ সমস্যাবলীর সমাধানও একই পন্থায় করতে হবে। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে অহিংসা কার্যকরী না হ'লে বৃহত্তর অর্থাৎ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কোন সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অহিংসায় আছে ব'লে বিশ্ব বিশ্বাস করবে না। সুতরাং, একদিকে যেমন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অহিংসার মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি বিশ্ব-রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে অহিংসার উদ্গাতা ভারতবর্ষের দায়িত্বও বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু বিগত কয়েক বৎসরের ঘটনাবলী দেখে একথা বলা চলে না যে, অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে আমরা তুল্য ভাবে অহিংসার অনুশীলন করতে সমর্থ হয়েছি। পক্ষান্তরে জাতির গুরু আমাদের যে আয়ুধের সন্ধান দিয়েছিলেন এবং যে পন্থা গ্রহণ করার জন্য বিশ্বসভায় ভারতের মর্যাদা জাদু-মন্ত্রের মত বৃদ্ধি পেয়েছে, আমরা যেন ক্রমশঃ তার কথা বিস্মৃত হচ্ছি। দেশের

বিভিন্ন কোণে হিংসা-শক্তি মাথা তুলেছে। এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে অহিংসার মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি, এযুগের শ্রেষ্ঠতম শান্তিবাদী-কর্মযোগী গান্ধীজীর রচনাবলীর আলোক আত্ম-বিশ্লেষণ ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্দ্ধারণে নিঃসন্দেহেই সহায়ক হবে।

শোনা যায়, বাংলাদেশ কোন দিন গান্ধীজীকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করেনি। একথা হয়ত সত্য। কিন্তু গান্ধীজীর এই ছোট্ট গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হ'তে দেখে মনে আশা জাগছে যে, সম্ভবতঃ বাংলাদেশে গান্ধীজীকে জানার আগ্রহ প্রকট হচ্ছে। পূর্বসংস্কার-চালিত হয়ে গান্ধীজীর রচনাবলী পাঠ করার পূর্বে অযৌক্তিক ভাবে তাঁর মন ও পথকে নস্যাৎ করার পরিবর্তে তাঁকে জানার প্রচেষ্টা একটি সুলক্ষণ—এতে সন্দেহ নেই। যুক্তি এবং আবেগ দুই দিক থেকেই গান্ধীজীর আহ্বান অপ্রতিরোধ্য। তাই জানা শুরু হ'লে অনুগমন হবেই—এই বিশ্বাসে বাঙ্গালী পাঠক-সমাজের কাছে এই গ্রন্থের নবীন সংস্করণ উপস্থাপিত করা হ'ল।

শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
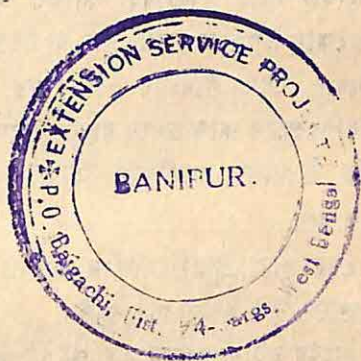
তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

আমার ধ্যানের ভারত-এর প্রথম ইংরাজী সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট। বাঙলার প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ তারই অনুবাদ। কিন্তু তারপরও গান্ধীজী আরও পাঁচ মাস জীবিত ছিলেন এবং তাঁর জীবনের এই শেষ পর্যায়ে তিনি তাঁর জীবনব্যাপী সাধনার উত্তুঙ্গ শিখরে উঠেছিলেন। সুতরাং ভারতবর্ষ ও তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি এই সময় বহু নূতন সত্য উপলব্ধিও ব্যক্ত করেন।

মূল ইংরাজী গ্রন্থের সঙ্কলক শ্রীযুক্ত প্রভু তাই তাঁর সর্বশেষ রচনাবলী সহ গ্রন্থের নূতন একটি সংস্করণ নবজীবন ট্রাস্টের কর্তৃপক্ষের সহায়তায় ১৯৫৯ খ্রীস্টাব্দের প্রথমে প্রকাশ করেন। এতে পূর্বতন সংস্করণের আদ্যোপান্ত সংস্কার করা ছাড়াও বহু নূতন বিষয় ও প্রসঙ্গ সঙ্কলিত হয়। আমার ধ্যানের ভারত-এর তৃতীয় সংস্করণ পূর্বোক্ত সঙ্কলন অবলম্বনে রচিত। সুতরাং নামে তৃতীয় সংস্করণ হলেও এটি প্রায় আদ্যোপান্ত পুনর্লিখিত একটি নূতন গ্রন্থ। ভারতবর্ষ ও তার ভবিষ্যৎ রূপ সম্বন্ধে গান্ধীজীর রচনা ও উক্তির মোটামুটি পূর্ণাঙ্গ সঙ্কলন এটি। তবে অত্যধিক কলেবরস্ফীতির আশঙ্কায় কোন কোন স্থানে ঈষৎ সম্পাদনা করা হয়েছে এবং গান্ধীজী কর্তৃক আলোচিত যে সব বিষয় বর্তমানে অপ্রাসঙ্গিক, তাও বর্জন করা হয়েছে। তবুও তৃতীয় সংস্করণ প্রথম ও দ্বিতীয়ের প্রায় দ্বিগুণ।

একটি কথা। কলেবর স্ফীতির আশঙ্কাতে অনূদিত পঙক্তিগুলি গান্ধীজী কবে কোন্ উপলক্ষে বলেছিলেন বা লিখেছিলেন, সেই রেফারেন্স বর্জন করা হয়েছে। এতে সাধারণ পাঠকদের অসুবিধা না হলেও গবেষক এবং অনুসন্ধিৎসুদের কাজ চলবে না। তাঁদের তাই রেফারেন্স-এর জন্য নবজীবন কর্তৃক প্রকাশিত গান্ধীজীর "ইণ্ডিয়া অফ মাই ড্রিমস" পুস্তকটির সাহায্য নিতে হবে।

স্নেহাস্পদ শ্রীমান সত্যেন মাইতি প্রুফ দেখায় সাহায্য করেছেন। এই অবকাশে তাঁর ঋণ স্বীকার করি।

পূর্বের দুটি সংস্করণের মত এটিও পাঠকসমাদৃত হলে আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বুঝব।

৩০।১।৬৫

অনুবাদক

সূচীপত্র

আমার ধ্যানের ভারত	...	১
পূর্ণ স্বরাজ	...	৪
জাতীয়তাবাদের সপক্ষে	...	৮
ভারতে গণতন্ত্র	...	১০
ভারত এবং সমাজতন্ত্রবাদ	...	১৪
ভারত ও সাম্যবাদ	...	১৮
যান্ত্রিকতার অভিশাপ	...	২৩
শ্রেণী সংগ্রাম	...	২৫
ধর্মঘট	...	২৭
অধিকার না কর্তব্য	...	২৯
বেকারদের সমস্যা	...	৩২
দরিদ্র-নারায়ণ	...	৩৫
শরীর-শ্রম	...	৩৮
সর্বোদয়	...	৪১
সর্বোদয়ী রাষ্ট্র	...	৪৩
অহিংস অর্থব্যবস্থা	...	৪৬
ন্যাসবাদ	...	৪৯
সত্যাগ্রহ ও দুরাগ্রহ	...	৫২
ভূমিকর্ষণকারী	...	৫৫
গ্রামে ফিরে যাও	...	৫৮
প্রতিটি গ্রামে একটি সাধারণতন্ত্র	...	৬১
পঞ্চায়েত রাজ	...	৬৩
চরখার গান	...	৬৫
গ্রামীণ শিল্প	...	৭০
সরকার কি করতে পারে	...	৭৪
স্বদেশীর বাণী	...	৭৫

গ্রামের সাফাই ... ৮১
যুবশক্তির প্রতি আহ্বান ... ৮৩
পানাশক্তির অপকারিতা ... ৮৬
ইংরেজীর স্থান ... ৮৮
নয়ীতালিম ... ৯১
ভাষা সমস্যা সম্বন্ধে ... ৯৩
প্রাদেশিক ভাষাসমূহ ... ৯৭
রোমান লিপি ... ১০০
ছাত্রদের প্রতি ... ১০২
নারীদের প্রতি ... ১০৬
জন্ম-নিয়ন্ত্রণ ... ১১২
সাম্প্রদায়িক ঐক্য ... ১১৪
অস্পৃশ্যতার অভিশাপ ... ১১৮
আর্থিক বনাম নৈতিক প্রগতি ... ১২০
প্রশাসনের সমস্যা সম্বন্ধে ... ১২৭
সংখ্যালঘু সমস্যা ... ১৩২
সংবাদপত্র ... ১৩৪
শান্তিসেনা ... ১৩৬
ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ... ১৪০
শেষ ইচ্ছা ... ১৪২
ভারত ও পাকিস্তান ... ১৪৪
ভারত এবং বিশ্বশান্তি ... ১৪৭
বিবিধ ... ১৫০

॥ এক ॥

আমার ধ্যানের ভারত

ভারতের সব কিছুই আমাকে আকর্ষণ করে। উচ্চাভিলাষসম্পন্ন একজন মানুষের যা কিছু কাম্য থাকতে পারে, তার সবই এখানে আছে।

ভারত মুখ্যত কর্মভূমি, ভোগভূমি নয়।

ভারত হচ্ছে দুনিয়ার সেই সব অল্পসংখ্যক রাষ্ট্রের মধ্যে অন্যতম, যারা তাদের প্রাচীন বিধি-ব্যবস্থার কিছু কিছু—তা ভ্রান্ত এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন হলেও—আজ পর্যন্ত বজায় রেখেছে। তবে ভ্রান্তি বা কুসংস্কার থেকে মুক্ত হবার স্বাভাবিক ক্ষমতার পরিচয়, অদ্যাবধি ভারত দেখিয়েছে। ভারতের লক্ষ লক্ষ জনসাধারণের সম্মুখে যে অর্থনৈতিক সমস্যা বর্তমান, তার সমাধান করার যোগ্যতা যে তার আছে এ বিষয়ে আমার বিশ্বাস পূর্বাপেক্ষা আজ দৃঢ়।

আমার মনে হয়, ভারতের আদর্শ অন্যের মত নয়। পৃথিবীতে ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপনা করার কাজে ভারতই উপযুক্ত। স্বেচ্ছায় এই দেশ যে আত্মশুদ্ধির পথ বেছে নিয়েছে, দুনিয়াতে তার তুলনা নেই। ইস্পাতে তৈরী অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজন ভারতের বিশেষ নেই। ঐশী শক্তির অস্ত্রে ভারত সংগ্রাম করে এসেছে ; এবং এখনও ভারত তা করতে পারে। অন্যান্য জাতিসমূহ পশুশক্তির উপাসক······ভারত আত্মার শক্তিতে সবকিছু জয় করতে পারে। আত্মার শক্তির কাছে পশুশক্তি যে তুচ্ছ তার বহু প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া যায়। কবি তার জয়গাথা গেয়েছেন এবং ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টাগণ স্বীয় অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে গেছেন।

জঙ্গী নীতি গ্রহণ করলে ভারত সাময়িক জয়লাভ করতে পারে। সে অবস্থায় ভারত আর আমার হৃদয়ের গৌরব স্বরূপ হয়ে থাকবে না। সব কিছুই আমি ভারতবর্ষের কাছ থেকে পেয়েছি বলে আমি তার সঙ্গে এত দৃঢ়সংলগ্ন। আমি নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করি যে, ভারত দুনিয়াকে এক নূতন বাণী শোনাবে। ইউরোপকে অন্ধভাবে ভারত অনুকরণ করবে না। ভারত জঙ্গী নীতি গ্রহণ করলে, সে হবে আমার পক্ষে এক পরীক্ষার মুহূর্ত। আমার বিশ্বাস, সে সময় আমার ভিতর দুর্বলতা দেখা দেবে না। আমার ধর্মের

কোন ভৌগোলিক সীমারেখা নেই। কর্তব্যে আমার স্থির বিশ্বাস থাকলে, আমার ভারতবর্ষের প্রতি ভক্তিকেও সে অতিক্রম করবে। অহিংসা-ধর্মের দ্বারা ভারতবর্ষের সেবা করার জন্যেই আমার জীবন উৎসর্গীকৃত।

আমার জীবিতাবস্থায় হিংসাকে যদি ভারত তার নীতি হিসাবে গ্রহণ করে, তবে ভারতে বাস করার জন্য আমি মোটেই আগ্রহ প্রকাশ করব না। ভারত আর আমার মনে শ্লাঘা সৃষ্টি করতে পারবে না। ধর্মের পর হচ্ছে দেশপ্রীতির স্থান। আধ্যাত্মিক ক্ষুধার প্রয়োজনীয় খোরাক জোগায় বলে মাতৃবক্ষসংলগ্ন শিশুর মত ভারতকে আমি আঁকড়ে থাকি। তার পারিপার্শ্বিকতাকে আমি সর্বাপেক্ষা প্রশংসা করি। সে বিশ্বাস লুপ্ত হলে নিজেকে ভবিষ্যতে অভিভাবককে খুঁজে পাবার আশা বিরহিত অনাথ বালকের মত মনে হবে।

ভারতকে আমি স্বাধীন এবং শক্তিশালী এইজন্য দেখতে চাই, যেন জগতের উন্নতিকল্পে ভারত স্বেচ্ছায় পবিত্র মনে নিজেকে উৎসর্গ করতে পারে। ভারতের স্বাধীনতার ফলে সংগ্রাম ও শান্তি সম্পর্কীয় বিশ্বের দৃষ্টিভঙ্গীতে বিপ্লব এনে দিতে হবে। তার ক্লৈব্যের কুপ্রভাব সমগ্র মানবজাতির উপর পড়েছে।

পশ্চিম থেকে অনেক কিছু আমরা লাভজনকভাবে আত্মীকৃত করতে পারি—একথা স্বীকার করার মত বিনয় আমার আছে। জ্ঞান কোন এক বিশেষ দেশ বা জাতির একচেটিয়া বস্তু নয়। আমার পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রতিরোধ প্রয়াস আসলে একটি বিশিষ্ট মানসিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। এই মানসিকতা মনে করে যে, যা কিছু পশ্চিম থেকে আসে এশিয়ার লোকের কর্তব্য হল নির্বিচারে ও বুদ্ধিপ্রয়োগ না করে তার অন্ধ অনুকরণ করা।...আমি অবশ্যই বিশ্বাস করি যে দুঃখ-কষ্ট বরণরূপী অগ্নিপরীক্ষার ভিতর দিয়ে যাবার মত ধৈর্য যদি ভারতবর্ষের থাকে এবং তার যে সভ্যতা অপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও অদ্যাবধি মহাকালের ধ্বংসলীলার মধ্যেও টিকে আছে, তার প্রতি যাবতীয় বেআইনী আঘাতকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা যদি তার থাকে তাহলে বিশ্ব-শান্তি ও পৃথিবীর যথার্থ প্রগতির ব্যাপারে এ দেশ স্থায়ী অবদান রেখে যেতে পারবে।

যে রক্তাক্ত পথ অবলম্বন করার জন্য পাশ্চাত্ত্যের দেহে আজ ক্লান্তির চিহ্ন সুপরিস্ফুট, সে পথ ভারতের নয়। সরল এবং সাদাসিধে জীবনযাত্রার ভিতর দিয়ে যে পথে বিনা রক্তপাতে শান্তি আসে, সেই হচ্ছে ভারতের পথ। আত্মার

বিনষ্টির আশঙ্কা ভারতের সম্মুখে বিদ্যমান। আত্মাকে ধ্বংস করে ভারত বাঁচতে পারে না। ভারত যেন অসহায় এবং অলসভাবে না বলে—'পাশ্চাত্ত্যের অভিযানকে বাধা দিতে পারছি না।' নিজের এবং সারা বিশ্বের জন্য একে প্রতিরোধ করার শক্তি তার থাকা দরকার।

ইউরোপের সভ্যতা নিঃসন্দেহে ইউরোপীয়দের উপযোগী। তবে আমরা যদি তার অনুকরণ করতে যাই তবে ভারতবর্ষের ধ্বংস অনিবার্য। তবে একথার অর্থ এ নয় যে তাদের মধ্যে যা কিছু ভাল এবং যা আমাদের পক্ষে আত্মীকরণ সম্ভব, তা আমরা গ্রহণ করব না। আর ইউরোপীয়দের মধ্যে যে যে খারাপ জিনিসের অনুপ্রবেশ ঘটেছে, তা তাঁরা বর্জন করবেন না, এমন কথাও বলা হচ্ছে না। ঐহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য প্রাপ্তির জন্য অবিরত চেষ্টা এবং ক্রমাগত ভৌতিক প্রয়োজনীয়তা বাড়িয়ে যাওয়া ইউরোপীয় সভ্যতার এমনি এক খারাপ দিক এবং সাহস করেই আমি একথা বলতে চাই যে তাঁরা যে সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ক্বতদাসে পর্যবসিত হচ্ছেন, তার চাপে যদি মৃত্যু বরণ করতে না চান তাহলে ইউরোপীয়দের নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গীরই পরিবর্তন সংসাধন করতে হবে। আমার ধারণা ভ্রান্ত হতে পারে, তবে আমি একথা জানি যে ভারতবর্ষ যদি স্বর্ণ মরীচিকার পশ্চাদ্ধাবন করে তবে তার মরণ অনিবার্য। পশ্চিমের এক দার্শনিক যে "সরল জীবনযাত্রা ও উচ্চ চিন্তা"—এর নীতির কথা বলে গেছেন তা আমাদের হৃদয়ে খোদাই করে রাখতে হবে। আজ একথা অবধারিত যে দেশের অগণিত জনসাধারণ উচ্চমানের জীবনযাত্রার স্বাদ পাচ্ছে না আর আমাদের মত যে সব মুষ্টিমেয় ব্যক্তি যারা দাবি করি যে জনসাধারণের হয়ে আমরাই উচ্চ চিন্তা করছি তারাও উচ্চমানের জীবনযাত্রার পিছনে অনর্থক ছুটে মরার ফলে উচ্চ চিন্তা থেকে দূরে সরে যাই।

এমন এক শাসনতন্ত্র কায়েম করার আমি চেষ্টা করব, যার ফলে ভারত সব রকম দাসত্ব এবং অভিভাবকত্বপাশ থেকে মুক্তি পাবে এবং প্রয়োজন হলে ভারতকে পাপ করারও অধিকার দেবে। এমন এক ভারত সৃষ্টি করার জন্য আমি কাজ করে যাব, যেখানে দরিদ্রতমও অনুভব করবে যে এ তারই দেশ এবং এর উন্নতির পথে তার মতামতও যথাযোগ্য মর্যাদা পাবে; এমন এক ভারত, যেখানে মানুষের মধ্যে উচ্চ-নীচের ভেদাভেদ থাকবে না এবং যেখানে সকল সম্প্রদায় সম্পূর্ণ সৌহার্দ্যের মধ্যে বসবাস করবে। এই ভারতে অস্পৃশ্যতার অভিশাপ বা সুরা ইত্যাদি মাদকদ্রব্যের স্থান নেই। নারী,

পুরুষের সমান অধিকার ভোগ করবে। বিশ্বের অপরাপর অংশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক হবে শান্তিপূর্ণ, আর আমরা অপর কাউকে শোষণ করব না বা কারও দ্বারা শোষিত হব না বলে আমাদের সৈন্যবাহিনী হবে যথাসম্ভব ক্ষুদ্র। কোটি কোটি মূক জনসাধারণের হিতের পরিপন্থী না হলে, ভারতীয় কিংবা অভারতীয় স্বার্থসমূহকে সততার সঙ্গে যোগ্য মর্যাদা দেওয়া হবে। বিদেশী এবং ভারতীয়দের মধ্যে পার্থক্য রাখা আমি ব্যক্তিগতভাবে অপছন্দ করি।···এই আমার ধ্যানের ভারতবর্ষ···অন্য কিছুতেই আমি সন্তুষ্ট হব না।

॥ দুই ॥

পূর্ণ স্বরাজ

'স্বরাজ' শব্দটির উদ্ভব বেদ থেকে এবং এ অতি পবিত্র শব্দ। কখন কখন স্বাধীনতা অর্থে সংযমের সকল বন্ধন থেকে মুক্তি মনে হতে পারে, স্বরাজের অর্থ কিন্তু তা নয়। এর অর্থ হচ্ছে স্বায়ত্ত-শাসন এবং আত্মসংযম।

নরনারী-নির্বিশেষে, দেশীয় বা আত্মীয়ভাবে বসবাসকারী বিদেশীয়, প্রত্যেক সাবালক, যাঁরা রাষ্ট্রের সেবার জন্য শারীরিক শ্রম দান করেন এবং নিজের নাম মতদাতাদের (ভোটারের) তালিকায় লিপিবদ্ধ করেছেন, তাঁদের সংখ্যাধিক্যের মতামত দ্বারা নির্বাচিত ভারতীয় সরকারকে আমি স্বরাজ নামে অভিহিত করি। কয়েকজন ক্ষমতা দখল করলেই খাঁটি স্বরাজ আসবে না। সকলে ক্ষমতার অপব্যবহার প্রতিরোধ করার শক্তি অর্জন করলে তবেই আসবে স্বরাজ। অর্থাৎ, ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত করার শক্তি সম্বন্ধে সচেতন করার শিক্ষা জনসাধারণকে দেওয়ার মারফৎই স্বরাজ অর্জন করতে হবে।

স্বায়ত্ত-শাসন নির্ভর করে আমাদের আভ্যন্তরীণ শক্তির উপর, চরম অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম করার সামর্থ্যের উপর। যে স্বায়ত্ত-শাসন এই আদর্শে পৌঁছানোর জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে না বা এই আদর্শকে বজায় রাখার জন্য অবিরত চেষ্টা করে না, তা ঐ নামের অযোগ্য। সুতরাং কথায় এবং কাজে আমি এই বিষয় প্রমাণ করার চেষ্টাই করছি যে, রাজনৈতিক স্বায়ত্ত-শাসন, অর্থাৎ বহুসংখ্যক নরনারীর জন্য স্বায়ত্ত-শাসন, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের

চেয়ে এমন কিছু শ্রেয় নয়, বরং সেইজন্য ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ঠিক যে পন্থায় অর্জন করতে হয়, ঠিক সেই পথেই এ অর্জন করতে হবে।

স্বায়ত্ত-শাসনের অর্থ হল বিদেশী দেশী নির্বিশেষে সরকারী নিয়ন্ত্রণের প্রভাবমুক্ত হবার ক্রমাগত প্রচেষ্টা। জনসাধারণ যদি নিজেদের জীবনের খুঁটিনাটি ব্যাপারকেও নিয়ন্ত্রিত করার জন্য স্বরাজী সরকারের মুখাপেক্ষী হয় তা হলে তা হবে তার পক্ষে এক শোচনীয় ব্যাপার।

আমাদের সভ্যতার প্রতিভাকে অটুট রাখাই আমার স্বরাজ। আমি বহু নূতন বিষয়ে লিখতে চাই, কিন্তু সে সবই ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে লিখতে হবে। উপযুক্ত সুদ সহ পরিশোধ করার ক্ষমতা থাকলে পাশ্চাত্ত্যের কাছ থেকে সানন্দে ঋণ গ্রহণ করব।

স্বরাজকে রক্ষা করা যেতে পারে তখনই যখন দেশের অধিকাংশ লোক দেশের প্রতি অনুগত থাকেন। দেশের অধিকাংশ যখন স্বদেশপ্রেমী হন এবং দেশের কল্যাণকে তাঁরা যখন ব্যক্তিগত লাভ সহ সব কিছুর উর্ধ্বে স্থান দেন তখনই কেবল স্বরাজকে রক্ষা করা সম্ভব হয়। স্বরাজের অর্থ দেশের অধিকাংশের শাসন। কিন্তু এই অধিকাংশ যদি অনীতির পৃষ্ঠপোষক ও স্বার্থপর হন তাহলে তাদের সরকার অরাজকতা ছড়ান ছাড়া আর কোন কিছু করতে পারে না।

আমার···আমাদের···ধ্যানের স্বরাজে জাতি বা ধর্মের পার্থক্যের স্থান নেই। এ স্বরাজে শিক্ষিত ব্যক্তিদের একচেটিয়া অধিকার থাকবে না, ধনীদের একচেটিয়া অধিকারের কথা তো উঠতেই পারে না। স্বরাজ হবে কৃষক সহ সর্বসাধারণের জন্য—বিশেষ করে বিকলাঙ্গ অন্ধ এবং উপবাসী মেহেনতী মানুষদের জন্য।

লোকে বলে ভারতীয় স্বরাজ সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের অর্থাৎ হিন্দুদের রাজত্ব হবে। এর চেয়ে ভুল আর কিছু হতে পারে না। এ সত্য হলে, আমি অন্তত তাকে স্বরাজ নামে অভিহিত করব না এবং আমার সকল শক্তি দিয়ে এর প্রতিরোধ করব। কারণ আমার কাছে হিন্দ স্বরাজের অর্থ হচ্ছে সমগ্র জনসাধারণের রাজত্ব—ন্যায়ের রাজত্ব।

আমাদের সুসভ্য করা এবং আমাদের সংস্কৃতিকে মলিনতামুক্ত করে স্থায়ী করা যদি স্বরাজের উদ্দেশ্য না হয়, তবে তার কোনই মূল্য নেই। আমাদের সভ্যতার সারমর্ম হচ্ছে এই যে সর্বজনীন বা ব্যক্তিগত—সকল ব্যাপারেই নৈতিকতাকে আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দিয়ে থাকি।

'পূর্ণ' কথাটি থাকায় এবং সত্য ও অহিংসা দ্বারা আমরা লক্ষ্যে উপনীত হতে কৃতসঙ্কল্প হওয়ায় স্বরাজী শাসনব্যবস্থায় কারও কাছে বেশী আর কারও কাছে কম সুবিধা আসার সম্ভাবনা নেই এবং কারও প্রতি বিশেষ অনুরাগী বা কারও প্রতি বীতরাগ হবারও সম্ভাবনা নেই।

আমার ধ্যানের স্বরাজ দরিদ্র জনসাধারণের। রাজন্যবর্গ বা ধনিকবর্গ জীবনধারণোপযোগী যে সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী পায়, তার সব কিছুর সুবিধা আপনাদেরও পাওয়া দরকার। তবে তার অর্থ এ নয় যে, আজকের এই সব প্রাসাদ-আদি তাদের থেকে যাবে। সুখের জন্য এর প্রয়োজন নেই। আপনি আমি তাতে নিজেদের হারিয়ে ফেলব। তবে জীবনযাত্রার উপযোগী দ্রব্যসমূহের যে প্রাচুর্য একজন ধনী উপভোগ করে, তা আপনাদের পাওয়া দরকার। আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, স্বরাজের ছত্রচ্ছায়ায় এই সব প্রাচুর্যের প্রতিশ্রুতি না থাকলে তাকে পূর্ণ স্বরাজ বলা যেতে পারে না।

বিচ্ছিন্ন স্বাতন্ত্র্য আমার ধারণায় পূর্ণ স্বরাজ নয়। এর অর্থ সাবলীল এবং সম্মানজনক স্বাধীনতা। আমার জাতীয়তাবাদ তীব্র হলেও অনুদার নয় বা কোন জাতি বা ব্যক্তির ক্ষতির উদ্দেশ্যে প্রণোদিত নয়। আইনগত বাধ্য-বাধকতা নৈতিক বাধ্য-বাধকতার মত দৃঢ় নয়। এই শাশ্বত সত্যে আমি বিশ্বাসী যে 'নিজ সম্পদ এমনভাবে ব্যবহার কর যাতে প্রতিবেশীর অসুবিধা না হয়।'

পূর্ণ স্বরাজের আমরা যে সংজ্ঞা করি বা এর দ্বারা যা অর্জন করতে চাই তার উপরেই এ সব কিছু নির্ভর করে। জনগণের মধ্যে জাগৃতি আনা বা তাদের সঠিক অধিকার সম্বন্ধে চেতনা দেওয়া এবং সমগ্র বিশ্বের বিরোধিতা সত্ত্বেও সেই আদর্শের সেবা করতে তাদের উদ্বুদ্ধ করা যদি আমাদের উদ্দেশ্য হয়, এবং পূর্ণ স্বরাজ মারফৎ যদি আমরা সৌহার্দ্য স্থাপনা করতে চাই বা আভ্যন্তরীণ এবং বহিরাক্রমণের হাত থেকে মুক্তি চাই, জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থার যদি আমরা প্রগতিশীল পরিবর্তন চাই, তবে রাজনৈতিক ক্ষমতা ছাড়াই, অথবা সোজাসুজি কর্তৃপক্ষকে প্রভাবান্বিত করে, আমরা আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারি। ন্যায়সঙ্গত কার্য দ্বারা অর্জিত শক্তি সম্বন্ধে সচেতন কোন জাতিকে স্বাধীন এবং শক্তিশালী করতে হলে যে সমস্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা দরকার, স্বরাজ হচ্ছে তারই সমষ্টি।

স্বরাজ-সম্বন্ধীয় আমার মতবাদ সম্বন্ধে যেন কোন ভ্রান্ত ধারণা না থাকে।

বিদেশী শাসনপাশ থেকে মুক্ত পূর্ণ স্বাধীনতা এবং পূর্ণ অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য হচ্ছে এর অর্থ। সুতরাং এর এক দিকে হচ্ছে রাজনৈতিক এবং অপর দিকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। এ ছাড়া এর আরও দুটি দিক আছে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে নৈতিক এবং সামাজিক আর তৎসন্নিহিত অপর দিকটি হচ্ছে উদারতম অর্থে প্রযুক্ত ধর্ম। হিন্দুধর্ম, ইসলাম, খ্রীষ্টানত্ব ইত্যাদি সব কিছুই এর অন্তর্ভুক্ত হলেও এ সব কিছুরই চেয়ে এ শ্রেষ্ঠ।...এগুলিকে আমরা স্বরাজের চারটি বাহু বলে আখ্যা দিতে পারি এবং এর যে কোন একটি দিক বিসম হলে, সমস্ত স্বরাজরূপ চতুর্ভুজটিই বিকৃত হয়ে যাবে।

সত্য এবং অহিংসা দ্বারাই আমাদের স্বরাজ অর্জিত, পরিচালিত এবং রক্ষিত হবে এই বিশ্বাস আমাদের সকলের মনে দৃঢ়মূল হলে আমার কল্পিত স্বরাজ বাস্তবরূপ পরিগ্রহণ করবে। অসত্য এবং হিংসার পথে কখনই খাঁটি গণতন্ত্র বা জনগণের স্বরাজ আসতে পারে না, কারণ দমননীতির প্রয়োগে যাবতীয় বিরোধিতার অবসান ঘটানো এবং বিপক্ষদলকে নির্মূল করাই এ পথের স্বাভাবিক পরিণতি। এতে স্বাধীনতা আসে না। অবিমিশ্র অহিংসার আওতাতেই ব্যক্তি-স্বাধীনতার পূর্ণ বিকাশ সম্ভব।

অহিংসার ভিত্তিতে গঠিত স্বরাজে অধিকারের কথা জনসাধারণের না জানলেও চলবে; কিন্তু নিজেদের কর্তব্য সম্বন্ধে তাদের জানা দরকার। এমন কোন কর্তব্য নেই যা প্রতিপালন করার ফলে অধিকার অর্জিত হয় না। আবার খাঁটি অধিকার তাকেই বলা হয়, যা একজনের কর্তব্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করার ফলে অর্জিত হয়। সুতরাং, নাগরিক অধিকার তাঁরাই পেতে পারেন যাঁরা নিজ রাষ্ট্রের সেবা করেন। আর তাই তাঁরাই শুধু এ ভাবে অর্জিত অধিকারের সদ্ব্যবহার করতে পারেন। মিথ্যাভাষণের বা গুণ্ডামি করার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে। কিন্তু এরকম অধিকার প্রয়োগ করায় প্রয়োগকারী এবং সমাজ উভয়েরই ক্ষতি। কিন্তু সত্য এবং অহিংসার আচরণকারী সম্মান অর্জন করেন এবং এই সম্মানের ফলে অর্জিত হয় অধিকার। কর্তব্য সম্পাদন করার ফলে যাঁরা অধিকার অর্জন করেন তাঁরা সমাজসেবার জন্যই সে অধিকার প্রয়োগ করেন। নিজের জন্য কদাচ প্রয়োগ করেন না। কোন জাতির স্বরাজের অর্থ হচ্ছে ব্যষ্টির স্বরাজের (স্বায়ত্ত-শাসনের) সমষ্টি। আর জনসাধারণ ব্যক্তিগতভাবে নাগরিকের কর্তব্য পালন করলেই আসে ঐ ধরনের স্বরাজ। এ রকম স্বরাজে কেউ নিজের

অধিকারের কথা চিন্তা করে না। সুচারুরূপে কর্তব্য সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনকালে এসব স্বাভাবিকভাবে চলে আসে।

অহিংসার ভিত্তিতে স্থাপিত স্বরাজে কারও সঙ্গে কারও শত্রুতা থাকবে না। সর্বসাধারণের কাম্য আদর্শে উপনীত হবার জন্য প্রত্যেকে যথোপযুক্ত অংশ গ্রহণ করবে। প্রত্যেকে লেখাপড়া জানবে এবং প্রতিনিয়ত তাদের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ হবে। রোগ এবং অসুস্থতার প্রসার যথাসম্ভব কমাতে হবে। নিঃস্ব কেউ থাকবে না এবং শ্রমিকেরা সব সময়েই কাজ পাবে। জুয়া, পানাসক্তি এবং নৈতিক অধঃপতন বা শ্রেণীবিদ্বেষের স্থান এরকম সরকারের রাজত্বে থাকবে না। বিবেচনা করে প্রয়োজনানুসারে ধনী তার সম্পদ ব্যবহার করবে, নিজের জাঁকজমক বা পার্থিব ভোগবিলাসের জন্য অপব্যয় করবে না। মুষ্টিমেয় কয়েকজন ধনী রত্নখচিত প্রাসাদে বাস করলে এবং লক্ষ লক্ষ জনসাধারণ আলোহাওয়া-বিবর্জিত পর্ণকুটীরে থাকলে চলবে না। অহিংস স্বরাজে কারও ন্যায্য অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হবে না এবং সেই রকম কোন অন্যায্য অধিকারও থাকবে না। সুসংগঠিত রাষ্ট্রে বলপূর্বক কোন কিছু দখল করা সম্ভব হবে না এবং বলপূর্বক দখলকারীকে অধিকারচ্যুত করার জন্য শক্তিপ্রয়োগের প্রয়োজনও হবে না।

॥ তিন ॥

জাতীয়তাবাদের সপক্ষে

আমার কাছে স্বদেশপ্রেমের অর্থ মানবতার সেবা। আমি মানুষ এবং মানবীয় স্বভাবসম্পন্ন বলেই আমি স্বদেশপ্রেমী। আমার স্বদেশপ্রেমে কাউকে বর্জন করার স্থান নেই। ভারতবর্ষের সেবা করার জন্য আমি ইংলণ্ড বা জার্মানীর ক্ষতি করব না। আমার জীবনযাপন পরিকল্পনায় সাম্রাজ্যবাদের কোন স্থান নেই।

স্বদেশের মুক্তি আমি এই কারণে চাই যে, অন্যান্য দেশ আমার স্বাধীন দেশের কাছ থেকে শিখুক, আমাদের দেশের সম্পদ সমগ্র মানবতার মঙ্গলের জন্য ব্যবহৃত হোক। স্বদেশভক্তির ধর্ম আজ যেমন আমাদের শিক্ষা দেয় যে, পরিবারের জন্য ব্যক্তিকে, গ্রামের জন্য পরিবারকে, জেলার জন্য গ্রামকে,

প্রদেশের জন্য জেলাকে এবং সমস্ত দেশের জন্য প্রদেশকে আত্মোৎসর্গ করতে হবে, সেইভাবে কোন দেশের এইজন্য মুক্তি পাওয়া দরকার, যেন প্রয়োজন হলে সে দেশ সমগ্র বিশ্বের মঙ্গলের জন্য আত্মোৎসর্গ করতে পারে। জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে আমার ধারণা হচ্ছে এই যে, আমার দেশ স্বাধীনতা অর্জন করুক এবং প্রয়োজন হলে মানবসমাজকে রক্ষা করার জন্য সমস্ত দেশবাসী জীবনদান করুক। এই ধরনের জাতীয়তাবাদেরই আমি অনুরাগী। জাতিগত ঈর্ষার স্থান এখানে নেই। এই হয় যেন আমাদের জাতীয়তাবাদ।

সমগ্র জগতের মঙ্গলের জন্যই আমি ভারতের অভ্যুত্থান চাই। আমি চাই না যে, অপরাপর জাতিকে ধ্বংস করে ভারতের অভ্যুদয় হোক।

ইউরোপের পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত ভারত মানবতাকে কোনই আশার বাণী শোনাতে পারে না। জাগ্রত এবং মুক্ত ভারতবর্ষ বেদনায় আর্তনাদরত জগৎকে শান্তি এবং শুভেচ্ছার বাণী শোনাবে।

জাতীয়তাবাদী না হলে কারও পক্ষে আন্তর্জাতিকতাবাদী হওয়া অসম্ভব। জাতীয়তাবাদ যখন বাস্তব সত্যে পরিণত হয় অর্থাৎ বিভিন্ন দেশের মানুষ যখন নিজেদের সংগঠিত করে ও সবাই মিলে একটি মানুষের মত কাজ করতে শেখে তখনই আন্তর্জাতিকতাবাদ বাস্তবে পরিণত হয়। জাতীয়তাবাদ দুষ্য নয়, দোষের হল আজকালকার জাতিসমূহের অনর্থের মূল সঙ্কীর্ণতা স্বার্থপরতা ও বিভেদপ্রবণতা। প্রত্যেকে আর সকলকে বঞ্চিত করে লাভবান হতে চায়, প্রত্যেকে চায় অপর সবার ধ্বংসস্তূপের উপর উঠে দাঁড়াতে। ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদ এক ভিন্ন পথ অবলম্বন করেছে। ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদ নিজেকে সংগঠিত করতে চায় অর্থাৎ সমগ্র মানবতার কল্যাণ ও সেবার জন্য পূর্ণ আত্মাভিব্যক্তি করতে চায়।

ভারতবর্ষের জনসাধারণের ভিতর ঈশ্বর আমাকে সৃষ্টি করেছেন বলে তাদের সেবা করতে না পারলে আমি আমার স্রষ্টার প্রতি কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হব। আর নিজের দেশের সেবা করার সময় আমি যদি অপর কোন দেশের ক্ষতি না করি তাহলে আমার কোন দোষ হবে না।

আমার স্বদেশপ্রেম কাউকে বর্জন করতে শেখায় না। এ সবাইকে কোল দেয়। যে স্বদেশপ্রেম অন্যান্য জাতির লোকেদের শোষণ ও দুঃখ দুর্দশার উপর দাঁড়াতে চায়, আমার কাছে তা গ্রহণযোগ্য নয়। সর্ব সময় এবং সর্বাবস্থায় সমগ্র মানবসমাজের কল্যাণের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ না হলে আমার

স্বদেশে প্রেমের ধারণার কোন মূল্য নেই। শুধু তাই নয়, আমার ধর্ম এবং সেই ধর্মসঞ্জাত স্বদেশপ্রেম সকল জীবের সঙ্গে একাত্ম হতে শেখায়। যেসব জীবদের মানুষ আখ্যা দেওয়া হয় আমি কেবল তাদের সঙ্গেই ভ্রাতৃভাবাপন্ন বা একাত্ম হতে চাই না, আমি চাই সকল প্রাণীর সঙ্গে একাত্ম হতে—এমন কি কীট পতঙ্গের মত যারা মাটির উপর বুকে হেঁটে চলে তাদের সঙ্গেও। ......আমরা সকলেই একই ঈশ্বরের সন্তান। তাই যে কোন রূপেই দেখা দিক না কেন সব জীব একই প্রাণতত্ত্বের অভিব্যক্তি ও তাই এক।

আমাদের জাতীয়তাবাদ অপরাপর জাতির পক্ষে ক্ষতিকারক হবে না। কারণ আমরা যেমন আর কাউকে আমাদের শোষণ করার সুযোগ দেব না, তেমনি আমরাও আর কাউকে শোষণ করব না। স্বরাজের মাধ্যমে আমরা সমগ্র বিশ্বের সেবা করব।

॥ চার ॥

ভারতে গণতন্ত্র

স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠতম রূপের সঙ্গে সর্বাধিক পরিমাণ নিয়মানুবর্তিতা ও নম্রতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। নিয়মানুবর্তিতা ও বিনয় থেকে উদ্ভূত স্বাধীনতার দাবী অস্বীকার করা যায় না। অনিয়ন্ত্রিত স্বেচ্ছাচার একটা কুৎসিত ব্যাপার। যিনি এমন করেন তিনি এবং তাঁর প্রতিবেশীরা—সকলেই এতে আঘাত পান।

মানুষের পক্ষে এমন কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব নয় যাতে কোন না কোন বিপদের আশঙ্কা নেই। এই সব ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠান যত বড় হবে সেখানে ক্ষমতার অপব্যবহারের সম্ভাবনাও তত বেশী। গণতন্ত্র এক মহান ব্যবস্থা বলে এর বিকৃতির সম্ভাবনাও খুব বেশী। সুতরাং এর প্রতিকার গণতন্ত্রকে পরিহার করা নয়, বিকৃতির সম্ভাবনাকে যথাসম্ভব হ্রাস করা।

জনপ্রিয় রাষ্ট্র কখনই জনমত অনুকূল হবার পূর্বে কোন কিছু করতে পারে না। জনমতের বিরুদ্ধে গেলে জনপ্রিয় রাষ্ট্র ধ্বংস হয়ে যাবে। সুশৃঙ্খল ও সচেতন গণতন্ত্র পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম জিনিস। পক্ষপাতদুষ্ট অজ্ঞান ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন গণতন্ত্র শীঘ্রই বিশৃঙ্খলার সম্মুখীন হবে এবং হয়ত নিজেকে নিজেই নষ্ট করে ফেলবে।

বার বার আমি একথা বলেছি যে কোন মতবাদই দাবী করতে পারে না যে একমাত্র তাদের বিচারবুদ্ধি অভ্রান্ত। আমরা সকলেই ভুল করতে পারি এবং প্রায়ই আমাদের পূর্বের অভিমত পাল্টাতে হয়। আমাদের মত বিরাট দেশে সব রকমের সৎ অভিমতের স্থান থাকা উচিত। অতএব আমাদের নিজেদের এবং অপরের প্রতি আমাদের ন্যূনতম কর্তব্য হল বিরুদ্ধপক্ষীয়ের দৃষ্টিভঙ্গী বোঝার চেষ্টা করা। আর তাঁদের বক্তব্য যদি আমাদের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নাও হয় তাকে যেন আমরা শ্রদ্ধা করি—যেমন আমরা আশা করি যে তাঁরা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীকে শ্রদ্ধা করবেন। সুস্থ জনজীবন এবং সেই কারণে স্বরাজের যোগ্যতার অন্যতম অপরিহার্য নিরীখ হল এই। ঔদার্য ও সহনশীলতা যদি আমাদের না থাকে তাহলে কখনই আমরা আমাদের পারস্পরিক মতদ্বৈধতার শান্তিপূর্ণ সমাধান করতে পারব না এবং তাই সর্বদাই আমাদের তৃতীয় পক্ষের সালিশী মেনে নিতে হবে। আর তার অর্থই হল বিদেশী আধিপত্য স্বীকার করা।

জনসাধারণ যখন রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হয় তখন কদাচিৎ তাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয়। অর্থাৎ সেই জাতিই যথার্থ গণতান্ত্রিক যারা খুব বেশী একটা রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ছাড়াই নিজেদের কাজকর্ম সুচারুরূপে চালিয়ে নেয়। এ অবস্থা যেখানে নেই সরকার সেখানে নামে মাত্র গণতান্ত্রিক।

গণতন্ত্র ও হিংসা একসঙ্গে চলতে পারে না। গণতন্ত্রের নামে যে সব রাষ্ট্র আজকাল চলছে হয় তাদের প্রকাশ্যভাবে স্বৈরতন্ত্রী হতে হবে আর নচেৎ যথার্থ গণতান্ত্রিক হবার জন্য তাদের সাহস করে অহিংসও হতে হবে। অহিংসা কেবল ব্যক্তিগতভাবে আচরণীয়, ব্যক্তিদের সমবায়ে গঠিত রাষ্ট্রের আচরণীয় নয়—এমন কথা বলা নাস্তিকতার পরিচায়ক।

গণতন্ত্রের সারাৎসার হল এই যে প্রতিটি ব্যক্তি জাতির অঙ্গীভূত সর্ব প্রকারের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করবেন। একথা সত্য যে গণতন্ত্রে বিশেষ স্বার্থকে বিশেষ প্রতিনিধিত্ব দেওয়া নিষিদ্ধ নয় এবং নিষিদ্ধ হওয়া উচিতও নয়। তবে এ জাতীয় প্রতিনিধিত্ব গণতন্ত্রের কষ্টিপাথর নয়। এ হল তার অপূর্ণতার লক্ষণ।

গণতন্ত্র বা জনগণের স্বরাজ কখনও অসত্য পন্থায় বা হিংস উপায়ে আসবে না। এর সহজ কারণ হল এই যে অসত্য ও হিংস পন্থার যুক্তিসঙ্গত পরিণতি হল অবদমন বা হত্যার দ্বারা সব রকমের বিরোধী মতকে অপসারিত করা।

এর দ্বারা ব্যক্তি-স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত হয় না। একমাত্র অবিমিশ্র অহিংসার আওতাতেই পূর্ণ ব্যক্তি-স্বাধীনতার বিকাশ সম্ভব।

স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষ বহিরাক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা এবং পারস্পরিক আর্থিক সহযোগিতার উদ্দেশ্যে সানন্দে অন্যান্য স্বাধীন দেশের সঙ্গে সম্মিলিত হবে। পৃথিবীর তাবৎ জ্ঞান ও সম্পদকে সমগ্র মানবতার অগ্রগতির কাজে নিযুক্ত করে ভারত স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের ভিত্তিতে যথার্থ বিশ্ব সরকার গড়ার প্রয়াস করবে।

গণতন্ত্র সম্বন্ধে আমার ধারণা হল এই যে, এর আওতায় দুর্বলতমও সর্বাপেক্ষা বলশালীর সঙ্গে সমান সুযোগ পাবে। অহিংসা ছাড়া অন্য কোন উপায়ে এ লক্ষ্যে উপনীত হওয়া অসম্ভব। পৃথিবীর কোন দেশই আজ দুর্বলদের প্রতি মুরুব্বিয়ানার দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেনি।

গণতন্ত্রে ওতপ্রোত ব্যক্তিকে শৃঙ্খলার জীবন্ত নিদর্শনও হতে হবে। মানবীয় অথবা ঐশ্বরীক—সকল প্রকারের আইন স্বভাবতই মেনে চলতে যিনি অভ্যস্ত তাঁর কাছে গণতন্ত্র স্বতঃই আসে।...... গণতন্ত্রের সেবা করার ইচ্ছা যাঁরা পোষণ করেন তাঁরা যেন সর্বাগ্রে গণতন্ত্রের এই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, তাছাড়া গণতন্ত্রপ্রেমীকে একেবারেই স্বার্থশূন্য হতে হবে। তাঁকে ব্যক্তি বা দলের দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবলে চলবে না, তাঁর চিন্তা এবং ধ্যান-ধারণা হবে গণতন্ত্রকে কেন্দ্র করে। তাহলেই কেবল আইন অমান্য করার অধিকার তাঁর জন্মে।......ব্যক্তি-স্বাধীনতার মূল্য আমি খুবই দিয়ে থাকি, তবে আপনাদের একথা ভুলে গেলে চলবে না যে মানুষ মূলতঃ সামাজিক জীব, নিজের ব্যক্তিবাদকে মানুষ সামাজিক প্রগতির প্রয়োজনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে আজকের অবস্থায় উন্নীত হয়েছে। অনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিবাদ বনের পশুদের বিধান। আমাদের তাই ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মাঝখানে একটা পথ বার করতে হবে। সমগ্র সমাজের কল্যাণের জন্য স্বেচ্ছায় সামাজিক নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করে নিলে ব্যক্তি ও ব্যক্তির সমবায়ে গঠিত সমাজ—উভয়েই সমৃদ্ধ হয়।

যিনি যথাযথভাবে নিজের কর্তব্য করে যান তিনি স্বতঃই অধিকার পেয়ে থাকেন। বস্তুতঃ নিজের কর্তব্য পালন করার অধিকারই একমাত্র এমন অধিকার যার জন্য বাঁচা বা মরার সার্থকতা আছে। এই হল যাবতীয় ন্যায়সঙ্গত অধিকারের গোড়ার কথা। আর সব কিছুই কোন না কোন

ছদ্মবেশের অন্তরালে লুক্কায়িত ছলনা ও তার ভিতর হিংসার বীজ বিদ্যমান।

গণতন্ত্রে ব্যক্তিগত ইচ্ছার নিয়ামক ও সীমানির্ধারণকারী হল সামাজিক ইচ্ছা বা রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্র আবার গণতন্ত্রের দ্বারা এবং গণতন্ত্রের জন্য চালিত হয়। প্রতিটি ব্যক্তি যদি নিজের হাতে আইন তুলে নেন তাহলে আর রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকে না। এর অর্থ হল অরাজকতা অর্থাৎ সামাজিক বিধান বা রাষ্ট্রের অনুপস্থিতি। এ পথে স্বাধীনতা ধ্বংস হবে। জনসাধারণ তাই *নিজেদের ক্রোধ সম্বরণ করবেন এবং রাষ্ট্রকে ন্যায়বিচার করার অবকাশ দেবেন।*

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনসাধারণ সরকারের কোন ভুল দেখলে তার প্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেই সন্তুষ্ট হবেন। ইচ্ছা করলে তাঁরা সরকারের পরিবর্তনও করতে পারেন। কিন্তু সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে তার কাজে তাঁরা বাধা সৃষ্টি করবেন না। আমাদের সরকার বিদেশী নয় যে বিশাল স্থল বাহিনী ও নৌ-সেনাবাহিনীর বলে বলীয়ান হবে। আমাদের সরকারকে জনসাধারণের কাছ থেকে শক্তি সংগ্রহ করতে হবে।

জন কুড়ি লোক দ্বারা কেন্দ্র থেকে যথার্থ গণতন্ত্র চালান সম্ভব নয়। নীচে থেকে প্রতিটি গ্রামের লোকেদের দ্বারা একে রূপায়িত করতে হবে।

জনতাতন্ত্র

ব্যক্তিগতভাবে আমি সরকারের রোষের জন্য ততটা চিন্তিত নই, যতটা চিন্তিত জনসাধারণের রোষবহ্নির অভিপ্রকাশের কারণ। দ্বিতীয়টি জাতীয় চিত্তবৈলক্ষণের নিদর্শন এবং সেইজন্য প্রথমটির তুলনায় একে আয়ত্তে আনা কঠিন। সরকারী রোষের উৎস অল্প কয়েকজনের ভিতর। যে সরকার শাসনদণ্ড পরিচালনায় অযোগ্য প্রতিপাদিত হয়েছে তাকে পদচ্যুত করা বরং সহজ। কিন্তু অচেনা লোকেদের উন্মত্ত সমাবেশের চিকিৎসা করা অপেক্ষাকৃত দুরূহ কার্য।

এই সব জনতা যাদের হৃদয় সোনা দিয়ে তৈরী এবং যাদের মনে দেশের জন্য দরদ আছে ও যারা শিখতে চায়, নেতৃত্ব চায়, তাদের প্রশিক্ষণ দেবার ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন অল্প কয়েকজন বুদ্ধিমান ও নিষ্ঠাযুক্ত কর্মী। তাহলেই সমগ্র জাতিকে বুদ্ধিমত্তা সহকারে কাজ

করার জন্য সংগঠিত করা যেতে পারে। এই পথে জনতাতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রের বিবর্তন সম্ভব।

সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু

নিজেদের জন্য আমরা যে বাক্ স্বাধীনতা ও কর্মের স্বাতন্ত্র্য চাই, অপরকেও সেই অধিকার দিতে হবে। নিপীড়নমূলক হলে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনও আমলাতান্ত্রিক সংখ্যালঘুদের শাসনের মত অসহ্য হয়ে উঠতে পারে। যুক্তি-তর্ক দিয়ে এবং বুঝিয়ে পড়িয়ে সংখ্যালঘুদের স্বমতে আনতে হবে।

সংখ্যাগুরুর শাসনের একটি সঙ্কীর্ণ দিকও আছে যেখানে আশা করা হয় যে খুঁটিনাটির ব্যাপারে কোন ব্যক্তিকে সংখ্যাগুরুর কাছে নতি স্বীকার করতে হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত যা-ই হক না কেন, সর্বাবস্থায় তার কাছে নতি স্বীকার করতে হবে—এ মনোভাব দাসত্বব্যঞ্জক। গণতন্ত্রে জনসাধারণ নিশ্চয় মেষযূথের মত আচরণ করবে না। গণতন্ত্রের আওতায় ব্যক্তিগত মত প্রকাশ ও কর্মের স্বাধীনতা সততা সহকারে রক্ষা করা হয়। আমি তাই বিশ্বাস করি যে প্রয়োজন বুঝলে সংখ্যালঘিষ্ঠদের সংখ্যাগরিষ্ঠদের থেকে ভিন্নভাবে কাজ করার পূর্ণ অধিকার আছে।

ব্যক্তিকে যদি হিসাবে না ধরা হয় তাহলে সমাজের আর কি বাকী থাকে? একমাত্র ব্যক্তিগত স্বাধীনতার আওতাতেই কোন মানুষের পক্ষে স্বেচ্ছায় সমাজের সেবার জন্য সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করা সম্ভব। কিন্তু জোর করে এটা ব্যক্তির কাছ থেকে আদায় করলে সে যন্ত্রে পরিণত হয়ে ওঠে এবং তার ফলে সমাজেরও অস্তিত্ব নষ্ট হয়ে যায়। ব্যক্তি-স্বাধীনতা অস্বীকার করে কোন সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে না।

॥ পাঁচ ॥

ভারত এবং সমাজতন্ত্রবাদ

পুঁজিপতিদের দ্বারা পুঁজির অপব্যবহারের তথ্য আবিষ্কার হবার পর সমাজতন্ত্রবাদের সৃষ্টি হয়নি। ঈশোপনিষদের প্রথম ছত্রে সমাজতন্ত্রবাদ ও এমন কি সাম্যবাদের ভাবধারা সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান। আসল ব্যাপার হচ্ছে এই যে, কোন কোন সংস্কারক যখন মনোবৃত্তির পরিবর্তনের উপর আস্থা

হারিয়ে ফেললেন, তখনই সৃষ্ট হল বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ। বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিকদের সামনে যে সমস্যা, আমি তারই সমাধানের চেষ্টা করছি। অবশ্য একথা সত্য যে সর্বদাই শুধু খাঁটি অহিংস উপায়ে আমি এই চেষ্টা করে থাকি। আমার এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে পারে। যদি এর বিনাশ ঘটে, তবে অহিংস প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আমার অজ্ঞতার দরুনই এ হবে। যে ধর্ম-বিশ্বাসের প্রতি উত্তরোত্তর আমার আস্থা বেড়ে যাচ্ছে, আমি হয়ত তার অযোগ্য ব্যাখ্যাকারক হতে পারি। অখিল-ভারত-চরখাসঙ্ঘ এবং অখিল-ভারত-গ্রামোদ্যোগসঙ্ঘ নামক প্রতিষ্ঠান দুটির মারফৎ সারা ভারতে অহিংসার প্রক্রিয়ার পরীক্ষা চলছে। কংগ্রেসের মত সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের কার্যপ্রণালী সদাপরিবর্তনশীল হওয়ার সম্ভাবনা থাকায়, কোন বন্ধনে আবদ্ধ না হয়ে আমার গবেষণা আমি যাতে চালিয়ে যেতে পারি সেইজন্য কংগ্রেস কর্তৃক এই বিশেষ সার্বভৌম প্রতিষ্ঠান দুটির সৃষ্টি হয়েছে।

আমাদের পূর্বপুরুষেরা আমাদের খাঁটি সমাজতন্ত্রবাদের শিক্ষা দিয়ে গেছেন। তাঁরা শিখিয়েছেন: "সমস্ত ভূমিই যখন গোপালের তখন এর সীমারেখা আর কোথায়? মানুষই হচ্ছে এই সীমারেখার সৃষ্টিকর্তা, তাই একে সে ভেঙে দিতেও পারে।" গোপালের ভাষাগত অর্থ রাখাল হলেও, গোপাল বলতে ঈশ্বরকেও বোঝায়। আধুনিক ভাষায় এর অর্থ হচ্ছে রাষ্ট্র অর্থাৎ জনসাধারণ। একথা সত্য যে, জনসাধারণ আজ ভূমির মালিক নয়। তবে সে দোষ ঐ শিক্ষার নয়। এ দোষ আমাদের, যারা এ শিক্ষা অনুযায়ী চলিনি। এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই যে, রাশিয়া এবং অন্যান্য জাতিসমূহের মত সুষ্ঠুভাবে, তাও আবার হিংসা প্রয়োগ না করেই, আমরা এ আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করতে সফলকাম হতে পারি। হিংস উপায়ে কাউকে কোন অধিকারচ্যুত করার সর্বাধিক কার্যকরী বিকল্পব্যবস্থা হচ্ছে চরখা এবং তার আনুষঙ্গিক যাবতীয় কার্যক্রম। ভূমি বা যাবতীয় সম্পত্তিতে যারা শ্রম নিয়োগ করে, এ সবের ফলের মালিকও তারাই হয়। দুর্ভাগ্যবশত শ্রমিক-শ্রেণী এই সাধারণ তথ্যটি জানে না বা তাদের জানতে দেওয়া হয় না।

এই দাবী আমি জানিয়েছি যে, ভারতে আমার পরিচিত যাঁরা নিজেদের সমাজতান্ত্রিক নীতির অনুসরণকারী বলে পরিচয় দেন, তাঁদের বহু পূর্ব হতেই আমি সমাজতান্ত্রিক। তবে আমার সমাজতন্ত্রবাদ আমার কাছে স্বভাবজাত

এবং কোন পুঁথিপত্র থেকে আমাকে এ নীতি গ্রহণ করতে হয় নি। অহিংসায় আমার অবিচল বিশ্বাস থেকেই এর সৃষ্টি হয়েছে। যেখানেই অনুষ্ঠিত হোক না কেন, সর্বপ্রকার সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে না দাঁড়াতে পারলে সক্রিয়ভাবে কেউ অহিংস হতে পারে না। দুর্ভাগ্যবশত আমি যতদূর জানি, পাশ্চাত্ত্য সমাজতন্ত্রবাদীরা সমাজতান্ত্রিক নীতিকে কার্যকরী করার জন্য হিংসার প্রয়োজনীয়তার উপর আস্থাশীল।

বরাবরই আমাদের অভিমত হচ্ছে এই যে, শক্তি প্রয়োগ দ্বারা একেবারে দীনদরিদ্রের জন্যও সামাজিক ন্যায়বিচার অর্জন করা যায় না। এ ছাড়া আমার বিশ্বাস যে, দীনদরিদ্রের যে অবিচার ভোগ করতে হয়, অহিংস উপায়ে তার প্রতিকার করার জন্য তাদের উপযুক্ত শিক্ষা দিলে এই সামাজিক ন্যায়বিচার অর্জন করা সম্ভব। এর মানে হচ্ছে অহিংস অসহযোগ। সময় সময় অসহযোগ সহযোগেরই মত অবশ্যকরণীয় কর্তব্য হয়ে ওঠে। নিজের ধ্বংস সাধন করে বা দাসত্ব মেনে নিয়ে কেউ সহযোগিতা করতে বাধ্য নয়। যতবড় শুভার্থী হোক না কেন, অপরের প্রচেষ্টায় স্বাধীনতা অর্জন করলে, সে প্রচেষ্টার পরিসমাপ্তি ঘটা মাত্র আর স্বাধীনতা বজায় রাখা যায় না। অর্থাৎ একে সত্যকার স্বাধীনতা বলা যায় না। কিন্তু অহিংস অসহযোগ দ্বারা একে অর্জন করতে শেখা মাত্র একেবারে যে দীন সেও স্বাধীনতার উজ্জ্বল ছটার অস্তিত্ব অনুভব করতে পারে। এ বিষয়ে আমি একেবারে নিঃসন্দেহ যে হিংসায় যা কখনও সম্ভব নয়, অহিংস অসহযোগ তাকে সম্ভব করে তুলতে পারে, আর তাও শেষ পর্যন্ত অন্যায়কারীর হৃদয়ের পরিবর্তন করে। অহিংসাকে যতখানি সুযোগ দেওয়া উচিত ভারতবর্ষে তা আমরা দিই নি। বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে এই যে অবিশুদ্ধ অহিংসা দ্বারাই আমরা এতটা সফলকাম হয়েছি।

সম্মানজনকভাবে ভরণপোষণ চালানোর জন্য শুধু যেটুকু দরকার, তার চেয়ে বেশী জমি কারও থাকা উচিত নয়। একথা কে অস্বীকার করতে পারে যে, নিজের বলে কিছু জমি না থাকার জন্যই জনসাধারণের এই অসীম দারিদ্র্য ?

তবে একথা হৃদয়ঙ্গম করতে হবে যে, অহিংস উপায়ে এই সংস্কার প্রবর্তন করতে হলে তাড়াহুড়ো করলে চলবে না। বিত্তবান এবং নিঃস্ব উভয়কেই উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে এই সংস্কার প্রবর্তিত করা সম্ভব। বিত্তবানদের এই

আশ্বাস দিতে হবে যে কখনও তাঁদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করা হবে না। বিত্তহীনদের বোঝাতে হবে যে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ তাদের কিছু করতে বাধ্য করতে পারে না এবং অহিংসা অর্থাৎ আত্মনিগ্রহ বরণের কলা শিখে তারা নিজেদের স্বাধীনতা চিরস্থায়ী করতে পারে। এই লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে এখন থেকেই আমি যে শিক্ষার কথা বললাম, তা শুরু করে দিতে হবে। প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। এই হলে বিভিন্ন শ্রেণী ও জনসাধারণের ভিতর আর হিংস সংঘর্ষ হবে না।

সমাজতন্ত্রবাদী কে?

সমাজতন্ত্রবাদ কথাটি মধুর এবং সমাজতন্ত্রবাদ সম্বন্ধে আমি যতটুকু জানি তাতে সমাজের সকল সদস্যই হবে সমান—কেউ নীচ বা কেউ উচ্চ নয়। শরীরের মধ্যে সবার উপরে অবস্থিত বলে মস্তক সর্বশ্রেষ্ঠ নয় বা মাটিতে লেগে থাকে বলে পায়ের তলা একেবারে হীন নয়। শরীরের বিভিন্ন অংশের মত সমাজের বিভিন্ন অংশও সমান—এই হচ্ছে সমাজতন্ত্রবাদ।

এই সমাজব্যবস্থার আওতায় রাজা এবং চাষী, ধনী বা নির্ধন, মালিক ও শ্রমিক ইত্যাদি সবারই মর্যাদা সমান। ধর্মের দিক থেকে সমাজতন্ত্রবাদের কোন রকম দ্বিত্ব ভাব নেই। সব জায়গাই দ্বিধা বা বহুধা বিভক্ত। ঐক্যের অভাব স্পষ্ট। এ উচ্চবর্ণের ও হীন, এ হিন্দু ও মুসলমান, তৃতীয়জন খ্রীষ্টান, চতুর্থজন পার্শি, পঞ্চমজন শিখ বা ষষ্ঠ ব্যক্তি ইহুদী। এ সবের ভিতর আবার উপবিভাগ রয়েছে। আমার আকাঙ্ক্ষিত ঐক্যে এ সবের মধ্যে সম্পূর্ণ সৌহার্দ্য বিরাজমান।

এই অবস্থায় পৌঁছবার জন্য বিষয়টিকে শুধু দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিশ্লেষণ করে একথা বললে চলবে না যে, সবাই সমাজতন্ত্রবাদে দীক্ষিত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের কোন কিছু করা ঠিক হবে না। নিজেদের জীবনযাত্রায় পরিবর্তন সাধন না করেই আমরা বক্তৃতা দিয়ে যেতে পারি, দল গড়তে পারি, আর সামনে পেয়ে গেলে বাজপাখির মত ছোঁ মেরে শিকার ধরতেও পারি। একে সমাজতন্ত্রবাদ বলে না। যতই আমরা একে শিকার বলে বিবেচনা করব ও একে জোর করে ভোগ করতে যাব, ততই আমাদের কাছ থেকে এ আদর্শ দূরে সরে যাবে।

সমাজতন্ত্রবাদের সূচনা হয় দীক্ষিত প্রথম ব্যক্তিটির সঙ্গে সঙ্গে। এরকম

একজনও যদি থাকে, তবে এই একটির সঙ্গে শূন্য যোগ করা যায়, এবং সে অবস্থায় প্রথম শূন্যটির অর্থ হয় দশক এবং এইভাবে প্রত্যেকটি শূন্যের অর্থ হয়ে দাঁড়ায় পূর্বের সংখ্যার দশগুণ। সূচনাকারীই যদি শূন্য হয়, অর্থাৎ কেউ আসলে যদি শুরুই না করে, তবে তার সঙ্গে শূন্য যোগ করলে তার ফল শূন্যই হবে। এই সব শূন্যের হিসাব রাখতে যে সময় ও কাগজ যাবে সে সবই হবে নষ্ট।

সমাজতন্ত্রবাদ হচ্ছে স্ফটিকের ন্যায় শুদ্ধ। সুতরাং একে অর্জন করার জন্য স্ফটিকবৎ পন্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। অসৎ পন্থার ফল অসৎ পরিণাম। সুতরাং রাজার শিরশ্ছেদ করলেই রাজা এবং চাষী সমপর্যায়ভুক্ত হবে না বা কাটাকাটি করলেই মালিক ও শ্রমিক সমান হবে না। অসত্য দ্বারা কেউ সত্যে উপনীত হতে পারে না। সত্য আচরণেই শুধু সত্যে উপনীত হওয়া সম্ভব। সত্য এবং অহিংসা কি পৃথক সত্তাবিশিষ্ট নয়? এর জবাব হচ্ছে একটি জোরালো 'না'। সত্যের ভিতর অহিংসা নিহিত রয়েছে এবং অহিংসার ভিতরে আছে সত্য। এইজন্যই এদের একই মুদ্রারই এপিঠ ওপিঠ বলা হয়। এর কোন একটিকে অপরটির কাছ ছাড়ানো যায় না। মুদ্রার উপরের লেখাগুলি যে-কোন দিক থেকে পড়া যাক না কেন, এর অক্ষরবিন্যাসে পার্থক্য হলেও, মুদ্রার দামের তারতম্য হয় না। সম্পূর্ণ পবিত্রতা বিনা এমন সুন্দর অবস্থায় পৌঁছান যায় না। মনে বা শরীরে অপবিত্রতা থাকলে নিজের ভিতর অসত্য এবং হিংসার উদ্রেক হবেই।

তাই শুধু সত্যাশ্রয়ী, অহিংস এবং পবিত্রচিত্ত সমাজতান্ত্রিকরাই ভারতবর্ষ এবং সমগ্র পৃথিবীতে সমাজতান্ত্রিক সমাজ রচনা করতে সক্ষম হবেন। সম্পূর্ণরূপে সমাজতান্ত্রিক কোন রাষ্ট্র জগতে আছে বলে আমার জানা নেই। উপরে বর্ণিত পন্থা বিনা সে রকম সমাজের অস্তিত্ব অসম্ভব।

॥ ছয় ॥

ভারত ও সাম্যবাদ

আমি স্বীকার করছি যে বলশেভিক মতবাদের অর্থ আমি আজ পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারিনি। ঐ মতবাদ সম্বন্ধে আমি এই পর্যন্ত জানি যে ঐ মতবাদ ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রথা রদ করতে চায়। তাই যদি হয় তবে একে আর্থিক ক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় অসংগ্রহ নীতির প্রয়োগ আখ্যা দেওয়া যেতে

পারে। স্বেচ্ছায় যদি জনসাধারণ এই আদর্শ গ্রহণ করে কিংবা শান্তিময় উপায়ে বুঝিয়ে সুঝিয়ে যদি তাদের দিয়ে এ আদর্শ গ্রহণ করান যায়, তাহলে এর মত আর কিছুই হবে না। তবে বলশেভিক মতবাদ সম্বন্ধে যা জেনেছি তাতে দেখছি যে, এই মতবাদ কেবল যে হিংসাকে বর্জনীয় মনে করে না তা-ই নয়, ব্যক্তিগত সম্পত্তিপ্রথাকে উচ্ছেদ করার জন্য এবং রাষ্ট্রের আওতায় তার সামূহিক মালিকানা কায়েম রাখার জন্য অবাধে হিংসা প্রয়োগ সমর্থন করে। এ যদি সত্য হয় তাহলে বিনা দ্বিধায় আমি বলে দিতে পারি যে, প্রচলিত-রূপে বলশেভিক মতবাদ বেশী দিন টিকবে না। কারণ আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে হিংসার পথে স্থায়ী কোন কিছু গড়ে তোলা সম্ভব নয়। তবে যাই হক না কেন বলশেভিক আদর্শের পিছনে যে অসংখ্য নরনারীর পবিত্রতম আত্মবলিদানের শক্তি রয়েছে এবং আদর্শের জন্য তাঁরা যে নিজেদের সব কিছুকে উৎসর্গ করেছেন—এ সত্য সংশয়াতীত। আর লেনিনের মত মহাত্মাদের ত্যাগ ও তিতিক্ষার বনিয়াদের উপর যে আদর্শের সৌধ গড়ে উঠেছে তা কখনও বৃথা যেতে পারে না। তাঁদের ত্যাগ ও তপস্যার মহান উদাহরণ চিরকাল সমুজ্জ্বল থাকবে এবং এর ফলে যতই দিন যাবে এ আদর্শ ত্বরান্বিত ও পরিশুদ্ধ হয়ে উঠবে।

পশ্চিমাগত সমাজতন্ত্রবাদ ও সাম্যবাদ এমন কয়েকটি ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত যার সঙ্গে আমাদের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। এর মধ্যে একটি হল তাদের এই বিশ্বাস যে মূলতঃ মানবস্বভাব স্বার্থপর। আমি একথা স্বীকার করি না। কারণ আমি জানি যে মানুষ ও পশুর মধ্যে মূল পার্থক্য হল এই যে মানুষ তার ভিতরের আত্মার ডাকে সাড়া দিতে পারে। পশুরই মত মানুষের ভিতর ষড় রিপুর অস্তিত্ব থাকলেও সময়ে মানুষ এর ঊর্ধ্বে উঠতে পারে। এইজন্য মানুষ স্বার্থপরতা ও হিংসারূপী পশু স্বভাবের ঊর্ধ্বে বিরাজিত, কারণ এ সবের সঙ্গে অমর মানবীয় বিভূতির কোন সম্বন্ধ নেই।... এইজন্য আমাদের সমাজতন্ত্রবাদ অথবা সাম্যবাদ অহিংসা আধারিত হবে—শ্রমিক ও পুঁজিপতি, জমিদার ও রায়ত সকলের সুসঙ্গত সহযোগিতার ভিত্তিতে এর বনিয়াদ রচিত হবে।

চূড়ান্ত বিশ্লেষণে সাম্যবাদের কি অর্থ দাঁড়ায়? এর অর্থ হচ্ছে এমন এক শ্রেণীবিহীন সমাজ, যে আদর্শ পূর্তির জন্য কাজ করে যাওয়া গৌরবের বিষয়। এ আদর্শ অর্জনের জন্য শুধু যখন শক্তির সাহায্য নেওয়া হয়, তখনি আমি

ভিন্ন পথ ধরি। সবাই আমরা সমান হয়ে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও এতদিন ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের বিরোধাচরণ করেছি। অসাম্যের ভাব ও 'উচ্চ-নীচ'এর ধারণা অন্যায়। তবে বলপ্রয়োগ করে মানুষের মন থেকে অন্যায় দূর করা যায় বলে আমি বিশ্বাস করি না। মানুষের মন এই উপায়ের কাছে নতিস্বীকার করে না।

রুশীয় ধরনের সাম্যবাদে, (অর্থাৎ যে সাম্যবাদকে জোর করে জনসাধারণের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়) ভারতবর্ষ বিদ্রোহী হবে। বিনা হিংসায় সাম্যবাদ স্থাপিত হলে সে হবে আনন্দের বিষয়। কারণ জনসাধারণের জন্য জনসাধারণের প্রতিভূ হিসাবে ছাড়া তখন আর কারও কোন সম্পত্তি থাকবে না। লক্ষপতির হয়ত লক্ষ লক্ষ টাকা থাকতে পারে, কিন্তু সে সব তিনি নিজের কাছে রাখবেন জনসাধারণের জন্য। সর্বসাধারণের হিতের জন্য রাষ্ট্র যখনই চাইবে তার দায়িত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করতে পারবে।

সমাজতন্ত্রবাদী ও সাম্যবাদীদের বক্তব্য হচ্ছে এই যে তাঁরা এখনই আর্থিক সমানতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য কোন কিছু করতে সক্ষম নন। তাঁরা শুধু এর জন্য প্রচার করতে পারেন। এর জন্য তাঁরা জনসাধারণের মনে বৈরীভাব ও বিদ্বেষ সৃষ্টি ও বৃদ্ধি করার কার্যক্রমে বিশ্বাসী। তাঁরা বলেন যে রাজসত্তা হাতে পেলে তাঁরা জনসাধারণকে দিয়ে সাম্যবাদের সিদ্ধান্ত পালন করাবেন। আমার পরিকল্পনায় রাষ্ট্র শুধু জনসাধারণের ইচ্ছা পূর্ণ করবে। কাউকে হুকুম দেওয়া বা নিজ আদেশ জবরদস্তী করে কারও উপর চাপিয়ে দেওয়া সে রাষ্ট্রের কাজ হবে না। ঘৃণার সাহায্যে নয়, প্রেমশক্তি দ্বারা আমি জনসাধারণকে আমার কথা বোঝাব এবং অহিংস পন্থায় আমি আর্থিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করব। সমগ্র সমাজ স্বমতানুবর্তী না হওয়া পর্যন্ত আমি নিশ্চেষ্ট থাকব না। সাম্যের প্রয়োগ আম নিজের উপর দিয়েই আরম্ভ করব। আমি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে পঞ্চাশটি মোটর গাড়ী তো দূরের কথা, যদি আমি মাত্র দশ বিঘা জমিরও মালিক হই, তবু মৎকল্পিত আর্থিক সমানতাকে মূর্ত করতে পারব না। এর জন্য আমাকে অতীব দরিদ্র হতে হবে। বিগত পঞ্চাশ বৎসর বা তারও পূর্ব থেকে আমি এই চেষ্টাই করে আসছি। এই কারণে আমার দাবী হচ্ছে এই যে আমি গোঁড়া কমিউনিস্ট। ধনবানদের মোটরে চড়া ও তাদের কাছ থেকে অন্যান্য সুযোগ সুবিধা নেওয়া ইত্যাদি আমি যা করে থাকি তা শুধু তাদের কাজে লাগিয়ে নেবার জন্য। এতে আমি

তাদের বশীভূত হই না। সর্বসাধারণের হিতার্থে প্রয়োজন বোধ করলে নিমেষে আমি এদের ঝেড়ে ফেলতে পারি।

(১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে গান্ধীজী ও লুই ফিশারের মধ্যে আলোচনার বিবরণ। অনুলিপিকার : শ্রীযুত প্যারেলাল)।

গান্ধীজী : আমার সমাজতন্ত্রবাদী বন্ধুদের ত্যাগ ও আত্মসংযমবৃত্তির মুক্ত কণ্ঠে প্রশংসা করলেও তাঁদের ও আমার পদ্ধতির মধ্যে যে সুস্পষ্ট পার্থক্য তা আমি কখনও গোপন করিনি। তাঁরা প্রকাশ্যভাবে হিংসা এবং তার আনুষঙ্গিক বিষয়ে বিশ্বাসী। অথচ আমার কাছে অহিংসাই সব কিছু।

ফিশার : আপনার সমাজতন্ত্রবাদ বলতে আপনি কি বোঝাতে চান?

"আমার সমাজতন্ত্রবাদের অর্থ হচ্ছে সর্বোদয়। আমি এমন কি মূক, বধির ও অন্ধদের পদানত করে উপরে উঠতে চাই না। ওদের সমাজতন্ত্রবাদে বোধহয় এদের কোন স্থান নেই। ভৌতিক উন্নতিই ওদের একমাত্র লক্ষ্য। যেমন আমেরিকা চায় যে তার প্রতিটি নাগরিকের কাছে যেন একখানি মোটর গাড়ী থাকে। আমার লক্ষ্য কিন্তু এ নয়। আমি আমার ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য স্বাতন্ত্র্য চাই। ইচ্ছা হলে নভোমণ্ডলে দ্যুতিমান জ্যোতিষ্কের কাছে পৌঁছবার স্বাধীনতাও আমার থাকা চাই। তবে তার মানে এ নয় যে আমি এসব করবই। আর কারও সমাজতন্ত্রবাদে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য নেই, সেখানে আপনার নিজের বলতে কিছু নেই—এমন কি নিজের শরীরও নয়।"

"একথা ঠিক যে সমাজতন্ত্রবাদেরও প্রকারভেদ আছে। আমার সুসংস্কৃত সমাজতন্ত্রবাদের অর্থ হচ্ছে প্রত্যেক জিনিসের উপর রাষ্ট্রের অধিকার থাকা উচিত নয়। কিন্তু রাশিয়ায় এ অধিকার আছে। সেখানে আপনার দেহের উপরও সত্যি সত্যি আপনার কোন অধিকার নেই। বিনা দোষে যে কোন মুহূর্তে আপনাকে গ্রেপ্তার করা হতে পারে। তারা আপনাকে যেখানে খুশী পাঠিয়ে দিতে পারে।"

"আপনার সমাজতন্ত্রবাদে কি আপনার সন্তান-সন্ততির উপর রাষ্ট্রের কোন কর্তৃত্ব থাকবে না? নিজের ইচ্ছামত তাদের শিক্ষা দেবার অধিকারও কি কারও এখানে থাকবে না?"

"সকল রাষ্ট্রই এ করে থাকে। আমেরিকাতেও এই চলছে।"

"তাহলে তো রাশিয়া ও আমেরিকায় বিশেষ পার্থক্য নেই।"

"আপনি তো আসলে স্বৈরতন্ত্রের বিরোধী।"

"সমাজতন্ত্রবাদে যদি স্বৈরতন্ত্র নাও হয় তবে একে অন্ততঃ নিষ্কর্মা লোকেদের পাণ্ডিত্যের কচকচি বলতে হবে। আমি তো নিজেকে কমিউনিস্টও বলে থাকি।"

"না না, একথা বলবেন না। নিজেকে কমিউনিস্ট আখ্যা দিয়ে আপনি বিপদ ঘটাবেন। আমি আপনি জয়প্রকাশবাবু প্রমুখ প্রত্যেক সমাজতন্ত্রবাদী চান স্বাধীন ও মুক্ত বিশ্ব। কমিউনিস্টদের লক্ষ্য কিন্তু তা নয়। তাঁরা এমন ব্যবস্থা প্রবর্তনে অভিলাষী, শরীর ও মন উভয়কেই যা গোলাম করে ফেলে।"

"মার্কস সম্বন্ধেও কি আপনার এই অভিমত?"

"কমিউনিস্টরা নিজেদের খেয়াল-খুশী মাফিক মার্কসবাদকে ভেঙ্গেচুরে ঢেলে সেজেছে।"

"লেনিন সম্বন্ধে আপনার মত কি?"

"লেনিন এর সূত্রপাত করেছিলেন এবং স্ট্যালিন একে পূর্ণ করেছেন। কমিউনিস্টরা যখন আপনার কাছে আসেন তখন তাঁদের লক্ষ্য থাকে কংগ্রেসে অনুপ্রবেশ করা এবং অবশেষে কংগ্রেসকে দখল করে এই প্রতিষ্ঠানটিকে স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির মানসে কাজে লাগান।"

"সমাজতন্ত্রবাদীরাও তো এই কথা বলেন। আমার সাম্যবাদ সমাজতন্ত্রবাদ থেকে এমন কিছু পৃথক নয়। এ হচ্ছে এতদুভয়ের মধুর সমন্বয়। সাম্যবাদ বলতে আমি যা বুঝি তা হচ্ছে সমাজতন্ত্রবাদের স্বাভাবিক বিকাশের পরিণাম।"

"কথাটা আপনি ঠিকই বলেছেন। এক সময়ে দুয়ের পার্থক্য করা কঠিন ছিল। আজ কিন্তু সাম্যবাদী ও সমাজতন্ত্রবাদীদের ভিতর পর্বত প্রমাণ ব্যবধান বিদ্যমান।"

"আপনি কি তাহলে স্ট্যালিন মার্কা সাম্যবাদ চান না?"

"ভারতীয় কমিউনিস্টরা কিন্তু ভারতবর্ষে স্ট্যালিন মার্কা সাম্যবাদই স্থাপনা করতে চান। আর তার জন্য অন্যায়ভাবে আপনার নাম ভাঙ্গাতে চান।"

"তাঁরা সে কাজে সফল হবেন না।"

বিদেশের দানের উপর নির্ভর করার পরিবর্তে আমাদের মাটি থেকে যা পাওয়া যায় তাই খেয়ে পরে বেঁচে থাকার মত সাহস ও যোগ্যতা আমাদের

থাকা চাই। নচেৎ স্বাধীন জাতি হিসাবে অস্তিত্ব বজায় রাখার যোগ্যতা আমাদের থাকবে না। বিদেশী আদর্শবাদ সম্বন্ধেও ঐ একই কথা প্রযুজ্য। বিদেশী আদর্শবাদের যতটুকুকে ভারতীয় পরিবেশে আত্তাকৃত ও গ্রহণ করা যায় ততটুকু আমি গ্রহণ করব। তবে সে আদর্শবাদের নীচে মাথা পেতে দিতে আমি রাজী নই।
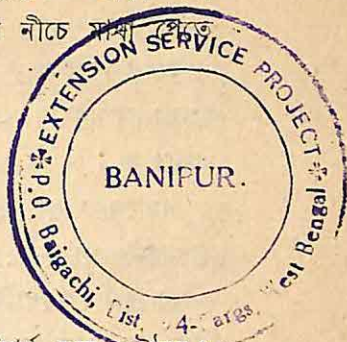
॥ সাত ॥

যান্ত্রিকতার অভিশাপ

পাশ্চাত্ত্যের অনুকরণে ভারত কেন যন্ত্রশিল্পে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে? পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা নগরকেন্দ্রিক। ইংলণ্ড বা ইটালীর মত ক্ষুদ্র রাষ্ট্র নিজেদের দেশের ব্যবস্থাকে নগরকেন্দ্রিক করতে পারে। আয়তনে বিরাট হলেও ঘনবসতিপূর্ণ নয় বলে সম্ভবত আমেরিকারও সে পথ ছাড়া গতি নেই। সবাই কিন্তু একথা মানবে যে, প্রচুর জনসাধারণ-অধ্যুষিত বিরাটায়তন একটি দেশ, যেখানে এমন একটি প্রাচীন গ্রামীণ সংস্কৃতি বিরাজমান, যা তার অতীতের যাবতীয় সমস্যার সমাধান করছে, সেখানে পাশ্চাত্ত্যের প্রতিরূপের অনুকরণ করার দরকার নেই এবং তা উচিতও নয়। বিশেষ কোন অবস্থায় একটি দেশের পক্ষে যা মঙ্গলজনক, অন্য দেশের পক্ষে তা শুভ নাও হতে পারে। একের পক্ষে যা খাদ্য কখনও কখনও অপরের কাছে তা বিষ স্বরূপ হয়।

দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আমি আমার বিশ্বাসের কথা ঘোষণা করতে চাই। এই বিশ্বাস হল—ভূরি উৎপাদনের বাতিকই আজকের বিশ্বব্যাপী সঙ্কটের মূল কারণ। এক মুহূর্তের জন্য একথা যদি ধরেও নিই যে যন্ত্র মানুষের যাবতায় প্রয়োজনের পূর্তি করতে পারে তাহলেও এর পরিণামে উৎপাদন বিশেষ বিশেষ এলাকায় কেন্দ্রীত হবে এবং তার ফলে বণ্টন ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য আপনাদের খামখা হয়রান হতে হবে। অথচ কোন জিনিসের যেখানে প্রয়োজন সেখানেই যদি তার উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা করা যায় তাহলে বণ্টন ব্যবস্থা আপনা আপনি নিয়ন্ত্রিত হয়। এ অবস্থায় প্রতারণার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম এবং ফাটকাবাজীর স্থান তো নেই-ই।

আপনারা লক্ষ্য করছেন যে এইসব জাতি (ইউরোপ ও আমেরিকা) আজ পৃথিবীর তথাকথিত দুর্বল ও অসংগঠিত জাতিসমূহকে শোষণ করতে পারছে। এইসব শোষিত জাতি একবার জ্ঞানের একটা ন্যূনতম পর্যায়ে উপনীত হলে এবং আর তারা শোষিত হবে না একথা স্থির করলে তারা নিজেদের চেষ্টায় যা পেতে পারে তাতেই সন্তুষ্ট বোধ করবে। তখন অন্ততঃ অপরিহার্য প্রয়োজনসমূহ পরিপূর্তির ক্ষেত্রে ভূরি উৎপাদন ব্যবস্থা থাকবে না।

সমাজে যন্ত্রের স্থান অবশ্যই আছে—এ একটা স্থায়ী জিনিস। তবে প্রয়োজনীয় শরীর-শ্রমের পরিবর্তে যন্ত্রের ব্যবহার করা চলবে না। গ্রামের কুটীরে যে-সব যন্ত্রপাতি চলে তার যত রকম সম্ভব উন্নতি হক, এ আমি চাই। কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে আমি একথাও জানি যে দেশের লক্ষ লক্ষ কৃষককে বাড়ীতে বসে কাজ করার মত কোন বিকল্প কর্মের সন্ধান না দিয়ে শক্তি-চালিত সুতাকাটার যন্ত্র প্রবর্তন করে মানুষের হাতকে বেকার করে দেওয়া এক জঘন্য অপরাধ।

যন্ত্রের আপাত বিজয় আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিতে পারবে না। যাবতীয় ধ্বংসাত্মক যন্ত্রের বিরুদ্ধে আমার আপোষবিহীন সংগ্রাম। কিন্তু যে-সব সরল যন্ত্রপাতি ব্যক্তিগত শ্রম সংক্ষেপ করে ও লক্ষ লক্ষ কুটীরবাসীদের পরিশ্রম লাঘব করে তাদের আমি স্বাগত জানাই।

ভারতের সাত লক্ষ গ্রামে যে জীবন্ত যন্ত্র ছড়িয়ে রয়েছে, তার বিরুদ্ধে প্রাণহীন যন্ত্রকে প্রয়োগ করা উচিত নয়। যন্ত্রের উপযুক্ত প্রয়োগের অর্থ হচ্ছে মানুষের কর্মপ্রচেষ্টার সহায়তা করা এবং তার শ্রম লাঘব করা। বর্তমানে যে ভাবে যন্ত্রশিল্পের ব্যবহার হয়, তাতে লক্ষ লক্ষ নরনারীর অবস্থার প্রতি বিন্দুমাত্র দৃকপাত না করে তাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়া হয় এবং সম্পদ ক্রমাগত সঞ্চিত হয় মুষ্টিমেয় জনকয়েকের হাতে।

ব্যাপকভাবে বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের প্রবর্তনের ফলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও উৎপন্ন মাল বিক্রি করার বাজারের সমস্যা দেখা দেবে এবং তার পরিণামে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গ্রামের শোষণ হতে থাকবে। আমাদের তাই স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম গড়ে তোলার প্রয়াস করতে হবে যেখানে উৎপাদন প্রধানত উপভোগের জন্য হবে। শিল্পের এই চারিত্রধর্ম বজায় রেখে গ্রামবাসারা তাঁদের সাধ্যানুসারে যে কোন রকমের আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে

পারেন। কেবল এইটুকু খেয়াল রাখতে হবে যে অপরকে শোষণ করার জন্য যেন এই সব যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত না হয়।

এর সঙ্গে সঙ্গে আমি একথাও বিশ্বাস করি যে দেশে কিছু কিছু মৌলিক শ্রমশিল্পের প্রয়োজন হবে।···কোন্ কোন্ শিল্পকে মৌলিক শ্রমশিল্পের আখ্যা দেওয়া হবে এখন তার সবিস্তার সূচি না দিয়ে আমি কেবল এইটুকু বলব যে, যেখানে অনেক মানুষকে এক সঙ্গে কাজ করতে হয় সেখানকার মালিকানা হবে রাষ্ট্রের। দক্ষ অদক্ষ নির্বিশেষে এইসব জায়গার শ্রমিকদের পরিশ্রমের ফল রাষ্ট্রের মারফৎ ঐ সব শ্রমিকদের উপরই বর্তাবে। তবে কেবল অহিংসার ভিত্তিতেই এ জাতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে ওঠা সম্ভব বলে আমি অর্থশালী ব্যক্তিদের সম্পত্তি জোর করে কেড়ে নেবার প্রস্তাব করব না। রাষ্ট্রীয় মালিকানা স্থাপনার এই পদ্ধতিতে আমি তাঁদের সহযোগিতা যাচ্ঞা করব। ধনী বা নিঃস্ব যিনিই হন না কেন সমাজে অপাঙ্‌ক্তেয় বলে কেউ থাকবে না।

॥ আট ॥

শ্রেণী সংগ্রাম

জনসাধারণকে আমি এই শিক্ষা দিই না যে পুঁজিপতিরা তাঁদের শত্রু। আমি বরং বলে থাকি যে তাঁরা নিজেরাই নিজেদের শত্রু।

ভারতবর্ষের মূল প্রতিভা ন্যায়বিচার-ভিত্তিক ও মৌলিক অধিকার আধারিত ব্যাপক সাম্যবাদের বিকাশ স্বয়ং করতে সক্ষম। সুতরাং শ্রেণী সংগ্রামের সঙ্গে এর কোন সম্বন্ধ নেই। আমার পরিকল্পিত রামরাজ্যে রাজা ও দীন দরিদ্র নির্বিশেষে সবার সমান অধিকারের নিশ্চয়তা থাকবে।

শোষণ ও শোষণের ইচ্ছা বজায় থাকা সত্ত্বেও শোষণকারী ও শোষিতের মধ্যে সহযোগিতা থাকা উচিত—এমন কথা আমি কখনও বলিনি। আমি কেবল এইটুকু বিশ্বাস করি না যে, সব পুঁজিপতি ও জমিদারেরা স্বভাবতই শোষণকারী অথবা তাঁদের এবং জনসাধারণের স্বার্থের মধ্যে কোন মূলগত কিংবা দুরতিক্রম্য বিরোধ বিদ্যমান। সকল শোষণের মূলে রয়েছে শোষিতের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অথবা বাধ্যতামূলক সহযোগিতা। কথাটি স্বীকার করতে

আমরা যতই অনিচ্ছুক হই না কেন, বাস্তব সত্য হল এই যে জনসাধারণ যদি শোষণকারীর নির্দেশ পালন না করে তাহলে শোষণ সম্ভবপর হয় না। কিন্তু স্বার্থ মাঝখানে এসে পড়ে এবং আমরা আমাদের বন্ধকারী শৃঙ্খলটিকেই আঁকড়ে ধরি। এ বন্ধ হওয়া দরকার। সুতরাং এখনকার প্রয়োজন হল জমিদার ও পুঁজিপতিদের বিলুপ্তি নয়, তাঁদের সঙ্গে জনসাধারণের বর্তমান সম্বন্ধের পরিবর্তে এক সুস্থ ও পবিত্র সম্পর্কের স্থাপনা।

শ্রেণী সংগ্রামের ভাবধারা আমার কাছে আকর্ষণীয় বলে মনে হয় না। আমরা যদি অহিংসার বাণী অনুধাবন করি তাহলে ভারতবর্ষে শ্রেণী সংগ্রাম যে কেবল অপরিহার্য নয় তাই নয়, একে পরিহারও করা যেতে পারে। শ্রেণী সংগ্রামকে যাঁরা অপরিহার্য বলেন তাঁরা হয় অহিংসার তাৎপর্য উপলব্ধি করেননি, আর নচেৎ তাঁদের বোধ অত্যন্ত পল্লবগ্রাহী।

আমি জমিদারদের ধ্বংস করতে চাই না, তবে জমিদাররা যে অপরিহার্য—এও আমার মনে হয় না। জমিদার ও অন্যান্য পুঁজিপতিদের আমি অহিংস পদ্ধতি দ্বারা পরিবর্তিত করতে চাই এবং তাই আমার কাছে শ্রেণী সংঘর্ষ অপরিহার্য নয়। কারণ অহিংসার এক অপরিহার্য অঙ্গ হল ন্যূনতম প্রতিরোধের পথ গ্রহণ করা। ক্ষেত চাষীরা নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠা মাত্র জমিদারীর পাপ নির্বীর্য হয়ে পড়বে। কৃষকরা যখন বলবেন ভালভাবে নিজেদের ও নিজ পরিবার পরিজনের খাওয়া পরা এবং শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করার মত পারিশ্রমিক না পেলে তাঁরা ক্ষেতে কাজ করবেন না, তখন জমিদার বেচারী করবেন কি? প্রত্যুত যিনি পরিশ্রম করেন পরিশ্রমলব্ধ ফল তাঁরই। শ্রমিকরা তাই বুদ্ধিমত্তা সহকারে এক হলে এক দুর্দ্ধর্ষ শক্তিতে পরিণত হবেন। এই কারণেই আমি শ্রেণী সংঘর্ষের প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে করি না। একে অপরিহার্য মনে হলে আমি তার কথা প্রচার করতে ও সে সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে ধ বোধ করতাম না।

সমস্যা এ নয় যে একটি শ্রেণীকে অপর শ্রেণীর বিরুদ্ধে নিয়োগ করতে হবে। প্রয়োজন হল শ্রমিকদের নিজ মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা। সত্যি কথা বলতে কি পৃথিবীতে বিত্তশালী লোকের শতকরা হার নগণ্য। শ্রমিকরা যে মুহূর্তে নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হবে অথচ ন্যায়সঙ্গত আচরণ করবে, বিত্তশালীরাও সেই মুহূর্ত থেকে সঠিক আচরণ করবেন। শ্রমিকদের ধনবানদের বিরুদ্ধে উস্কে দেবার অর্থ হল শ্রেণী বিদ্বেষ এবং

তৎসঞ্জাত যাবতীয় কুপরিণামকে স্থায়ী করা। এই দ্বন্দ্ব এক দুষ্টচক্র স্বরূপ এবং যে কোন মূল্যে একে পরিহার করা উচিত। এ হল দুর্বলতার স্বীকৃতি ও হীনমন্যতার দ্যোতক। শ্রম তার নিজ মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন হওয়া মাত্র অর্থ তার যথার্থ স্থান খুঁজে নেবে অর্থাৎ শ্রমিকদের জন্য একে ন্যাস স্বরূপ রাখা হবে। কারণ শ্রম অর্থেরও উর্ধ্বে।

॥ নয় ॥

ধর্মঘট

আজকাল ধর্মঘটের খুব রেওয়াজ উঠেছে। এ হল বর্তমানের অস্থিরতার লক্ষণ। নানা রকমের ভাসা ভাসা ভাবধারা বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। এক অনিশ্চিত আশায় অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছে এবং এই আশা কোন নির্দিষ্ট রূপ না পরিগ্রহ করলে পরে বিরাট হতাশা দেখা দেবে। অন্যান্য জায়গার মত ভারতের শ্রমিকসমাজও তথাকথিত উপদেষ্টা এবং পরিচালকবর্গের কৃপার উপর নির্ভরশীল। এরা সব সময় সৎ হয় না এবং অনেক সময় সৎ হলেও বিজ্ঞ হয় না। শ্রমিকরা স্বীয় অবস্থায় সন্তুষ্ট নয়। অবশ্য অসন্তুষ্ট হবার প্রভূত কারণ আছে। সত্যসত্যই তাদের এই শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যে, নিজেদের তারা যেন মালিকের সম্পদবৃদ্ধির যন্ত্র বলে মনে করে। তাই সামান্য মাত্র প্রচেষ্টাতেই তারা কাজ বন্ধ করে। দেশের রাজনীতিক অবস্থাও ভারতীয় শ্রমিকদের প্রভাবান্বিত করেছে। এ ছাড়া এমন অনেক শ্রমিক নেতা আছেন, যাঁরা ভাবেন যে, রাজনাতিক উদ্দেশ্যে ধর্মঘট করা উচিত।

এ রকম ব্যাপারে শ্রমিকদের ধর্মঘট করা আমার মতে মারাত্মক ভুল। এ কথা আমি অস্বীকার করি না যে, এ জাতীয় ধর্মঘটে রাজনীতিক উদ্দেশ্য সাধিত হবে। তবে একে অহিংস অসহযোগের কার্যক্রমভুক্ত বলা যেতে পারে না। শ্রমিকরা দেশের রাজনীতিক অবস্থাকে না বোঝা পর্যন্ত এবং তারা সর্বসাধারণের মঙ্গলের জন্য কাজ করতে প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত, রাজনীতিক উদ্দেশ্যে শ্রমিকদের ব্যবহার করা যে নিতান্ত বিপজ্জনক, একথা বুঝতে বিশেষ বুদ্ধি খাটানোর দরকার হয় না। উপযুক্তভাবে জীবনধারণের জন্য তারা নিজেদের অবস্থার উন্নতিসাধন না করা পর্যন্ত, হঠাৎ তাদের কাছে এ রকম ব্যবহার আশা করা যায় না।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শ্রমিকরা যে সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান সৃষ্টি করতে পারে, তা হচ্ছে এই যে, তারা নিজেদের অবস্থার উন্নতিসাধন করবে, আরও বেশী খবরাখবর রাখবে, নিজেদের দাবীর উপর জোর দেবে এবং এমন কি যে সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী এত পরিশ্রমে তারা তৈরী করে, তার যাতে উপযুক্ত ব্যবহার হয়, তার জন্য তারা মালিকের কাছে দাবী জানাবে। কারখানার আংশিক ভাগীদারের পর্যায়ে নিজেদের উন্নীত করতে পারলে শ্রমিকদের সত্যকার ক্রমবিকাশ ঘটবে।

স্থতরাং বর্তমান অবস্থায় শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতিসাধন করার জন্যই শুধু ধর্মঘট করা উচিত এবং তাদের ভিতর দেশাত্মবোধের উন্মেষ হলে উৎপাদিত পণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করার জন্যও ধর্মঘট করা যেতে পারে।

সাফল্যজনক ধর্মঘটের নিয়ম খুবই সোজা এবং সে নিয়ম মেনে চললে কোন ধর্মঘট ব্যর্থ হবে না। যেমন—

১। ধর্মঘটের কারণ ন্যায়সঙ্গত হবে।

২। ধর্মঘটকারীদের মধ্যে কার্যত মতৈক্য থাকবে।

৩। যারা ধর্মঘটে যোগদান করেনি, তাদের বিরুদ্ধে কোনরকম হিংসামূলক আচরণ করা হবে না।

৪। শ্রমিকসঙ্ঘের অর্থসাহায্যের মুখাপেক্ষী না হয়ে ধর্মঘটকারীদের নিজেদের ভরণপোষণের ব্যয়নির্বাহ করতে হবে এবং সেজন্য সাময়িকভাবে তারা কোন প্রয়োজনীয় লাভজনক বৃত্তি অবলম্বন করবে।

৫। ধর্মঘটকারীদের বদলে যদি বহুসংখ্যক শ্রমিক পাওয়া যায়, তবে সে ধর্মঘটে কোন প্রতিকার হবে না। সে অবস্থায় তাদের উপর অন্যায় আচরণ হলে বা অপ্রতুল পারিশ্রমিক দেওয়া হলে ইস্তফা দেওয়াই হচ্ছে তার একমাত্র প্রতিকার।

স্বভাবতই যুক্তিসঙ্গত কারণে ছাড়া ধর্মঘট হওয়া উচিত নয়। কোন অন্যায় ধর্মঘট সফল হওয়া উচিত নয়। ঐ জাতীয় ধর্মঘটের প্রতি কোন রকম জনসমর্থন থাকবে না। তবে জনসাধারণের বিশ্বাসভাজন নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের সমর্থন না পেলে কোন ধর্মঘট ন্যায়সঙ্গত কিনা তা বিচার করার অপর কোন উপায় জনসাধারণের হাতে নেই। স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা নিজেদের দাবীর যৌক্তিকতা বিচারের অধিকারী নন। সুতরাং উভয়পক্ষের গ্রহণযোগ্য কোন সালিশী বা বিচার বিভাগীয় হস্তক্ষেপের প্রয়োজন…।

শ্রমিকদের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য প্রারব্ধ ধর্মঘটের কোন রাজনৈতিক গোপন অভিসন্ধি থাকা উচিত নয়। এই জাতীয় জোড়াতালি দেওয়া ব্যাপারের ফলে শেষ অবধি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সংসাধিত হয় না, পক্ষান্তরে সাধারণত ধর্মঘটকারীরাই বিপদে পড়েন। এমন কি ডাক ও তার বিভাগের মত জনসেবামূলক বিভাগের ধর্মঘটের সময়ও মানুষের কাজকর্ম সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত হয় না। সরকারের কিছুটা অসুবিধা হলেও সরকারী কাজকর্ম একেবারে বন্ধ হয়ে যায় না। ধনী লোকেরা ধর্মঘটের সময় নিজেদের জন্য ব্যয়বহুল বিকল্প ডাক ব্যবস্থা খাড়া করতে পারেন। কিন্তু অগণিত জনসাধারণ বহু দিন যাবৎ যে প্রাথমিক সুবিধাটি পেতে অভ্যস্ত ধর্মঘটের ফলে তা থেকে তারা বঞ্চিত হবে। সুতরাং এই সব বিভাগে একমাত্র তখনই ধর্মঘট হওয়া উচিত যখন বিরোধ মীমাংসার আর সব আইনসঙ্গত পন্থা ব্যর্থ হয়েছে।

পূর্বোক্ত বক্তব্য থেকে একথা স্পষ্ট হবে যে রাজনৈতিক ধর্মঘটকে তার নিজস্ব গুণাগুণের ভিত্তিতে বিচার করতে হবে, আর্থিক ধর্মঘটের সঙ্গে তাকে কখনও মিলিয়ে ফেলা বা সম্বন্ধিত করা উচিত হবে না। অহিংস আন্দোলনে রাজনৈতিক ধর্মঘটের স্থান অবশ্যই আছে। তবে কখনও অসংগঠিতভাবে রাজনৈতিক ধর্মঘট শুরু করা হয় না। এ জাতীয় ধর্মঘট প্রকাশ্য ব্যাপার হবে এবং হবে গুণ্ডামীর সম্পর্ক বিরহিত। রাজনৈতিক ধর্মঘটকে এমনভাবে সংগঠিত করতে হবে যাতে তার পরিণামে কখনও হিংসা না দেখা দেয়।

॥ দশ ॥

অধিকার না কর্তব্য

এমন একটি বিষয়ে আমি আলোচনা করতে চাই, সমাজের পক্ষে আজ যা পীড়ার কারণ হয়ে উঠছে। পুঁজিপতি এবং জমিদারেরা তাঁদের অধিকারের কথা বলেন, শ্রমিক আবার অন্যদিকে নিজেদের অধিকারের কথা তোলে, রাজন্যবর্গ বলেন তাঁদের রাজত্ব করার স্বর্গীয় অধিকারের কথা, আর প্রজারা বলে তা প্রতিরোধের কথা। সবাই যদি শুধু অধিকারের প্রতিই জোর দেয় এবং কর্তব্যের খেয়াল না করে, তবে সবকিছু গোলমাল এবং বিশৃঙ্খল হয়ে যাবে।

অধিকারের প্রতি জোর না দিয়ে সবাই যদি নিজের কর্তব্য করে যায় তবে অনতিবিলম্বে মানবসমাজে শান্তির রাজত্ব স্থাপিত হবে। এমন কোন স্বর্গীয় অধিকার রাজন্যবর্গের নেই যে, তাঁরা শুধু শাসন করবেন আর রায়তেরা সসম্মানে তাদের প্রভুর আদেশ মেনে চলবে। একথা যেমন সত্য যে, সমাজের মঙ্গলের পরপন্থী হবার জন্য এইসব উত্তরাধিকারসূত্রে অর্জিত অসাম্যের অবসান ঘটা দরকার, তেমনি সমাজের মঙ্গলেরই জন্য, কাল পর্যন্ত যারা দলিত ছিল, আজ হঠাৎ তাদের এই অসঙ্কোচে স্বাধিকার প্রবর্তনের প্রচেষ্টাও সমান, ও এমনকি বোধহয় অধিকতর হানিকারক। সামান্য কয়েকজন স্বর্গীয় অধিকারের দাবীদারের তুলনায় এই মনোবৃত্তির ফলে বোধ হয় লক্ষ লক্ষ জনসাধারণের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা বেশী। তারা বড়জোর সাহসী বা ভীরুর মত মরতে পারে, কিন্তু এই কয়েকজনের মৃত্যুর ফলে সুখী, পরিতৃপ্ত এবং পরিপাটী জীবনযাত্রার ভিত্তি স্থাপিত হবে না। তাই অধিকার এবং কর্তব্যের পারস্পরিক সম্বন্ধটি বোঝা দরকার। আমার অভিমত হচ্ছে এই যে, সুসম্পাদিত কর্তব্য মারফৎ সরাসরি যে অধিকার অর্জিত হয় না, তার কোন মর্যাদা নেই। এ হবে বিনা অধিকারে কোন কিছু দখল করার মত এবং যত তাড়াতাড়ি একে ত্যাগ করা যায় ততই মঙ্গল। যে হতভাগ্য পিতামাতা প্রথমে সন্তানের প্রতি কর্তব্য পালন না করে তার আনুগত্যের জন্য দাবী জানায়, তারা শুধু করুণার পাত্র। লম্পট স্বামী যদি কর্তব্যপরায়ণ স্ত্রীর কাছ থেকে সর্বতোভাবে বশ্যতার আশা করে তবে তাকে ধর্মীয় বিধানের বিকৃতি ছাড়া আর কিছুই বলা যেতে পারে না। কিন্তু সন্তানের প্রতি কর্তব্য সম্পাদনে উন্মুখ জনক-জননীকে যে সন্তান অবজ্ঞা করে, তাকে অকৃতজ্ঞ বিবেচনা করা হবে এবং এতে তার জনক-জননীর চেয়ে নিজেরই ক্ষতি হবে বেশী। এই একই কথা স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। মালিক ও শ্রমিক, জমিদার এবং চাষী, রাজন্যবর্গ এবং তাঁদের প্রজাপুঞ্জ বা হিন্দু এবং মুসলমান, যার প্রতিই এই সহজ অথচ বিশ্বজনীন নীতি প্রয়োগ করা যাক না কেন, এর ফলে দেখা যাবে যে, সমগ্র বিশ্ব এবং ভারতের জীবনযাত্রা এবং কাজকর্মের ক্ষেত্রে এখন যে সমস্ত গণ্ডগোল রয়েছে, সে সব সৃষ্টি না করেই জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে আনন্দদায়ক সম্পর্ক স্থাপিত করা যেতে পারে। নিজ কর্তব্য এবং তার ফলে উদ্ভূত অধিকারের যথোচিত মর্যাদা দিয়ে তবে আমার বর্ণিত সত্যাগ্রহের অনুশাসনে উপনীত হতে হবে।

মুসলমান প্রতিবেশীর প্রতি হিন্দুর কর্তব্য কি? তার কর্তব্য হচ্ছে মানুষের মত তার সঙ্গে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হওয়া এবং তার সুখদুঃখের অংশ গ্রহণ করে তার বিপদের সময় সহায়তা করা। তবেই তার মুসলমান প্রতিবেশীর কাছ থেকে অনুরূপ ব্যবহার পাবার অধিকার জন্মাবে এবং সম্ভবত প্রত্যাশিত সাড়া পাওয়া যাবে। কোন গ্রামে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলে এবং তাদের মধ্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে সামান্য কয়েকজন মুসলমান থাকলে, সেখানে সেই সামান্য কয়েকজন মুসলমান প্রতিবেশীর প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠদের দায়িত্ব বহুগুণ বেড়ে যায়। এমন কি সেই সামান্য কয়েকজন যেন এমন কথা মনে করার সুযোগ না পায় যে, ধর্মমতের প্রভেদের জন্যে হিন্দুরা তাদের সঙ্গে পার্থক্যমূলক আচরণ করছে। শুধুমাত্র সেই অবস্থাতেই, তার পূর্বে নয়, মুসলমানদের স্বাভাবিক মিত্র হবার অধিকার হিন্দুরা অর্জন করবে এবং বিপৎকালে উভয় সম্প্রদায় সম্মিলিত হয়ে কাজ করবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের ব্যবহার ন্যায়সঙ্গত হওয়া সত্ত্বেও, সামান্য কয়েকজন মুসলমান যদি উপযুক্তভাবে সাড়া না দেয় এবং সমস্ত কাজেরই যদি বিরোধিতা করে, তবে সে হবে মনুষ্যত্বহীনতার নিদর্শন। সে অবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের কর্তব্য কি? সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুযোগে বলপ্রয়োগ করে তাদের পরাভূত করা নিশ্চয়ই নয়। সে হবে জোর করে অপরের অর্জিত সত্ত্ব দখল করা। নিজের ভাই-এর মনুষ্যত্ববিরোধী কাজ যেমনভাবে বন্ধ করা হয়, তাদের কর্তব্যও তখন হবে তেমনি। এই উদাহরণ নিয়ে আরও বিশদ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। শুধু এই ব'লে আমি এই প্রসঙ্গ শেষ করতে চাই যে, উভয় সম্প্রদায়ের সংখ্যা কোথাও ঠিক এর বিপরীত হলেও, এই একই নীতি প্রযুক্ত হবে। যা কিছু আমি বলেছি তাতে সহজেই লাভজনকভাবে এই নীতি বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করা যেতে পারে। প্রথমে কোন কর্তব্য সুচারুরূপে সম্পাদন করার পর প্রত্যেক অধিকার অর্জিত হয়। এই নীতি জনসাধারণ বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করে না বলে বর্তমানে সমগ্র পরিস্থিতি হতাশজনক।

এই একই নীতি রাজন্যবর্গ এবং রায়তদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য। প্রথমোক্তের কর্তব্য হচ্ছে জনসাধারণের খাঁটি সেবকের ন্যায় আচরণ করা। তলোয়ারের জোরে তো নয়ই, বাইরের কারও দ্বারা অর্জিত অধিকারের জোরেও তাঁরা শাসন করবেন না। প্রজ্ঞা এবং সেবার বলে তাঁরা দেশ শাসন করবেন। তাহলে তাঁদের স্বেচ্ছায় দেওয়া কর আদায় করার অধিকার হবে এবং অনুরূপ-

ভাবে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সেবা পাবার তাঁরা আশা করতে পারবেন। তবে তাঁদের নিজেদের জন্য নয়, এ সমস্ত হবে তাঁদের রক্ষণাবেক্ষণাধীন জনসাধারণের জন্য। এই সহজ এবং প্রাথমিক কর্তব্য যদি তাঁরা পালন না করেন, তবে রায়তদের সে অবস্থায় তাঁদের প্রতি কোন রকম পাল্টা কর্তব্য তো নেইই, বরং রাজকীয় জবরদস্তির প্রতিরোধ করাই তাদের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। ঘুরিয়ে বললে এর মানে হচ্ছে এই যে, সে অবস্থায় রায়তরা জবরদস্তি বা কু-শাসন প্রতিরোধ করার অধিকার অর্জন করে। তবে প্রতিরোধ যদি হত্যা, বলপ্রয়োগ এবং লুটপাটের রূপ পরিগ্রহ করে তবে কর্তব্যের দৃষ্টিকোণ থেকে সে হবে মনুষ্যত্বের বিরুদ্ধে অপরাধস্বরূপ। কর্তব্য-সম্পাদন করা দ্বারা স্বাভাবিকরূপে যে শক্তির উদ্ভব হয়, তাকে বলে সত্যাগ্রহের অহিংস এবং দুর্জয় শক্তি।

॥ এগার ॥

বেকারদের সমস্যা

যতদিন একটিও সুস্থ সমর্থ পুরুষ বা নারী বেকার ও ক্ষুধার্ত থাকবে ততদিন নিজেদের নিশ্চেষ্টভাবের জন্য আমাদের লজ্জা বোধ করা উচিত। এ সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত এক বেলা অন্নগ্রহণের অধিকারও আমাদের নেই।

এমন একটি জাতির কথা কল্পনা করুন যারা দৈনিক গড়ে মাত্র পাঁচ ঘণ্টা পরিশ্রম করে। আর এই স্বল্পশ্রম স্বেচ্ছাপ্রণোদিত নয়, পরিস্থিতির চাপে বাধ্যতামূলক। এই হল ভারতবর্ষের বাস্তব চিত্র। পাঠক যদি এ অবস্থা কল্পনা করতে পারেন তাহলে তাঁর মন থেকে শহরের জীবনের ব্যস্ততার, বাহ্যাড়ম্বর, কারখানা-জীবনের ক্লান্তি ও চাবাগানের শ্রমিকদের দাসত্ব—এ সব বাতিল হয়ে যাবে। এ সব হল ভারতীয় জনসমুদ্রে বিন্দুর মত। ভারতবাসী-রূপী নরকঙ্কালের কল্পনা যদি তিনি করতে চান তাহলে তাঁকে কৃষিক্ষেত্রে কর্মরত দেশের শতকরা আশি ভাগ লোকের কথা চিন্তা করতে হবে যাঁদের বছরে অন্তত চার মাস কোন কাজ নেই এবং সেই কারণে যাঁদের অনশনের প্রান্তদেশে থাকতে হয়। এই হল দেশের সাধারণ অবস্থা। পালা করে যে দুর্ভিক্ষ আসে তার ফলে ঐ বাধ্যতামূলক বেকারত্ব বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।

আমরা আমাদের সাত লক্ষ গ্রামকে উপেক্ষা করেছি বলেই আমাদের গড় আয়ু শোচনীয়ভাবে কম এবং দিন প্রতিদিন আমরা আরও দরিদ্র হয়ে চলেছি। গ্রাম সম্বন্ধে আমরা অবশ্য চিন্তা করেছি, তবে তা তাদের শোষণ করার জন্য। "ভারতের অতীত গৌরব" সম্বন্ধে আমরা চিত্তাকর্ষক বিবরণ পাঠ করি এবং শুনি যে এ দেশে দুধ আর মধুর স্রোত বইত; কিন্তু আজ এ দেশে আছে কেবল লক্ষ লক্ষ উপবাসী জনতা।

যে দেশে জমির উপর জনসংখ্যার চাপ সর্বাধিক সে দেশের অর্থব্যবস্থা ও সভ্যতার সঙ্গে বিরল বসতিসম্পন্ন দেশের পার্থক্য আছে এবং থাকবে। বিরল জনবসতির দেশ আমেরিকার হয়ত যন্ত্রের প্রয়োজন আছে। আর ভারতের হয়ত এর দরকার নাও হতে পারে। যে দেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ কাজ পায় না সে দেশে শ্রম সংক্ষেপ করার পদ্ধতির কথা চিন্তা করা অপ্রয়োজনীয় ব্যাপার। ......আমাদের দারিদ্রের কারণ হল দেশীয় শিল্পের অবলুপ্তি এবং তজ্জনিত বেকারত্ব। কয়েক বৎসর পূর্বে কৃষির উপর নির্ভরশীল ভারতবাসীদের সংখ্যা ছিল শতকরা সত্তর জন। আর আজকে এ সংখ্যা হল শতকরা নব্বুই জন। অর্থাৎ পূর্বে যেখানে দেশের শতকরা কুড়ি জনের ভরণপোষণ নির্বাহের উপযুক্ত শিল্প ব্যবসায় ছিল আজ তার অস্তিত্ব না থাকায় জনসাধারণকে বাধ্য হয়ে জমির উপর অবলম্বিত হতে হয়েছে।

দেশের পঁয়ত্রিশ কোটি লোককে খাওয়ানর উপযুক্ত জমি যে নেই তা নয়। ভারতবর্ষে মাত্রাতিরিক্ত মানুষ রয়েছে এবং তাই মৃত্যু ছাড়া তাদের গত্যন্তর নেই, এমন কথা বলা নিরর্থক। আমি দৃঢ়নিশ্চয় যে দেশের সমস্ত জমির যদি সদ্ব্যবহার করা যায় এবং সেই সব জমি থেকে যদি সর্বোচ্চ পরিমাণ ফসল পাওয়ার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় তাহলে তার দ্বারা আমাদের সমগ্র জনসংখ্যার খাদ্য সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। আমাদের কেবল পরিশ্রমী হতে হবে এবং যেখানে আজ এক দানা শস্য জন্মে সেখানে দুই দানা উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে হবে।

বর্তমান অবস্থার প্রতিকার করার পথ হল দরিদ্র গ্রামবাসীদের সঙ্গে একাত্ম হওয়া ও যাতে জমি থেকে সর্বাধিক পরিমাণ ফসল পাওয়া যায় তার জন্য তাকে সাহায্য করা। আমাদের যা প্রয়োজন তা উৎপাদন করার জন্য তাকে সাহায্য করতে হবে এবং সে যা উৎপাদন করে তাতে আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে। আমাদিগকে তাদের মত থাকতে হবে এবং তারা যাতে

অধিকতর যুক্তিসঙ্গত খাদ্যাভ্যাস ও জীবনযাত্রাপদ্ধতি গ্রহণ করে তার জন্য তাদের প্রবুদ্ধ করতে হবে।

আমরা কলে পেষা আটা খাই এবং এমন কি দরিদ্র গ্রামবাসীরাও মাথায় আধ মন বয়ে নিকটবর্তী আটা-কলে পেষাই-এর জন্য নিয়ে যায়।······আমরা হাতে পেষা আটা ব্যবহার করব না এবং দরিদ্র গ্রামবাসীরাও মূঢ়ের মত আমাদের অনুকরণ করে। এইভাবে সম্পদকে আমরা আবর্জনায়, অমৃতকে গরলে পরিণত করি।······কলে পেষাই করা আটার খাদ্যপ্রাণ কম এবং এই আটা বেশী দিন রাখলে কেবল যে তার খাদ্যতত্ত্বেরই অপহ্নব ঘটে না, সে আটা বিষে পরিণত হয়। কিন্তু রোজ তাজা আটা খাবার জন্য পরিশ্রম করতে আমরা রাজী নই এবং পয়সা দিয়ে আমরা অপেক্ষাকৃত অপুষ্টিকর খাদ্যবস্তু কিনে ব্যাধিকে আমন্ত্রণ জানাব। এ কোন দুর্বোধ্য অর্থনৈতিক তত্ত্ব নয়, এ ঘটনা নিত্য আমাদের চোখের সামনে ঘটছে। চাল গুড় ও তেলের ব্যাপারেও ঐ একই কথা। আমরা খাদ্যতত্ত্ব ছেঁটে বাদ দেওয়া চাল খাব এবং বেশী পয়সা দিয়ে কম উপকারী চিনি খাব কিন্তু সস্তা অথচ উপকারী গুড় কিনব না। গ্রামের তৈলকারদের আমরা ধ্বংস করে দিয়ে এখন ভেজাল তেল খাচ্ছি। আমরা গরুর পূজা করি অথচ তিলে তিলে তাকে হত্যা করি। আমরা মৌমাছি মেরে মধু খাই এবং তার ফলে মধু আজ এত দুর্লভ সামগ্রী যে আমার মত "মহাত্মা" অথবা নেহাৎ চিকিৎসকের নির্দেশে ঔষধের অনুপান স্বরূপ ব্যবহারকারী ছাড়া আর কারও পক্ষে পাওয়া দুর্ঘট। আমরা যদি একটু কষ্ট করে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মৌমাছি পালন করা শিখি তাহলে আমরা সস্তায় মধু পাব এবং আমাদের সন্তান সন্ততিরাও এর থেকে প্রয়োজনীয় সবটুকু কার্বোহাইড্রেড পাবে।

আপনাদের কাছে আমার যাচ্ঞা এই যে আপনারা আপনাদের জড়তা ঝেড়ে ফেলুন, জীবনের এই সব বনিয়াদী তত্ত্ব সম্বন্ধে অধ্যয়ন করার জন্য উদ্দীপ্ত হয়ে উঠুন এবং আরও যুক্তিযুক্ত জীবনযাত্রা নির্বাহ করুন ও আবর্জনাকে সম্পদে পরিণত করুন। যুগ যুগের জড়তা যদি ঝেড়ে ফেলতে পারেন তাহলে আপনারা পূর্বোক্ত সাদামাটা সত্যসমূহ উপলব্ধি ও তদনুযায়ী আচরণ করতে পারবেন। আমরা কিন্তু শরীর শ্রম এড়াতে এড়াতে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকেও পঙ্গু করেছি এবং এই কারণে অযৌক্তি খাদ্যাভ্যাস ও জীবনযাত্রা সত্ত্বেও নিশ্চেষ্ট বসে আছি। এবার যেন আমরা তৎপর

হই ও আমাদের শরীর ও মস্তিষ্ককে আরও কার্যকুশল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি।

······দেশের চরম দারিদ্র ও ভীষণ বেকারত্ব দেখে আমি প্রত্যুত অশ্রুমোচন করেছি। তবে আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে এর জন্য দায়ী হল আমাদেরই ঔদাসীন্য ও অজ্ঞতা। শ্রমের মর্যাদা সম্বন্ধে আমরা সচেতন নই। সুতরাং কোন জুতা প্রস্তুতকারী সেই কাজ ছাড়া অপর কিছুই করবেন না, আর সব ধরনের শ্রমকে তিনি অমর্যাদাকর জ্ঞান করবেন। এই ভুল ধারণা দূর করতে হবে। ভারতবর্ষে যাঁরা সততা সহকারে নিজ নিজ হাত পা দিয়ে কাজ করতে চান, তাঁদের জন্য কাজের অভাব নেই। ঈশ্বর প্রত্যেককেই পরিশ্রম করার ক্ষমতা এবং দৈনন্দিন প্রয়োজনীয়তা থেকে কিছু বেশী রোজগার করার শক্তি দিয়েছেন। যিনি তাঁর এই শক্তিকে কাজে লাগাতে প্রস্তুত, অবশ্যই তাঁর কর্মসংস্থান হয়ে যাবে। যিনি সৎভাবে নিজের জীবিকা রোজগার করতে চান তাঁর কাছে কোন রকমের শ্রমই অকিঞ্চিৎকর নয়। কেবল ঈশ্বর প্রদত্ত হাত পায়ের ব্যবহার করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

॥ বার ॥

দরিদ্র-নারায়ণ

যে লক্ষ লক্ষ নামে মানুষ নামাতীত এবং মনুষ্যের বোধাতীত ঈশ্বরকে ডাকে তারই একটি হচ্ছে 'দরিদ্র-নারায়ণ' এবং এর অর্থ হচ্ছে দরিদ্রের ভগবান বা দরিদ্রের হৃদয়ে বিরাজিত ভগবান।

দরিদ্রের কাছে অর্থশাস্ত্রই হচ্ছে অধ্যাত্মবাদ। ঐ সব বুভুক্ষু জন-সাধারণের মনে আপনি আর কোন রকমেই সাড়া জাগাতে পারবেন না। এ সব তাদের কাছে হৃদয়গ্রাহী হবে না। কিন্তু আপনি তাদের কাছে খাদ্য নিয়ে যান, আপনাকে তারা দেবতা মনে করবে। অন্য কিছু চিন্তা করার ক্ষমতা তাদের নেই।

তাদের জীর্ণবস্ত্রপ্রান্তে শক্ত করে বাঁধা মলিন টাকাপয়সা এই হাতে আমি সংগ্রহ করেছি। আধুনিক প্রগতির কথা তাদের সঙ্গে আলোচনা করে দেখুন।

ভগবানের কথা তাদের কাছে বললে তারা আমাকে এবং আপনাকে পাষণ্ড আখ্যা দেবে। ঈশ্বরকে যদি তারা আদৌ চিনে থাকে তবে তারা তাঁকে এক আতঙ্কজনক, প্রতিহিংসাপরায়ণ এবং নিষ্ঠুর অত্যাচারী শক্তি বলেই জানে।

এই দুঃখপ্রদ দারিদ্র থেকে ভারত নিজেকে মুক্ত করে স্বাধীনতার দ্বারদেশে উপনীত হবে এবং তার নবজাগরণ হবে, এই বিশ্বাস আছে বলে আমি অনশনে আত্মত্যাগ করার থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পেরেছি। এই রকম সম্ভাবনায় আস্থা না থাকলে আমার বাঁচার আগ্রহ থাকবে না।

ভগবানের বাণী তাদের সামনে উপস্থিত করার ধৃষ্টতা আমার নেই। ঐ কোটি কোটি বুভুক্ষু জনসাধারণ, যাদের চক্ষু দীপ্তিহীন এবং অন্নই যাদের কাছে ঈশ্বর, তাদের ভগবানের বাণী শোনানো অরণ্যে রোদনেরই সামিল। কর্মের পবিত্র বাণী তাদের সামনে তুলে ধরলে তবেই ভগবানের বাণী তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। সুষ্ঠুভাবে প্রাতরাশ সম্পন্ন করার পর অধিকতর সুষ্ঠু মধ্যাহ্নভোজনের প্রত্যাশায় বসে বসে আমাদের পক্ষে ঈশ্বরের কথা আলোচনা করা খুবই মনোরম। কিন্তু দুবেলা যারা পেট ভরে অন্ন পায় না, তাদের কাছে ভগবানের কথা বলব কোন্ মুখে? তাদের কাছে ঈশ্বর শুধু অন্নবস্ত্রের রূপেই আবির্ভূত হতে পারেন। ভারতীয় কৃষককুল তাদের জমি থেকে অন্ন পায় বটে, তবে বস্ত্রের অভাব পূরণ করার জন্যে তাদের আমি চরখা দিয়েছি। আর আমি সেই অধাহারী, অর্ধনগ্ন কোটি কোটি জনতার একমাত্র প্রতিনিধি বলেই আজ কৌপীন পরে ঘুরে বেড়াই।

কোটি কোটি মূক জনসাধারণের হৃদয়ে যে ঈশ্বরের স্থান, তাঁকে ছাড়া আর কাউকে আমি জানি না। তাঁর অস্তিত্ব তারা বুঝতে না পারলেও আমি পারি। এই কোটি কোটি জনসাধারণের সেবা দ্বারা আমি সেই সত্যরূপী ভগবান অথবা ভগবানরূপী সত্যের উপাসনা করি।

যে ঐশ্বরীয় বিধানের বলে মানুষকে তার দৈনন্দিন আহার্যের অতিরিক্ত আর কিছু দেওয়া হয়নি সে সম্বন্ধে আমরা হয় অজ্ঞ আর নচেৎ উদাসীন। এরই পরিণাম স্বরূপ অসাম্য এবং তৎসংশ্লিষ্ট যাবতীয় দুর্দশার সৃষ্টি। ধনীদের প্রভূত পরিমাণ সম্পদ রয়েছে এবং সেই সব জিনিসের প্রয়োজন না থাকায় সে সব উপেক্ষিত ও তার অপচয় হচ্ছে। পক্ষান্তরে এই সব জিনিসের অভাবে লক্ষ লক্ষ লোক উপবাসী ও তারা শীতে জমে মারা যাচ্ছে। যতটুকু নেহাৎ প্রয়োজন তার বেশী জিনিসের মালিক কেউ যদি না হন তাহলে কারও অভাব

হবে না এবং সকলেই তৃপ্ত হবেন। আজ ধনীরাও দরিদ্রদেরই মত অতৃপ্ত। দরিদ্র ব্যক্তি লক্ষপতি হতে চান এবং লক্ষপতির ইচ্ছা কোটিপতি হবার। সময় সময় কেবল গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হলেও দরিদ্ররা সুখী হন না। তবে পাবার অধিকার তাঁদের রয়েছে এবং তাঁরা যাতে এ পান তা দেখা সমাজের কর্তব্য। যাতে তৃপ্তির ভাব সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে তার জন্য ধনীদের এ বিষয়ে অগ্রণী হওয়া উচিত। তাঁরা যদি নিজ'ধন সম্পত্তিকে মোটামুটি একটি সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখেন তাহলে দরিদ্ররা সহজে খেতে পরতে পাবেন এবং ধনীদেরই সঙ্গে তাঁরাও তৃপ্তির পাঠ পাবেন।

সভ্যতা শব্দটির যথার্থ তাৎপর্য হল চাহিদা বৃদ্ধি করা নয় বরং স্বেচ্ছায় ও স্বতঃপ্রণোদিতভাবে চাহিদা হ্রাস করা। এর পরিণামে সত্যকার সুখ ও তৃপ্তি বৃদ্ধি পায় এবং সেবা করার শক্তিও বাড়ে। ধৈর্যের দ্বারা মানুষ নিজ চাহিদা কমাতে পারে ও এর পরিণামে সুখের অর্থাৎ সুস্থ শরীর ও শান্তিপূর্ণ মনের অধিকারী হবার পথ খুলে যায়।

সেরা নিয়ম হচ্ছে,......লক্ষ লক্ষ জনসাধারণ যা পায় না, দৃঢ়ভাবে তা প্রত্যাখ্যান করা। প্রত্যাখ্যান করার এই যোগ্যতা হঠাৎ আমাদের মধ্যে আসবে না। লক্ষ লক্ষ জনসাধারণের অধিকারে যা নেই, তার সুযোগ সুবিধা গ্রহণ না করার মত মনোবৃত্তি গড়ে তোলাই হচ্ছে প্রথম কাজ ; এবং তার পরবর্তী কাজ হচ্ছে যথাসম্ভব দ্রুত গতিতে আমাদের জীবনযাত্রাপ্রণালীকে এমনভাবে পুনর্গঠিত করা, যা সেই মনোবৃত্তির সাথে মানিয়ে চলতে পারে।

যিশু, মহম্মদ, বুদ্ধ, কবীর, নানক, চৈতন্য, শঙ্কর, দয়ানন্দ, রামকৃষ্ণ ইত্যাদি সহস্র সহস্র জনসাধারণের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছিলেন এবং তাঁদের চরিত্র গড়ে তুলেছিলেন। তাঁদের আবির্ভাবে জগৎ ধন্য হয়েছে। এঁরা আবার সকলেই দারিদ্র বরণ করে নিয়েছিলেন।
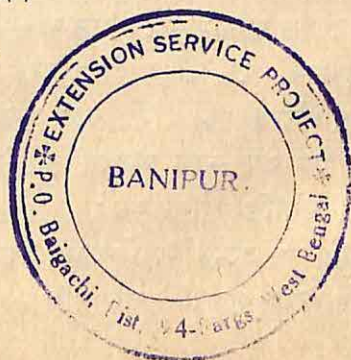
॥ তের ॥

শরীর শ্রম

প্রকৃতির বিধান হল এই যে আমরা যেন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আমাদের অন্নের সংস্থান করি। সুতরাং যিনি এক মুহূর্ত সময়ও আলস্যে অতিবাহিত করেন তিনি সেই পরিমাণে নিজ প্রতিবেশীর বোঝা হয়ে ওঠেন। আর এরকম করার অর্থ অহিংসার প্রথম বিধান ভঙ্গ করা।

নিজের হাতে শ্রম করে মানুষ তার অন্নের সংস্থান করবে এই অনুপম বিধানের প্রথম প্রবক্তা হলেন টি. এম. বন্দেরাফ নামক জনৈক রুশ দেশীয় লেখক। টলস্টয় এই নীতির বহুল প্রচার করেন। আমার মতে গীতার তৃতীয় অধ্যায়েও এই কথা বলা হয়েছে। গীতা বলছেন যে, যজ্ঞ না করে যিনি আহার গ্রহণ করেন তিনি চুরি করা খাদ্য খাচ্ছেন। এখানে যজ্ঞের অর্থ শরীর শ্রম ছাড়া আর কিছু নয়।

যুক্তিও আমাদের অনুরূপ সিদ্ধান্তের দিকে নিয়ে যায়। যিনি শরীর শ্রম করেন না আহার গ্রহণ করার অধিকার তাঁর কি করে হবে? বাইবেলে বলা হয়েছে, "মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তোমরা অন্ন গ্রহণ করবে।" কোন কোটি-পতিকে যদি সমস্ত দিন বিছানায় গড়াগড়ি খেতে হয় এবং এমন কি তাঁকে যদি কেউ খাইয়েও দেন তাহলেও কিছু দিন পরে জীবনধারণই তাঁর কাছে ক্লান্তিজনক হয়ে উঠবে। তিনি সেইজন্য ব্যায়াম করে ক্ষুধাবৃদ্ধি করেন এবং নিজের হাতে খেয়ে থাকেন। ধনী নির্ধন নির্বিশেষে সকলকেই যদি এইভাবে কোন না কোন রকমের ব্যায়াম করতে হয় তাহলে সেই ব্যায়াম কেন উৎপাদক শ্রমের রূপ পরিগ্রহ করবে না? কৃষককে কেউ শ্বাস-প্রশ্বাসের অথবা পেশীর ব্যায়াম করতে বলে না। আর মানব-সমাজের নয় দশমাংশের বেশীই চাষ করে জীবন ধারণ করে। বাকী এক দশমাংশ যদি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠদের পন্থা গ্রহণ করে অন্ততঃ যেটুকু খাদ্য তারা গ্রহণ করে তার জন্য শরীর শ্রম করত তাহলে পৃথিবী আরও কত সুখী স্বাস্থ্য-সম্পদে পরিপূর্ণ ও শান্তির আকর হত!

পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে আজ বিশ্বজোড়া দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ চলেছে। দরিদ্ররা ধনীদের ঈর্ষা করে। সবাই যদি নিজ নিজ অন্নের জন্য শ্রম করত তাহলে

উচ্চনীচের ভেদাভেদ মিটে যেত। সমাজে তখনও হয়ত ধনীর অস্তিত্ব থাকত কিন্তু নিজেদের তাঁরা নিজ সম্পত্তির অছি বিবেচনা করতেন এবং প্রধানতঃ জনসাধারণের হিতার্থে এর ব্যবহার করতেন।

অহিংসার আচরণকারী সত্যের পূজারী ও স্বভাব ব্রহ্মচারীর কাছে শরীর শ্রম বাস্তবিক আশীর্বাদ স্বরূপ। এই শ্রম স্বভাবতই কেবল কৃষিকেন্দ্রিক হবে। তবে বর্তমানে সকলের পক্ষে কৃষিকার্য করা সম্ভব নয়। তবে কৃষিকার্যকে আদর্শ স্বরূপ সামনে রেখে এখনকার মত কৃষির পরিবর্তে শরীর শ্রমকারী সুতা কাটা কাপড় বোনা ছুতার বা কামারের কাজ করতে পারেন। প্রত্যেকে নিজের ভাঙ্গী হবেন। আহার্য গ্রহণের মত অপ্রয়োজনীয় তত্ত্ব পরিত্যাগও করতে হয়। সুতরাং সবাই নিজের নিজের আবর্জনা পরিষ্কার করবেন—এই হল সবচেয়ে ভাল। এটা যদি একান্ত অসম্ভব হয় তবে প্রত্যেক পরিবারকে এ দায়িত্ব নিতে হবে।

মানুষ কি বৌদ্ধিক শ্রম করে অন্ন সংস্থান করতে পারে না? না। শরীরের চাহিদা শরীরকেই মেটাতে হবে। সম্ভবতঃ এখানেও "সীজারের যা প্রাপ্য তা সীজারকে দাও"—বাইবেলের এই নীতিবাক্য প্রযুজ্য। নিছক মানসিক অর্থাৎ বৌদ্ধিক শ্রম আত্মার এলাকাভুক্ত এবং এ জাতীয় শ্রম স্বয়ং এর পুরস্কার। এর বিনিময়ে কদাচ অর্থ দাবী করা উচিত নয়। আদর্শ স্থিতিতে চিকিৎসক আইনজীবী ইত্যাদিরা কেবল সমাজের কল্যাণের জন্যই কাজ করবেন, ব্যক্তিগত স্বার্থে নয়। শরীর শ্রমের নীতি পালন করার ফলে সমাজে এক নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটে যাবে। অস্তিত্বের জন্য সংগ্রামের পরিবর্তে পারস্পরিক সেবার জন্য সংগ্রামের নীতির স্থাপনার মধ্যেই মানুষের বিজয় নিহিত। পাশব বিধানের স্থান নেবে মানবীয় বিধান।

গ্রামে ফিরে যাওয়ার অর্থ হল শরীর শ্রমের কর্তব্য এবং তৎসংশ্লিষ্ট আর সব কিছুকে স্বেচ্ছায় ও নিশ্চিতভাবে স্বীকার করে নেওয়া। কিন্তু সমালোচক বলবেন, "ভারতের লক্ষ লক্ষ সন্তান আজ গ্রামে বাস করে। তবু তাদের প্রায় অনশনে দিনাতিপাত করতে হচ্ছে।" হায়, এ কথা অতীব সত্য। তবে আমরা এও জানি যে তাদের শ্রম স্বেচ্ছাপ্রণোদিত নয়। পারলে তারা এখনই শরীর শ্রম বর্জন করত আর একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই হলে নিকটবর্তী শহরে ছুটে পালিয়ে যেত। মালিকের কাছে বাধ্যতামূলক আনুগত্য দাসত্বের নামান্তর আর পিতার কাছে স্বেচ্ছামূলক আত্মসমর্পণ সন্তানের কাছে

শ্লাঘনীয়। অনুরূপভাবে নিরুপায় হয়ে শরীর শ্রমের নীতি পালন দারিদ্র ব্যাধি ও অসন্তোষের কারণ হয়। দাসত্বেরই নামান্তর এ। আর স্বেচ্ছায় এ নিয়ম পালন করলে তৃপ্তি ও স্বাস্থ্যের সূত্রপাত হয়। আর আসল সম্পদ হল এই স্বাস্থ্য, রৌপ্য ও স্বর্ণখণ্ড নয়।

ভিক্ষাবৃত্তি

আমার অহিংসা কোন সুস্থ মানুষের কাছ থেকে কাজ না নিয়ে তাকে খেতে দেবার পরিকল্পনা বরদাস্ত করে না। আর আমার হাতে ক্ষমতা থাকলে যেসব সদাব্রত থেকে আহার্য দান করা হয় সেগুলি সব বন্ধ করে দিতাম। এইগুলি জাতিকে অধোগামী করেছে এবং এদের দ্বারা জাড্য আলস্য ভণ্ডামী এবং এমন কি অপরাধবৃত্তি প্রোৎসাহিত হয়েছে। এ জাতীয় অপাত্রে করুণার ফলে ভৌতিক বা আধ্যাত্মিক—জাতির কোনরকম সম্পদ তিলমাত্র বর্ধিত হয় না, দাতার মনে কেবল মিথ্যা সদাচারের অহঙ্কার সৃষ্টি হয়। এর পরিবর্তে দাতা যদি এমন সব প্রতিষ্ঠান খুলতেন যেখানে কাজের বিনিময়ে মানুষকে স্বাস্থ্যময় ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশে আহার্য দেবার ব্যবস্থা থাকত তাহলে তা কত সুন্দর ও বুদ্ধিমত্তার কাজ হত। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে চরখা ও সুতাকাটার অন্যান্য প্রক্রিয়া এই সব কেন্দ্রে আদর্শ পেশা হবে। তবে এ যদি কারও পছন্দ না হয় তবে অন্য কোন রকমের কাজ দেবার ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। কেবল নীতি এই হবে যে "কাজ না করলে খাবার পাওয়া যাবে না।" প্রত্যেক শহরেই দুরূহ ভিক্ষুক সমস্যা রয়েছে এবং এ সমস্যার জন্য দায়ী বিত্তশালী সম্প্রদায়। আমি অবশ্য জানি যে কুঁড়ে লোকেদের মুখের উপর বিনা পয়সার খাবার ছুঁড়ে দেওয়া সহজ; কিন্তু কাজের বিনিময়ে আহার্য দেবার প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করা অপেক্ষাকৃত কঠিন। আর্থিক দিক থেকেও অন্ততঃ প্রথমাবস্থায় কাজের বিনিময়ে লোককে খেতে দেবার ব্যবস্থা সদাব্রতে খাওয়ানর ব্যবস্থার চেয়ে ব্যয়বহুল হবে। তবে এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই যে, দেশে যে ভাবে দ্রুত গতিতে ভবঘুরেদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে তা যদি আমরা না চাই তাহলে শেষ অবধি কাজের বিনিময়ে খেতে দেবার ব্যবস্থা সস্তা প্রতীয়মান হবে।

আমি মনে করি যে ভিক্ষাবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেওয়া যেমন অন্যায় কোন ভিখারীকে তেমনি কাজ এবং তার বিনিময়ে আহার্য না দিয়ে ফিরিয়ে

দেওয়াও অনুচিত। তবে সে কাজ করতে না চাইলে তাকে আমি খেতে দেব না। তবে খঞ্জ ও বিকলাঙ্গদের মত যারা শরীরের দিক থেকে অশক্ত তাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব রাষ্ট্রের নেওয়া উচিত। অবশ্য মেকী অন্ধত্ব এবং এমনকি যথার্থ অন্ধত্বের অন্তরালেও বহুবিধ প্রতারণা চলে। অনুচিত পন্থায় অর্থোপার্জন করে বহু অন্ধ ধনী হয়েছে। তাদের এভাবে প্রলোভনের শিকার হতে না দিয়ে কোন আশ্রয়কেন্দ্রে পাঠাতে পারলে ভাল হত।

॥ চৌদ্দ ॥

সর্বোদয়

......আমি নাতাল রওনা হলাম।...পোলক আমাকে তুলে দিতে স্টেশনে এসেছিলেন। রাস্কিনের "আনটু দিস লাস্ট" নামক বইখানি আমার হাতে দিয়ে তিনি বললেন, "এই বইখানি পড়ার উপযুক্ত। এটি পড়ে দেখবেন, নিশ্চয় আপনার ভাল লাগবে।"

বইখানি পড়া আরম্ভ করে দেখলাম যে শেষ না করে সেটি রেখে দেওয়া যায় না। বইটি আমার মনকে আকর্ষণ করে নিল। বই-এ কথিত আদর্শ কার্যত গ্রহণ করার জন্য আমি কৃতনিশ্চয় হলাম।...এই বইখানি আমার জীবনে তখন তখনই মহত্ত্বপূর্ণ পথ গ্রহণ করার উপযুক্ত পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। পরে আমি বইখানির অনুবাদ করেছিলাম ও তার নাম দিয়েছিলাম "সর্বোদয়।"

যে সমস্ত গভীর বিশ্বাস আমার হৃদয়ে নিহিত ছিল, বইখানিতে আমি তারই কতগুলির প্রতিবিম্ব দেখতে পেলাম। সেইজন্য বইখানি আমার উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং বইটির বক্তব্য অনুযায়ী আমাকে দিয়ে কাজও করিয়ে নিয়েছিল।

সর্বোদয়ের সিদ্ধান্ত আমার মতে নিম্নরূপ ঃ

১। সকলের মঙ্গলেই নিজের মঙ্গল নিহিত।

২। একজন উকীল ও একজন নাপিতের কাজের পারিশ্রমিক একই রকম হওয়া চাই। কারণ জীবিকা অর্জনের অধিকার উভয়েরই সমান।

৩। কৃষক ও শ্রমিকের জীবনই আদর্শ জীবন।

প্রথম বিষয়টি আমি জানতাম। দ্বিতীয়টি আমি অস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতাম। তৃতীয়টির কথা আমি ভাবিনি। প্রথমটির ভিতর যে অপর দুটি সিদ্ধান্তই রয়েছে তা "সর্বোদয়" পড়ার পর আমার কাছে দিবালোকের মত স্পষ্ট হল।

নীতিশাস্ত্র সম্মত পথে চলার অর্থ হল আমাদের মন ও ইন্দ্রিয়কে জয় করা। আমরা দেখেছি যে, মন এক বিরামহীন পক্ষী ; এ যত পায় ততই চায় এবং তার পরও অতৃপ্ত থাকে। যতই আমরা ইন্দ্রিয়াসক্তির প্রশ্রয় দেব ততই তারা উদ্দাম হয়ে উঠবে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা তাই আসক্তির একটা সীমা নির্দেশ করেছিলেন। তাঁরা দেখেছিলেন যে সুখ একটা মানসিক স্থিতি। কোন মানুষ ধনী বলেই সুখী অথবা দরিদ্র বলেই দুঃখী হয় না। সময় সময় দেখা যায় যে ধনীরা দুঃখী এবং গরীব লোক সুখী। বহুসংখ্যক লোক চিরকাল গরীব থেকে যাবে। এই সব দেখে আমাদের পূর্বপুরুষেরা বিলাস ও সম্ভোগের পথ থেকে আমাদের প্রতিনিবৃত্ত করেছিলেন।...আমরা যে কলকব্জা আবিষ্কার করার পদ্ধতি জানতাম না তা নয়। আমাদের পূর্বজেরা জানতেন যে আমরা ঐসব জিনিসের পিছনে মন লাগালে আমরা ক্রীতদাসে পরিণত হব ও আমাদের নৈতিকতা অদৃশ্য হবে। সেইজন্য বহু ভেবেচিন্তে তাঁরা স্থির করেছিলেন যে আমাদের হাতে পায়ে যা করা সম্ভব আমরা কেবল তাই করব। তাঁরা বুঝেছিলেন যে আমাদের হাত-পাকে ঠিক মত কাজে লাগতে পারলেই আমরা সুখ ও স্বাস্থ্যের অধিকারী হব।

ঈশ্বরের নামে এবং তাঁকে উৎসর্গ করে যে কাজই করা হক না কেন তা কখনও তুচ্ছ হতে পারে না। এই ভাবে কাজ করলে সব কাজই সমান মহত্ত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। যে রাজা তাঁর নামে নিছক অছি স্বরূপ তাঁর প্রতিভার বিনিয়োগ করেন তাঁর কাজের সঙ্গে কোন ঝাড়ুদারের ঈশ্বরে নিবেদিত কাজের কোন তফাৎ নেই।

অহিংসায় বিশ্বাসী ব্যক্তি ইউটিলেটারিয়ানদের সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের সর্বোচ্চ পরিমাণ কল্যাণের নীতির সমর্থক হতে পারে না। সকলের সর্বাধিক পরিমাণ কল্যাণ সাধনের চেষ্টা তিনি করবেন এবং নিজ লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য প্রাণপাত করবেন। আর সকলে যাতে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করতে পারে তার জন্য তিনি মরতে প্রস্তুত থাকবেন। স্বয়ং মৃত্যু বরণ করে তিনি অপর সকলের সঙ্গে নিজেরও সেবা করবেন। সকলের সর্বাধিক পরিমাণ কল্যাণের ভিতর

অবশ্য সর্বাধিক সংখ্যকের সর্বোচ্চ কল্যাণও নিহিত এবং তাই তিনি ও ইউটিলেটারিয়ানরা বহুক্ষেত্রে একসঙ্গে চলতে পারেন। তবে এমন একটা সময় আসবে যখন তাঁদের চলার পথ ভিন্ন হবে এবং তাঁদের পরস্পরবিরোধী ক্ষেত্রে কাজ করতে হবে। কোন যুক্তিবাদী ইউটিলেটারিয়ান কখনও আত্মোৎসর্গ করবেন না। কিন্তু সর্বোদয়ে বিশ্বাসী প্রয়োজনবোধে আত্মদান করবেন।

তাঁরা বলেন, "উপায় তো উপায়ই" আমি বলি "উপায়ই তো সব কিছু।" উপায় যেমন হবে লক্ষ্যও হবে তেমনি। উপায়কে লক্ষ্য থেকে পৃথক করার কোন সীমারেখা নেই। বাস্তব পক্ষে আমাদের স্রষ্টা কেবল উপায়ের উপর আমাদের নিয়ন্ত্রণাধিকার দিয়েছেন এবং তাও অত্যন্ত সীমিত। লক্ষ্যের উপর এ জাতীয় কোন অধিকার তিনি আমাদের দেননি। পন্থা যতটা সৎ হবে লক্ষ্য পরিপূর্তিও হবে সেই পরিমাণে। এ নীতির কোন ব্যতিক্রম নেই।

অশুদ্ধ পন্থার পরিণাম অশুদ্ধ লক্ষ্য। সুতরাং রাজার গলা কাটলে রাজা ও প্রজা সমান হবে না। মালিক ও কর্মচারীর ভিতর সাম্য আনার পন্থাও এ নয়। অসত্যের পথে সত্যে উপনীত হওয়া যায় না। একমাত্র সত্যনিষ্ঠ আচরণই সত্যে উপনীত হবার সোপান। অহিংসা ও সত্য কি দুই পৃথক বস্তু নয়? দ্ব্যর্থহীন "না" হল এ প্রশ্নের উত্তর। সত্যের ভিতর অহিংসা নিহিত এবং অহিংসার ভিতর সত্য ওতপ্রোত। এইজন্য বলা হয়ে থাকে যে এরা একই মুদ্রার দুই পিঠ। এর একটিকে অপরটি থেকে পৃথক করা যায় না।

॥ পনর ॥

সর্বোদয়ী রাষ্ট্র

মাথা নেড়ে অনেকেই বলেছেন, "কিন্তু জনসাধারণকে আপনি অহিংসায় দীক্ষিত করতে পারেন না। একমাত্র ব্যক্তিগতভাবেই কারও পক্ষে অহিংস হওয়া সম্ভব এবং তাও খুব বিরল ক্ষেত্রে।" আমার মতে এ এক বিরাট আত্মপ্রতারণা। মানব-সমাজ স্বভাবত অহিংস না হলে কবে এ নিজেকে নিজে ধ্বংস করে ফেলত। কিন্তু হিংস ও অহিংস শক্তির লড়াই-এ শেষ পর্যন্ত চিরকালই অহিংসা বিজয়ী হয়েছে। আসল কথা হচ্ছে এই যে রাজনৈতিক

লক্ষ্য হিসাবে জনসাধারণের ভিতর অহিংসা প্রচারের জন্য আমরা কখনও যথেষ্ট ধৈর্য সহকারে আন্তরিক প্রয়াস করিনি।

আমার কাছে রাজনৈতিক ক্ষমতা স্বয়ং কোন লক্ষ্যবস্তু নয়, এ হল জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি ঘটাবার অন্যতম সাধন মাত্র। রাজনৈতিক ক্ষমতার অর্থ হল জাতীয় প্রতিনিধিদের দ্বারা জাতীয় জীবন নিয়ন্ত্রিত করার যোগ্যতা। তবে জাতীয় জীবন যদি স্বয়ং নিয়ন্ত্রিত হবার মত শুদ্ধ হয়ে ওঠে তাহলে আর প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থার প্রয়োজন ঘটে না। তখন প্রজ্ঞামূলক নৈরাজ্যবাদের স্থিতি আসে। এই রকম রাষ্ট্রে সকলেই নিজ নিজ শাসক হন। তিনি এমনভাবে নিজেকে শাসন করেন যাতে কখনও তিনি প্রতিবেশীর অসুবিধার কারণ না হন। এই জাতীয় আদর্শ রাষ্ট্রে তাই রাজনৈতিক ক্ষমতার চিহ্ন থাকে না, কারণ এখানে রাষ্ট্রের অস্তিত্বই নেই। তবে মনুষ্য জীবনে কোন আদর্শের পূর্ণমাত্রায় পরিপূর্তি হয় না। এইজন্য থোরো কথিত সেই চিরায়ত উক্তির সার্থকতা—সেই সরকারই সর্বোত্তম যা সর্বাপেক্ষা কম শাসন করে।

রাষ্ট্রের ক্ষমতাবৃদ্ধির প্রতিটি প্রচেষ্টা আমি অত্যন্ত শঙ্কিত চিত্তে লক্ষ্য করে থাকি। কারণ বাইরে থেকে এ প্রচেষ্টার পরিণাম শোষণ হ্রাস করে মানুষের কল্যাণ সাধন বলে মনে হলেও যাবতীয় প্রগতির মূলাধার ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের বিনাশ সাধন করে বলে রাষ্ট্রের ক্ষমতাবৃদ্ধি প্রত্যুত মানব-সমাজের সর্বাপেক্ষা অধিক অকল্যাণকারী রাষ্ট্র হচ্ছে ঘনীভূত এবং সুসংগঠিত হিংসার প্রতিনিধি। ব্যক্তি-মানবের আত্মা আছে, কিন্তু রাষ্ট্র আত্মার অস্তিত্ববিহীন এক যন্ত্র বলে এর অস্তিত্বের জীবনকাঠি—হিংসার প্রভাব থেকে একে মুক্ত করা কদাচ সম্ভব নয়।

দণ্ড-শক্তি আধারিত প্রতিষ্ঠান আমি চাই না। রাষ্ট্র এই জাতীয় একটি প্রতিষ্ঠান। তবে সমাজে স্বেচ্ছামূলক সহযোগিতার আধারে গঠিত প্রতিষ্ঠান তো থাকবেই।

আদর্শ সমাজে কোন সরকার থাকবে কি থাকবে না এ নিয়ে এখন মাথা ঘামাবার প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয় না। এই জাতীয় সমাজ স্থাপনা করার জন্য যদি আমরা কাজ করতে থাকি তাহলে ধীরে ধীরে অন্ততঃ এই পরিমাণে এ সাকার হবে যার দ্বারা জনসাধারণের কল্যাণ সম্ভব। ইউক্লিড কথিত সরল রেখার কোন দৈর্ঘ্য নেই। তবে এ যাবৎ কেউ এরকম

রেখা অঙ্কন করতে পারেননি এবং পারবেনও না। তবে একথাও ঠিক যে ইউক্লিডের এই আদর্শ সামনে রেখেই আমাদের পক্ষে জ্যামিতিতে উন্নতি করা সম্ভবপর হয়েছে। জ্যামিতিতে যা সত্য সব রকমের আদর্শের বেলাতেও তা সত্য।

স্মরণ রাখতে হবে যে পৃথিবীর কোথাও শাসনব্যবস্থা-বিহীন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নেই। যদি কোন দিন এরকম ঘটা সম্ভবপর হয় তাহলে ভারতেই তা হবে। কারণ একমাত্র আমাদের দেশেই অন্তত এর একটা চেষ্টা হয়েছে। অবশ্য এখনও আমরা এর জন্য প্রয়োজনীয় যথোপযুক্ত পরিমাণ সাহসের পরিচয় দিতে পারিনি। এ লক্ষ্য সিদ্ধির মাত্র একটিই উপায় আছে। এ আদর্শে বিশ্বাসীদের নিজ বিশ্বাসের পরিচয় দিতে হবে। আর এর জন্য যেমন আমরা কারাগারের ভয় জয় করেছি তেমনি মৃত্যুভয় সম্পূর্ণ বর্জন করতে হবে।

পুলিশবাহিনী

অহিংস রাষ্ট্রেও পুলিশবাহিনীর দরকার হতে পারে। আমি স্বীকার করছি যে এ আমার অপূর্ণ অহিংসার নিদর্শন। আমার একথা ঘোষণা করার সাহস নেই যে সেনাবাহিনীর মত পুলিশের প্রয়োজনও আমরা বর্জন করতে পারি। আমি অবশ্য এমন রাষ্ট্রের কথা কল্পনা করতে পারি যেখানে পুলিশের প্রয়োজন ঘটবে না। তবে সে আদর্শে আমরা পৌঁছাতে পারব কিনা একমাত্র ভবিষ্যৎ-ই তা বলতে পারবে।

তবে আমার কল্পনার পুলিশ আজকের পুলিশদের থেকে একেবারে পৃথক। অহিংসায় বিশ্বাসী ব্যক্তিদের নিয়ে এই বাহিনী গড়া হবে। তাঁরা জনসাধারণের সেবক হবেন, প্রভু হবেন না। জনসাধারণ স্বভাবতই তাঁদের সব রকমের সাহায্য দেবেন এবং পারস্পরিক সহযোগিতার দ্বারা তাঁরা ক্রমশ ক্ষীয়মান অশান্তি নিরসনে সফলকাম হবেন। এই পুলিশবাহিনীর হাতে কোন না কোন ধরনের অস্ত্র থাকলেও এর ব্যবহার হবে কদাচিৎ, এমন কি কখনই না। পুলিশেরা প্রত্যুত হবেন সংস্কারক। তাঁদের পুলিশের কাজ মূলত দস্যু ও ডাকাতদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। অহিংস রাষ্ট্রে শ্রমিক মালিক বিরোধ অথবা ধর্মঘট হবে কচিৎ কখনও। কারণ অহিংস সংখ্যাগরিষ্ঠদের প্রবল প্রভাব সমাজের প্রধান প্রধান অঙ্গের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবে। একই কারণে অহিংস রাষ্ট্রে কোন সম্প্রদায়িক বিবাদও হবে না।

॥ ষোল ॥

অহিংস অর্থব্যবস্থা

আমার বিবেচনায় আমরা প্রত্যেকেই এক এক ধরনের তস্কর। এখনই আমার যা দরকার নয়, এমন কিছু নিয়ে রেখে দিলে, সেটা অপর কারও কাছ থেকে চুরি করা হয়। প্রকৃতির একটি মৌলিক নীতি হচ্ছে এই যে, প্রকৃতি নির্বিচারে আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাবার উপযুক্ত দ্রব্যসামগ্রী উৎপন্ন করে এবং প্রত্যেকে যদি নিজের প্রয়োজনটুকু মেটায়, আর তার বেশী কিছুই গ্রহণ না করে, তবে দুনিয়ায় দারিদ্র থাকবে না এবং অনশনে কারও জীবন যাবে না। আমি সমাজতন্ত্রবাদী নই এবং বিত্তবানদের সম্পদ জোর করে কেড়েও নিতে চাই না। তবে সঙ্গে সঙ্গে এও বলতে চাই যে আমাদের মধ্যে যারা ব্যক্তিগতভাবে অন্ধকারের মধ্যে আলোর সন্ধান চান, তাঁদের এই নীতি অনুসরণ করতে হবে। কারও সম্পত্তি জোর করে কেড়ে নেওয়া অহিংস নীতির বিরোধী বলে আমি ও-পথে চলতে চাই না। আমার চেয়ে কারও যদি বেশী থাকে তো থাকুক। তবে আমার নিজের জীবন নিয়ন্ত্রণ করার দিক থেকে যা আমার নেহাৎ প্রয়োজনীয় নয় তার চেয়ে বেশী কিছু আমার চাইবার স্পর্ধা নেই।

ভারতে এমন বহু লোক আছে, যাদের একবেলা আহার করেই সন্তুষ্ট থাকতে হয় এবং স্নেহময় পদার্থের সম্পর্কবিহীন একটু নুনের সহযোগে একটি চাপাটী মাত্র হয় সেই একবেলার আহার। এই কোটি কোটি জনসাধারণ খেতেপরতে না পাওয়া পর্যন্ত আপনার বা আমার আজ যা আছে তাতে কোন অধিকার নেই। আপনার বা আমার দেশের অবস্থা অন্যের চেয়ে ভাল জানা উচিত বলে এই প্রচণ্ড দারিদ্রের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের প্রয়োজনকে সীমিত করা দরকার এবং তারা যাতে খেতে পরতে পারে ও তাদের যত্ন হয় তার জন্য এমনকি স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে আমাদের ক্লেশ বরণ করা দরকার।

আমার মতে ভারতবর্ষের, শুধু তাই বা কেন—সমগ্র পৃথিবীর আর্থিক ব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত যাতে কারও অন্ন বস্ত্রের অভাব না থাকে। অর্থাৎ প্রত্যেকে যেন যথেষ্ট কাজ পায় যার দ্বারা তার পক্ষে সংসার ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব হয়। আর তখনই এ আদর্শ বিশ্বজনীন ভিত্তিতে উপলব্ধ হতে পারে

যখন জীবনযাত্রার পক্ষে অপরিহার্য প্রাথমিক পণ্যসমূহের উৎপাদনের সাধন জনসাধারণের করায়ত্ব হবে। ঈশ্বর প্রদত্ত হাওয়া ও জলের মতই এগুলি সকলের কাছে লভ্য হবে, অপরকে শোষণ করার জন্য অন্ন বস্ত্র নিয়ে ব্যবসা করা চলবে না। কোন দেশ জাতি বা ব্যক্তিগোষ্ঠী কর্তৃক এর উপর একচেটিয়া কর্তৃত্ব করা অন্যায়। এই সহজ নীতিটিকে উপেক্ষা করার জন্যই আজ কেবল এই দুর্ভাগা দেশেই নয়, পৃথিবীর অন্যত্রও দারিদ্র ও অনটন দৃষ্টিগোচর।

অহিংস স্বাধীনতার চাবিকাঠি হল আর্থিক সাম্য। আর্থিক সাম্যের জন্য কাজ করার অর্থ হল পুঁজি ও শ্রমের চিরকালীন বিবাদের নিরসন। অর্থাৎ এক দিকে অল্প সংখ্যক ধনী, যাঁদের হাতে দেশের অধিকাংশ সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়েছে, তাঁদের বিত্তের পরিমাণ হ্রাস করা এবং অন্য দিকে প্রায় বুভুক্ষু ও নগ্ন জনসাধারণকে টেনে উপরে তোলা। ধনী ও ক্ষুধার্ত লক্ষ লক্ষ জনসাধারণের ভিতর যে পার্থক্য রয়েছে তা যতদিন থাকবে ততদিন অহিংস শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলা কোন মতেই সম্ভব হবে না। নূতন দিল্লীর প্রাসাদ ও দরিদ্রদের মাথা গোঁজার দুর্দশাগ্রস্ত ঠাঁইগুলির মধ্যে যে অসাম্য স্বাধীন ভারতে তা একদিনের জন্যও থাকতে পারে না। কারণ তখন দরিদ্ররা দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ ধনীরই মত অধিকার ভোগ করবে। স্বেচ্ছায় যদি ধন ও তৎসঞ্জাত অধিকার ও প্রতিপত্তি বর্জন করে তাকে সকলের কল্যাণের জন্য মিলে মিশে ভোগ না করা যায় তাহলে কোন না কোন দিন হিংসা আধারিত রক্তাক্ত বিপ্লব হতে বাধ্য।

আজকে দেশে প্রচণ্ড আর্থিক অসাম্য বিদ্যমান। সমাজবাদের আধার হল আর্থিক সাম্য। বর্তমানের এই অধার্মিক অসাম্য, যেখানে জনকয়েক সম্পদের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছে অথচ অধিকাংশ জনসাধারণের পক্ষে দু বেলা পেট ভরে খাওয়া সম্ভব নয়, এ রামরাজ্যের পরিপন্থী।

সমবণ্টনের আসল তাৎপর্য হল এই যে প্রতিটি মানুষের কাছে তার স্বাভাবিক প্রয়োজনীয়তা-সমূহের পরিপূর্তির সঙ্গতি থাকবে কিন্তু তার বেশী নয়। উদাহরণ স্বরূপ দুর্বল পাকযন্ত্রে কারও আধ পোয়া আটার রুটি দরকার হতে পারে এবং কারও আবার আধ সের আটার রুটী খেয়ে হজম করার শক্তি থাকতে পারে। এ ক্ষেত্রে উভয়েরই নিজ প্রয়োজন পূর্তির সুযোগ থাকা উচিত। এই আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য সমগ্র সামাজিক কাঠামোরই পুনর্গঠন করা প্রয়োজন। অহিংসার উপর আধারিত

সমাজব্যবস্থার অপর কোন লক্ষ্য থাকতে পারে না। পূর্ণ মাত্রায় লক্ষ্যের সংসাধন হয়ত সম্ভব নাও হতে পারে; কিন্তু এ আদর্শের কথা মনে সদা জাগরূক রাখতে হবে এবং এর সন্নিকটবর্তী হবার জন্য অবিরাম প্রয়াস চালিয়ে যেতে হবে। এ আদর্শের অভিমুখে আমরা যতটা অগ্রসর হব সেই পরিমাণে সুখ ও তৃপ্তি পরিদৃষ্ট হবে। আর অহিংস সমাজব্যবস্থা রচনার পথেও আমরা ততটা সফলকাম হব।

আর সকলের জন্য অপেক্ষা না করে ব্যক্তিগতভাবে কারও পক্ষে এ জাতীয় জীবনযাত্রা পদ্ধতি গ্রহণ করা অবশ্যই সম্ভব। আর কোন ব্যক্তির পক্ষে যদি এ জাতীয় আচার সংহিতা অনুসরণ করা সম্ভব হয় তাহলে স্বভাবতই কোন ব্যক্তি-গোষ্ঠীর পক্ষেও তা করা সম্ভব। এই কথাটির উপর আমি জোর দিতে চাই যে সঠিক পথ গ্রহণ করার জন্য কেউ যেন আর কারও অপেক্ষা না করেন। কোন আদর্শের সম্যক উপলব্ধি সম্ভব নয়—এ রকম আশঙ্কা হলে মানুষ সাধারণত তার সূত্রপাত করতে ইতস্তত করে। এ জাতীয় মনোভাব প্রত্যুত প্রগতির পরিপন্থী।

এবার দেখা যাক অহিংসার মাধ্যমে কি করে সমবণ্টনের নীতিকে কার্যকরী করা যায়। এর প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে এ আদর্শে বিশ্বাসীকে সর্বাগ্রে নিজের ব্যক্তিগত জীবনে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সংসাধন করতে হবে। ভারতবর্ষের দারিদ্রের কথা মনে রেখে তিনি তাঁর প্রয়োজনকে একেবারে ন্যূনতমে পর্যবসিত করবেন। তাঁর উপার্জন অসৎ পন্থার সংশ্রবশূন্য হবে। ফাটকাবাজীর ইচ্ছা বর্জন করতে হবে। তাঁর আচার ব্যবহার হবে নূতন জীবনের অনুসারী। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি সংযমের পরিচয় দেবেন। নিজের জীবনে যে যে পরিবর্তন সাধন করা প্রয়োজন তা সম্পূর্ণ করার পরই তিনি তাঁর বন্ধু বান্ধব ও প্রতিবেশীদের ভিতর এ আদর্শ প্রচারে সক্ষম হবেন।

প্রত্যুত সমবণ্টনের এই নীতির মূলে থাকবে ন্যাসবাদের আদর্শ, অর্থাৎ ধনীরা তাঁদের করায়ত্ত প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদের ন্যাসী। কারণ সমবণ্টনের নীতি অনুযায়ী তাঁরা তাঁদের প্রতিবেশীদের চেয়ে একটি টাকাও বেশী রাখতে পারেন না। কি ভাবে একে বাস্তবে রূপায়িত করা যায়? অহিংস উপায়ে? না, ধনীদের কাছ থেকে তাঁদের প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ কেড়ে নেওয়া হবে? শেষোক্ত পন্থা গ্রহণ করতে হলে আমাদের স্বভাবতই হিংসার শরণ নিতে

হবে।[১] আর এই হিংস কার্যক্রম সমাজের কল্যাণ সাধনে সমর্থ হবে না। সমাজ হবে আরও দীন। কারণ সম্পদ সঞ্চয়কারী একটি ব্যক্তির সেবা থেকে সমাজ বঞ্চিত হবে। সুতরাং অহিংস পদ্ধতি নিঃসন্দেহে শ্রেয়। ধনীর কাছে তার সম্পদ থেকে যাবে এবং তাঁর ব্যক্তিগত প্রয়োজন মেটাবার জন্য যতটুকু প্রয়োজন তিনি কেবল ততটুকুই রাখবেন এবং বাকীটুকু যাতে সমাজের কাজে লাগতে পারে তার জন্য তিনি তার ন্যাসী হিসাবে কাজ করবেন। পূর্বোক্ত কথা বলার সময় ন্যাসীর সততাকে স্বতঃসিদ্ধ বিষয় হিসাবে ধরে নেওয়া হচ্ছে।

যে মুহূর্তে মানুষ নিজেকে সমাজের সেবক হিসাবে জ্ঞান করে, সমাজের জন্য উপার্জন করে ও সমাজ-কল্যাণে ব্যয় করে তৎক্ষণাৎ তার উপার্জনে পবিত্রতার অনুপ্রবেশ ঘটে এবং তাঁর প্রচেষ্টায় অহিংসার প্রভাব পড়ে। তাছাড়া এই রকম জীবনযাত্রার প্রতি মানুষের মন আকৃষ্ট হলে সমাজে এক শান্তিময় বিপ্লব সংসাধিত হয়ে যাবে আর এটা হবে কোন রকম তিক্ততা ছাড়াই।

যদি অবশ্য সর্ববিধ প্রয়াসের পরও ধনীরা সম্যক অর্থে দরিদ্রদের অভিভাবক না হন এবং দরিদ্ররা যদি ক্রমশঃ অধিকাধিক মাত্রায় নিষ্পেষিত হন ও অনশনে প্রাণত্যাগ করতে থাকেন তাহলে কঃ পন্থা? এই সমস্যার সমাধান আবিষ্কারকল্পে আমি অহিংস অসহযোগ ও আইন অমান্যকে ন্যায়সঙ্গত ও অভ্রান্ত কার্যক্রম মনে করি। দরিদ্রদের সহযোগিতা ছাড়া সমাজে ধনিরা সম্পদ সঞ্চয় করতে পারেন না। দরিদ্রের মধ্যে এই জ্ঞানের প্রচার ও প্রসার ঘটলে তাঁরা শক্তিশালী হয়ে উঠবেন এবং অসাম্যের যে পাষাণভার আজ তাঁদের অনশনের দ্বারদেশে টেনে এনেছে তার কবল থেকে অহিংস উপায়ে নিষ্কৃতি পাবার পথ খুঁজে পাবেন।

॥ সতের ॥

ন্যাসবাদ

উত্তরাধিকার সূত্রে অথবা ব্যবসায় দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণ সম্পত্তি যদি আমার কাছে এসে থাকে সঠিক আমাকে তাহলে জানতে হবে যে সে সব সম্পত্তি আসলে আমার নয়। আমি কেবল সম্মানজনকভাবে জীবনযাত্রা চালাতে যেটুকু

সম্পত্তি প্রয়োজন তার অধিকারী, দেশের লক্ষ লক্ষ অন্যান্য অধিবাসী যা পান তার চেয়ে বেশী আমার নয়। আমার সম্পত্তির বাদ বাকী অংশ সমাজের এবং সমাজের হিতার্থে আমাকে তার বিনিয়োগ করতে হবে। জমিদার ও দেশীয় রাজন্যবর্গের সম্পত্তি সম্বন্ধে যখন সমাজবাদী মতবাদ দেশের সামনে উপস্থাপিত করা হয় আমি সেই সময় সম্পত্তি সম্পর্কিত আমার এই বিচারধারা পেশ করেছিলাম। সমাজবাদীরা সুবিধাভোগী শ্রেণীদের একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চান। আমি চাই তাঁরা তাঁদের লোভ ও মালিকানার মনোবৃত্তির উর্ধ্বে উঠুন এবং তাঁদের সম্পত্তি সত্ত্বেও যাঁরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে নিজেদের অন্ন সংস্থান করেন তাঁদের পর্যায়ে নেমে আসুন। শ্রমজীবিদের একথা উপলব্ধি করতে হবে যে তাঁর নিজের সম্পদ অর্থাৎ শ্রমশক্তির উপর শ্রমজীবির যতটা অধিকার আছে ধনীকের সম্পত্তির উপর অধিকার তার চেয়ে কম।

এই সংজ্ঞার্থ অনুযায়ী কয়জন যথার্থ ন্যাসী হতে পারেন, এ প্রশ্ন এখানে অবান্তর। এ মতবাদ যদি সত্য হয় তাহলে অনেকে এতদানুযায়ী চলছেন না মাত্র একজনই চলছেন, সে কথার তাৎপর্য নেই। প্রশ্ন হল বিশ্বাসের। আপনারা যদি অহিংসার নীতিতে বিশ্বাসী হন তাহলে সাফল্য লাভ করুন বা ব্যর্থ হন তদনুযায়ী জীবনযাত্রা পরিচালিত করার জন্য চেষ্টা করতে হবে। কিঞ্চিৎ কঠিন হলেও এ মতবাদে এমন কিছু নেই যা বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়।

আপনারা বলতে পারেন যে ন্যাসবাদ আইনের এক ধাঁধা। কিন্তু জনসাধারণ যদি এ সম্বন্ধে নিয়মিত চিন্তা করেন এবং এতদানুযায়ী আচরণ করার জন্য সচেষ্ট হন তাহলে পৃথিবীর জীবন আজকের তুলনায় অনেক বেশী পরিমাণে ভালবাসা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। নির্ব্যূঢ় ন্যাসবাদ ইউক্লিডের বিন্দুর সংজ্ঞার্থের মতই এক বিমূর্তন এবং সমপরিমাণে অলভ্য। তবে এর জন্য চেষ্টা করলে অপর যে কোন পন্থার তুলনায় অধিকতর মাত্রায় আমরা পৃথিবীতে সাম্যের স্থিতি আনার লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হতে পারব।…আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে রাষ্ট্র যদি হিংসা প্রয়োগে পুঁজিবাদের অবলুপ্তি ঘটায় তাহলে রাষ্ট্র স্বয়ং হিংসার আবর্তে পতিত হবে। কোন সময়েই এ আর অহিংসার বিকাশ সাধনে সক্ষম হবে না।…এইজন্য আমি ন্যাসবাদের আদর্শকে পছন্দ করি। রাষ্ট্রের নীতির সঙ্গে যাঁরা সহমত নন তাঁদের উপর রাষ্ট্র কর্তৃক অত্যধিক হিংসা প্রয়োগের আশঙ্কা সব সময়েই আছে। সংশ্লিষ্ট লোকেরা

যদি যথার্থ ন্যাসীর মত আচরণ করেন তাহলে আমি খুবই আনন্দিত হব। তবে তাঁরা যদি কর্তব্যভ্রষ্ট হন তাহলে আমার মনে হয় যে ন্যূনতম শক্তিপ্রয়োগের দ্বারাই রাষ্ট্রের মারফৎ তাঁদেরকে সম্পত্তিচ্যুত করতে হবে।... (গোলটেবিল বৈঠকে এইজন্য আমি বলেছিলাম যে প্রত্যেকটি কায়েমী স্বার্থ সম্বন্ধে তদন্ত করে দেখতে হবে এবং যেখানে যেখানে প্রয়োজন হবে... ক্ষতিপূরণ দিয়ে অথবা ক্ষেত্র বিশেষে না দিয়েও তা বাজেয়াপ্ত করা হবে।) ব্যক্তিগত ভাবে আমি অবশ্য চাই যে রাষ্ট্রের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীত হবার পরিবর্তে বরং জনসাধারণের মনে ন্যাসবাদের ভাবনা প্রসারলাভ করুক। কারণ আমার মতে ব্যক্তিগত মালিকানার সঙ্গে সম্পর্কিত হিংসা রাষ্ট্রের হিংসার চেয়ে কম ক্ষতিকারক। অবশ্য একান্ত অপরিহার্য হলে আমি ন্যূনতম রাষ্ট্রীয় মালিকানাকে সমর্থন করব।

আমার একথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে সাধারণতঃ ধনী ব্যক্তিরা—কেবল তা-ই বা কেন অধিকাংশ ব্যক্তিরাই—কোন্ উপায়ে অর্থোপার্জন করছেন সে সম্বন্ধে মোটেই চিন্তা করেন না। অহিংস পদ্ধতি প্রয়োগের বেলায় এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে মানুষ যতই কলঙ্কিত হক না কেন মানবীয় এবং দক্ষ চিকিৎসায় তার সংশোধন সম্ভব। মানুষের মধ্যে যে সৎ বৃত্তি রয়েছে তার কাছে আবেদন জানাতে হবে এবং আশা করতে হবে যে সাড়া মিলবে। সমাজের কল্যাণের জন্য এটা কি বাঞ্ছনীয় নয় যে সমাজের প্রত্যেকটি সদস্য ব্যক্তিগত লাভের জন্য নয় সকলের মঙ্গলের জন্য নিজের সমগ্র প্রতিভার বিনিয়োগ করেন? আমরা এমন একটা নিষ্প্রাণ ঐক্য স্থাপনা করতে চাই না যেখানে প্রতিটি লোকের পক্ষে নিজ যোগ্যতাকে সর্বোচ্চ পরিমাণে কাজে লাগান সম্ভবপর নয়। এ জাতীয় সমাজ শেষ অবধি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সুতরাং ধনীরা তাঁদের কোটি কোটি টাকা উপার্জন করুন (অবশ্য কেবল সৎ পন্থায়) তবে উপার্জিত ধন সকলের সেবার জন্য বিনিয়োগ করা হক—আমার এই পরামর্শ সম্পূর্ণভাবেই সঙ্গত। "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ" মন্ত্রটি অসাধারণ জ্ঞানের দ্যোতক। প্রতিবেশীর সুখ সুবিধার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে প্রত্যেকে আজ কেবল নিজ নিজ স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত। এর পরিবর্তে সার্বজনীন কল্যাণমূলক এক নূতন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার অভ্রান্ত পন্থা হল পূর্বোক্ত মন্ত্রটির আদর্শে চলা।

॥ আঠার ॥

সত্যাগ্রহ ও দুরাগ্রহ

আমার দৃঢ় অভিমত এই যে অহিংসা আধারিত আইন অমান্য আন্দোলন বৈধানিক আন্দোলনের শুদ্ধতম রূপ। অবশ্য এর অহিংস চারিত্রধর্ম নিছক একটি ছদ্মাবরণ হলে এ হীন ও জঘন্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

আইন আমান্য আন্দোলনকে অহিংস হতে হলে তা অবশ্যই আন্তরিক শ্রদ্ধাপূর্ণ সংযত অহঙ্কারের সম্বন্ধ বিযুক্ত হবে। এর ভিত্তি হবে কোন সহজবোধ্য নীতির উপর। অহিংস আইন অমান্য আন্দোলনে প্রয়োজনবোধে কর্মসূচির পরিবর্তন করা যাবে এবং সর্বোপরি এতে কারও বিরুদ্ধে বিদ্বেষ বা ঘৃণার ভাব থাকবে না।

একমাত্র তাঁরাই অহিংস আইন অমান্য অন্দোলনে ভাগ নিতে পারেন যাঁরা বিবেক বা ধর্মবিরুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্র কর্তৃক আরোপিত এমন কি বিরক্তিকর আইনসমূহও স্বেচ্ছায় পালন করেন। অহিংস আইন অমান্যকারীকে স্বেচ্ছায় তাঁর কার্যের ফলে প্রাপ্য শাস্তি ভোগ করার জন্যও প্রস্তুত থাকতে হবে। আইন অমান্যকে শিষ্টাচার শাসিত হতে হলে পূর্ণমাত্রায় অহিংস হতে হবে এবং এর অন্তর্নিহিত নীতি হবে কষ্ট স্বীকার অর্থাৎ ভালবাসা দ্বারা বিরোধী পক্ষের হৃদয় জয় করা। অহিংস আইন অমান্য কোন নাগরিকের মৌলিক অধিকার। মানুষ হিসাবে নিজ অস্তিত্ব বিসর্জন না দিয়ে সে এ অধিকার ত্যাগ করতে পারে না। অহিংস আইন অমান্যের পরিণামে কদাচ অরাজকতা আসতে পারে না। হিংসা আশ্রিত আইন অমান্যের ফলে এমন হওয়া সম্ভব। হিংসা আধারিত আইন অমান্যকে প্রতিটি রাষ্ট্র বলপ্রয়োগে দমন করে। নচেৎ রাষ্ট্রের অস্তিত্বই বিলুপ্ত হয়। কিন্তু অহিংস আইন অমান্যকে দমন করার অর্থ বিবেককে কারারুদ্ধ করার প্রচেষ্টার মত।

সত্যাগ্রহ প্রত্যক্ষ সংগ্রামের অন্যতম প্রধান শক্তিশালী পদ্ধতি হওয়ায় আর সব পদ্ধতি ব্যর্থ হবার পরই সত্যাগ্রহী সত্যাগ্রহের শরণ নেবেন। তিনি তাই সর্বদা নিয়মিতভাবে বিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষের কাছে যাবেন, জনমতের কাছে আবেদন করবেন। জনমতকে নিজের বক্তব্যের অনুকূল করার প্রয়াস করবেন। যাঁরা তাঁর কথা শুনতে রাজী তাঁদের কাছে শান্ত ও সংযতভাবে

নিজের বক্তব্য পেশ করবেন এবং এই সব পদ্ধতির শরণ নেবার পরই কেবল তিনি সত্যগ্রহ আরম্ভ করবেন। তবে অন্তরাত্মার অপ্রতিরোধ্য আহ্বান শুনে সত্যাগ্রহ শুরু করার পর আর ফেরার পথ থাকে না।

অনেক সময় সত্যাগ্রহ শব্দটিকে একেবারে হেলায় ফেলায় ব্যবহার করা হয় ও প্রচ্ছন্ন হিংসাকে আড়াল করার জন্য সত্যাগ্রহ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু শব্দটির জনক হিসাবে আমাকে বলতেই হবে যে চিন্তা, বাক্য বা কর্মে সত্যাগ্রহের সঙ্গে প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্ন—কোন রকমের হিংসারই সম্বন্ধ নেই। ক্ষতি করার অভিসন্ধি নিয়ে বিরোধীকে বা তার সম্বন্ধে কোন রূঢ় কথা বলা অথবা তার অকল্যাণ কামনা করা সত্যাগ্রহ নীতির বিরোধী।…সত্যাগ্রহ সৌম্য, এ কখনও আঘাত করে না। সত্যাগ্রহ কদাচ ক্রোধ বা আক্রোশের অভিব্যক্তি হবে না। হুজুগ চালিত হয়ে, অধৈর্য হয়ে অথবা শোরগোল করে কখনও সত্যাগ্রহ করা যায় না। কাউকে জোর করে বাধ্য করার একেবারে পরিপন্থী এ। হিংসার পূর্ণাঙ্গ বিকল্প হিসাবেই এ কল্পনা করা হয়েছিল।

দূরাগ্রহ

আমাকে আটক করে রাখার পর যে উত্তেজনা ও গোলযোগের সৃষ্টি হয় তার কারণ আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি নি। এ সত্যাগ্রহ নয়। দুরাগ্রহের চেয়েও খারাপ এ। সত্যাগ্রহের মিছিল ও প্রদর্শন ইত্যাদিতে যোগদানকারা প্রতিটি ব্যক্তির কর্তব্য হল হিংসার সর্ববিধ ঘটনা থেকে নিবৃত্ত থাকা। তাঁরা ইঁট পাথর ছুঁড়বেন না বা কোন ভাবে কাউকে আঘাত করবেন না। কিন্তু বোম্বাই-এ জনসাধারণ ইঁট পাথর ছুঁড়েছেন। পথের উপর কিছু না কিছু রেখে ট্রাম চলাচলে বাধা সৃষ্টি করেছেন। এর নাম সত্যাগ্রহ নয়। হিংস কার্যকলাপের জন্য যে পঞ্চাশ জনের মত লোক গ্রেপ্তার হয়েছেন, জনসাধারণ তাঁদের মুক্তিদাবী করেছেন। আমাদের কর্তব্য হল প্রধানতঃ নিজেদের গ্রেপ্তার করান। যাঁরা হিংস কার্যকলাপ করেছেন তাঁদের মুক্তি দাবী করা সত্যাগ্রহ-ধর্মের বিরোধী কাজ।

বহুবার আমি একথা বলেছি যে সত্যাগ্রহে হিংসা লুণ্ঠন ও অগ্নি সংযোগ ইত্যাদির কোন স্থান নেই। অথচ সত্যাগ্রহের নামে ঘর বাড়ীতে আগুন দিয়েছি, জোর করে অস্ত্র-শস্ত্র কেড়ে নিয়েছি, ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করেছি, রেল গাড়ী বন্ধ করেছি, টেলিগ্রাফ তার কেটেছি, নিরপরাধ

নরনারীকে হত্যা করেছি এবং দোকান ও গৃহস্থের বাড়ী লুঠ করেছি। এই জাতীয় কাজ যদি আমাকে জেল বা ফাঁসীর হাত থেকে বাঁচাতে পারে তবে তেমন বাঁচা আমার চাই না।

কিছু সংখ্যক ছাত্র "বসা ধরনা" রূপী এক প্রাচীন বর্বরতাকে পুনরুজ্জাবিত করেছেন। এটা অপরের উপর চাপ দেবার এক স্থূল উপায় বলে একে আমি "বর্বরতা" আখ্যা দিয়েছি। এ ভীরুতাব্যঞ্জকও বটে। কারণ এই-ভাবে যিনি ধরনা দেন তিনি জানেন যে তাঁকে পায়ে মাড়িয়ে কেউ যাবে না। এই পদ্ধতিকে অবশ্য হিংসা আখ্যা দেওয়া চলে না, তবে নিঃসন্দেহে হিংসার চেয়েও খারাপ এ। বিরোধীর সঙ্গে মারামারি করলে তাঁর অন্ততঃ ঘুসির বদলে ঘুসি মারার অধিকার থাকে। কিন্তু তিনি যাবেন না জানা সত্ত্বেও তাঁকে যখন আমাদের উপর দিয়ে হেঁটে যেতে বলি তখন তাঁকে অত্যন্ত বিসদৃশ ও অবমাননাকর পরিস্থিতির মধ্যে ফেলা হয়। আমি জানি যে যেসব অতি উৎসাহী ছাত্র ধরনা দেওয়ায় ভাগ নিয়েছিলেন তাঁরা তাঁদের কাজের সঙ্গে বর্বরতার সম্বন্ধের কথা জানতেন না। কিন্তু যাঁকে বিবেকের নির্দেশে চলতে হবে এবং শত বাধা বিপত্তির সম্মুখে একলা দাঁড়ান যাঁর কর্তব্য তাঁর কদাচ বিবেচনাশূন্য হওয়া পোষায় না···সুতরাং অধৈর্যভাব, বর্বরতা, ঔদ্ধত্য ও অন্যায় চাপ ইত্যাদি বর্জন করতে হবে। যথার্থ গণতান্ত্রিক ভাবনার অনুশীলন আমাদের কাম্য হলে আমরা কখনও অসহিষ্ণু হতে পারি না। অসহিষ্ণুতার অর্থ নিজের আদর্শে বিশ্বাসের অভাব।

কোন রকম আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করার প্রাথমিক পূর্বশর্ত হল আন্দোলনে অংশ গ্রহণকারী এবং জনসাধারণ—কোন তরফ থেকেই হিংসার অনুষ্ঠান হবে না, তার নিশ্চয়তা। হিংসা দেখা দিলে এই কৈফিয়ৎ দিলে চলবে না যে সরকার বা আন্দোলনের বিরোধকামীরা এর প্ররোচনা দিয়েছিল। আমাদের স্পষ্ট বোঝা উচিত যে হিংসার পরিবেশে অহিংস প্রতিরোধ মাথা তুলতে পারে না। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে সত্যাগ্রহীর সম্পদ নিঃশেষিত। সে অবস্থায় আইন অমান্য ছাড়া অপর কোন পন্থা আবিষ্কার করতে হবে।

সত্যাগ্রহে অনশনের স্থান

সত্যাগ্রহের শস্ত্রভাণ্ডারে অনশন এক শক্তিশালী অস্ত্র। তবে প্রত্যেকে

এ অস্ত্রের শরণ নিতে পারে না। অনশন করার দৈহিক ক্ষমতাই এ অস্ত্রের সহায়তা দেবার সপক্ষে একমাত্র যুক্তি নয়। ঈশ্বরে জীবন্ত বিশ্বাস না থাকলে এর কোন মূল্য নেই। যান্ত্রিক প্রচেষ্টা বা নিছক অনুকরণ হিসাবে অনশন করলে চলবে না। আত্মার অন্তস্থল থেকে এর ডাক আসবে। সুতরাং অনশনের ঘটনা কদাচিৎ ঘটবে।

শুদ্ধ উপবাসে স্বার্থপরতা, ক্রোধ, অবিশ্বাস অথবা অধৈর্যের কোন স্থান নেই।...অসীম ধৈর্য, দৃঢ় সঙ্কল্প, উদ্দেশ্য সাধনে একাগ্রতা, পূর্ণ প্রশান্তি এবং ক্রোধবিহীনতা এখানে থাকবেই। তবে কোন মানুষের পক্ষে এসব গুণাবলীর বিকাশ একসঙ্গে করা অসম্ভব বলে যিনি অহিংসার বিধান অনুসরণে আত্ম-নিয়োগ করেন নি তিনি এখনও সত্যাগ্রহী অনশনে প্রবৃত্ত হবেন না।

আমি অবশ্য একটি সাধারণ নীতি ব্যক্ত করতে চাই। সত্যাগ্রহী অনশন করবেন শেষ শরণ হিসাবে—প্রতিবিধানের আর সব পন্থা যখন ব্যর্থ হয়েছে। অনশনে অনুকরণের কোন স্থান নেই। এর উপযোগী আত্মবল যাঁর নেই তিনি এর কথা স্বপ্নেও চিন্তা করবেন না, সফল হবার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তো নয়ই।...উপহাসাস্পদ অনশন প্লেগের মত ছড়িয়ে পড়ে এবং এ জাতীয় অনশন ক্ষতিকারকও বটে।

॥ উনিশ ॥

ভূমিকর্ষণকারী

শান্তিপূর্ণ উপায়ে ভারতীয় সমাজের সত্যকার উন্নতি করতে হলে, বিত্তশালী সম্প্রদায়কে নিশ্চিত রূপেই একথা মেনে নিতে হবে যে, রায়তদের হৃদয় তাঁদের নিজেদেরই মত এবং আর্থিক সম্পদে সম্পদশালী হবার কারণ তাঁরা গরীবদের চেয়ে কোনমতেই উচ্চস্তরের নয়। নিজেদের তাঁরা বিবেচনা করবেন জাপানী অভিজাত সম্প্রদায়ের মত, অধীনস্থ নাবালক রায়তদের মঙ্গলের জন্য যাঁরা অছি হয়ে সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। এ অবস্থায় তাঁরা নিজেদের পারিশ্রমিক বাবদ সম্পত্তির একটা ন্যায়সঙ্গত অংশ ছাড়া আর কিছু গ্রহণ করবেন না। বিত্তবানরা রায়তদের ধারে কাছেই বসবাস করেন। অথচ রায়তদের পারিপার্শ্বিকতা নোংরা ও তাদের ভিতর চরম

দারিদ্র্য। সম্পদশালীদের এই অনাবশ্যক আড়ম্বর ও অমিতব্যয়িতা এবং রায়তদের শোচনীয় অবস্থা—এই দুইএর মধ্যে বর্তমানে কোন সামঞ্জস্য নেই। তাই বর্তমানে রায়তদের যে বোঝা বইতে হচ্ছে, একজন আদর্শ জমিদার তার বেশ কিছুটা ভার লাঘব করবেন। তিনি রায়তদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসবেন এবং তাদের অভাবের কথা জেনে, যে হতাশা তাদের জীবনীশক্তিকে ধ্বংস করছে, তার বদলে তাদের ভিতর আশার সঞ্চার করবেন। রায়তরা পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যের বিধিসমূহ জানে না বলে তিনি নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকবেন না। রায়তেরা যাতে জীবনধারণোপযোগী দ্রব্যসামগ্রী পায়, তার জন্য নিজেকে তিনি দারিদ্র্যের চরম সীমায় টেনে নিয়ে যাবেন। রায়তদের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে নিজে তিনি জানবেন এবং বিদ্যালয় স্থাপন করে তিনি একসঙ্গে সেখানে নিজের ও রায়তদের সন্তান-সন্ততির শিক্ষার ব্যবস্থা করবেন। তিনি গ্রামের কূপ এবং পুষ্করিণীর সংস্কারসাধন করবেন। নিজের প্রচেষ্টায় নিজেদের রাস্তা এবং পায়খানা পরিষ্কার করার শিক্ষা তিনি রায়ত-দের দেবেন। নিজের বাগানগুলি তিনি নির্বিচারে রায়তদের ব্যবহার করার জন্য খুলে দেবেন। নিজের আমোদ-প্রমোদের জন্য যে সব অতিরিক্ত ঘর তিনি রাখতেন, সেগুলি তিনি চিকিৎসালয় বা বিদ্যানিকেতন ইত্যাদির জন্য ব্যবহার করবেন। পুঁজিপতিরা যদি কালের নির্দেশ বুঝতে পারেন এবং তাঁদের তথাকথিত ঈশ্বরদত্ত অধিকারবলী সম্বন্ধে যদি তাঁদের মত পরিবর্তন করেন, তবে যে সাতলক্ষ গোময়স্তূপকে 'গ্রাম' নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সেগুলিকে শান্তি, স্বাস্থ্য এবং স্বাচ্ছন্দ্যের আকরে পরিণত করা যেতে পারে। আমাদের দৃঢ় প্রতীতি এই যে, পুঁজিপতিরা জাপানের সামুরাইদের পথ অনুসরণ করলে তাঁদের লোকসান তো কিছুই নেই বরং ষোল আনাই লাভ। পুঁজিপতিদের সামনে দু'টি মাত্র পথ খোলা আছে। একদিকে স্বেচ্ছায় নিজেদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিস ত্যাগ করে সত্যকার সুখের আস্বাদন পাওয়া ও অন্যদিকে আসন্ন বিশৃঙ্খলতা। পুঁজিপতিরা সময়মত না জাগার জন্য জাগ্রত অথচ অজ্ঞ ও বুভুক্ষু জনসাধারণ দেশকে এ পথে টেনে নিয়ে যাবে এবং প্রভূতশক্তিশালী যে-কোন শাসনব্যবস্থা তার সমগ্র সৈন্যবাহিনীকে নিয়োগ করেও একে ঠেকাতে পারবে না। আমি আশা করি যে, ভারত যেন এ সঙ্কট এড়াতে পারে।

ভূমিহীন হন অথবা সামান্য জমির মালিক—কৃষাণ ও চাষীদের কথা

সর্বাগ্রে বিবেচনা করতে হবে। এঁরা হচ্ছেন জমির সার স্বরূপ এবং এই জমির মালিকানা এঁদেরই বা এঁদের হওয়া উচিত। জমি থেকে দূরে বসবাসকারী এবং জমির উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল নন, এমন মালিক বা জমিদারদের হাতে জমি থাকা উচিত নয়। তবে অহিংস নীতি অনুযায়ী কৃষি-শ্রমিকেরা জোর করে দূরের বাসিন্দা মালিকদের সত্ত্ব কেড়ে নেবেন না। তাঁরা এমনভাবে চলবেন যাতে জমির মালিকের পক্ষে তাঁদের শোষণ করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। কৃষকদের পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা তাই খুবই প্রয়োজন। এর জন্য যেখানে নেই সেখানে বিশেষ ধরনের সংগঠন বা কমিটি গড়তে হবে এবং যেখানে আছে প্রয়োজন বোধে তার সংস্কার সাধন করতে হবে।

এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই যে, আমাদের দেশে যদি গণতান্ত্রিক স্বরাজ স্থাপিত হয় (অহিংস উপায়ে স্বাধীনতা অর্জিত হলে এরকম হওয়া খুব স্বাভাবিক) রাজনৈতিক ক্ষমতাসহ সমস্ত ক্ষেত্রেই কৃষাণের অধিকার থাকবে।

সমগ্র জনসাধারণের প্রচেষ্টায় যদি স্বরাজ অর্জিত হয়, (অহিংসার আওতায় যা অবশ্যম্ভাবী) কৃষাণরা তাদের স্বকীয় মর্যাদা পাবে এবং সব বিষয়ে তাদের অভিমতই হবে চূড়ান্ত। এ যদি না হয়, আর নির্বাচনে সীমাবদ্ধ মতদাতার ভিত্তিতে যদি সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে কোন কাজ চালাবার মত আপোষ হয়, তবে ভূমিকর্ষণকারীর স্বার্থের প্রতি অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য রাখতে হবে। ব্যবস্থা-পরিষদ যদি কৃষাণদের স্বার্থরক্ষার পক্ষে অনুপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়, তবে চূড়ান্ত প্রতিকারের জন্য অবশ্যই তাদের সামনে আইন অমান্য এবং অসহযোগের পথ খোলা থাকবে। তবে···কাগজে লিখিত বিধানসমূহ, ওজস্বিনী ভাষা বা গরম গরম বক্তৃতা ইত্যাদি শেষ পর্যন্ত বিশেষ কিছু কাজের হবে না। অহিংস সংগঠনের শক্তি, নিয়মানুবর্তিতা এবং ত্যাগই হচ্ছে অন্যায় বা অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনগণের আত্মরক্ষার উপায়-স্বরূপ।
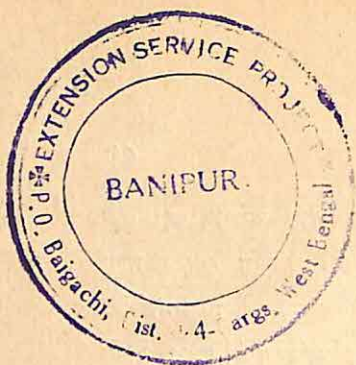
॥ কুড়ি ॥

গ্রামে ফিরে যাও

আমার বিশ্বাস, ভারতকে খুঁজে পাওয়া যাবে তার সাত লক্ষ গ্রামে, মুষ্টিমেয় কয়েকটি শহরে নয়! অসংখ্যবার আমি একথার পুনরাবৃত্তি করেছি। কিন্তু আমরা শহরবাসীরা বিশ্বাস করি যে, ভারতের সত্তা আছে তার শহরগুলিতে এবং গ্রামগুলির সৃষ্টি হয়েছে আমাদের প্রয়োজন মেটাবার জন্য। ঐ হতভাগ্যের দল যথেষ্ট খাদ্য এবং পরিধেয় পায় কিনা এবং রৌদ্রাতপ বা বৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষা করার উপযুক্ত বাসগৃহ তাদের আছে কিনা, একথা ভুলেও আমরা কখনও জিজ্ঞাসা করি না।

আমি দেখেছি, শহরবাসীরা সাধারণত গ্রামবাসীদের শোষণ করে এবং কার্যত হতভাগ্য গ্রামবাসীদের জীবিকার উপর তারা নির্ভর করে। ভারতবর্ষের জনসাধারণের অবস্থা সম্বন্ধে বহু ইংরেজ রাজকর্মচারী বহু কিছু লিখেছেন। আমার জ্ঞানত কেউ একথা বলেন নি যে, কায়ক্লেশে জীবন ধারণোপযোগী সংস্থান তাদের আছে, বরং তাঁরা একথা স্বীকার করেছেন যে, জনসাধারণের এক বিরাট অংশ প্রায় অনশনেই কালাতিপাত করে, শতকরা দশজন অর্ধাহারী এবং বহু লক্ষ লোককে সামান্য একটু লবণ এবং লঙ্কা সহযোগে কিছু ভাত বা অপর কোন শুষ্ক বা দগ্ধ খাদ্যতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। ঐ খাদ্যের উপর নির্ভর করে যদি আমাদের কাউকে থাকতে হয়, তবে আপনারা নিশ্চিন্ত হতে পারবেন যে, হয় এক মাসের বেশী কেউ টিকতে পারব না, আর নয় মানসিক ধীশক্তি হারাবার ভয়ে আমরা শীঘ্রই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে উঠব। এ সত্ত্বেও আমাদের গ্রামবাসীরা এই অবস্থায় দিনের পর দিন অতিবাহিত করে।

দেশবাসীর শতকরা পঁচাত্তর ভাগেরও উপর কৃষিজীবী। তাদের শ্রমের প্রায় যাবতীয় ফল যদি আমরা তাদের কাছ থেকে নিয়ে নিই বা অপরকে নিতে দিই, তবে আমাদের স্বায়ত্তশাসনের কোনই অর্থ হয় না।

শহরগুলি নিজেরাই নিজেদের দেখাশোনা করতে পারে। গ্রামের প্রতিই আমাদের নজর দিতে হবে। কুসংস্কার, গোঁড়ামি, সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তাদের উদ্ধার করতে হবে। তাদের সঙ্গে বাস করে, তাদের সুখদুঃখের

ভাগ নিয়ে, তাদের মধ্যে শিক্ষার প্রচার করে ও জ্ঞানের প্রসার ঘটিয়ে এ সব আমরা করতে সমর্থ হব।

স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে সমস্ত গ্রামবাসীর ধারণা অদ্ভুত রকমের, বা কোন্ খাদ্য কখন কিভাবে খেতে হয়, সে সম্বন্ধে যারা আদৌ চিন্তা করে না, আমরা তাদের মত হব না। আমাদের হতে হবে আদর্শ গ্রামবাসী। তাদের বেশীর ভাগই যেমন যে-কোন রকমে রাঁধে, খায় বা থাকে, আমাদের তেমন হলে চলবে না। আদর্শ খাদ্য কি তাদের দেখাব। শুধু পছন্দ-অপছন্দের কথা বললে আমাদের চলবে না। ঐ সব পছন্দের মূল অনুসন্ধান করে দেখাতে হবে।

তারা যে ডোবায় স্নান করে, কাপড় কাচে, বাসন মাজে এবং যেখানে তাদের গৃহপালিত পশুগুলি স্নান করে আর জল খায় সেই ডোবার জল আমরা কেমন ভাবে পান করব, এ তারা দেখতে চায়, এবং আনত পৃষ্ঠে খর রৌদ্রের মধ্যে যারা খেটে চলে, সেই সব গ্রামবাসীদের সঙ্গে আমাদের একাত্ম হতে হবে। তখন আমরা সত্য সত্যই জনগণের প্রতিনিধিত্ব করব, তার আগে নয়। আর, আমার এই লেখাটা যেমন সত্য, তারাও যে আমাদের সমস্ত ডাকে সাড়া দেবে একথাও তেমনি সত্য।

তাদের দেখাতে হবে যে, সামান্য খরচে তারা তাদের শাকসব্জী-উৎপন্ন করতে পারে এবং এই ভাবে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারে। এও আমাদের দেখাতে হবে যে, কাঁচা শাক-শব্জী রাঁধলে তার খাদ্যপ্রাণের অধিকাংশই নষ্ট হয়ে যায়।

কেমন করে সময় স্বাস্থ্য এবং অর্থ বাঁচাতে হয়, এ তাদের শেখাতে হবে। লিওনেল কার্টিস আমাদের গ্রামগুলিকে গোময়স্তূপ বলে বর্ণনা করেছেন। এগুলিকে আদর্শ গ্রামে পরিণত করতে হবে। মুক্ত বায়ুর মধ্যে বসবাস করা সত্ত্বেও আমাদের গ্রামবাসীরা বিশুদ্ধ বায়ু পায় না। সবচেয়ে টাটকা খাদ্যের মধ্যে থেকেও তারা নিজেরা টাটকা খাবার পায় না। খাদ্যের বিষয়ে আমি বিশেষ জোর দিচ্ছি, কারণ গ্রামকে সৌন্দর্যের আকরে রূপান্তরিত করা আমার লক্ষ্য।

গ্রামে ফেরার আন্দোলনে গ্রামবাসী এবং নগরবাসী এই দুই-এরই সমান শিক্ষণীয় বিষয় আছে। শহর থেকে যে সব কর্মী আসবেন, তাঁদের গ্রামীণ মনোবৃত্তি গড়ে তুলতে হবে; এবং গ্রামবাসীর মত জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে হবে। এর অর্থ এ নয় যে, গ্রামবাসীর মত অনশনে কালাতিপাত

করতে হবে। তবে পুরাতন জীবনযাত্রাপ্রণালীর যে আমূল পরিবর্তন করতে হবে তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

বর্তমান অবস্থার উন্নতি সাধনের একমাত্র পথ হল গ্রামবাসীদের মধ্যে গিয়ে বাস করা এবং অবিচল বিশ্বাস সহকারে তাদের ঝাড়ুদার, শুশ্রূষাকারী ও তাদের সেবক হিসাবে কাজ করা। তাদের উপর মুরুব্বীয়ানা করলে চলবে না এবং সব রকমের পূর্বধারণা ও ভ্রান্ত সংস্কার ভুলে যেতে হবে।

গ্রাম্য সমাজের পুনরুদ্ধার করতে হবে। ভারতের নগরসমূহের প্রয়োজনীয় বস্তুসামগ্রী গ্রামে উৎপন্ন হয়ে শহরে চালান আসত। শহরগুলি বিদেশী মালের বাজারে পরিণত হওয়ায় এবং সস্তা ও খেলো বিদেশী মাল বাজারে স্তূপীকৃত করে গ্রামগুলিতে অর্থাগমের রাস্তা বন্ধ করায় ভারত দারিদ্র্যদশায় পতিত হল।

স্বার্থপরের মত গ্রামগুলিকে শোষণ না করে, গ্রাম থেকে যে শক্তি এবং উপজীবিকা তারা পায়, তার বিনিময়ে উপযুক্ত প্রতিদান দেওয়া তাদের কর্তব্য বলে যখন শহরগুলি বুঝতে পারবে, তখনই এই দুই-এর মধ্যে এক স্বাস্থ্যকর নৈতিক সম্পর্ক গড়ে উঠবে। এই বিরাট এবং মহৎ সমাজসংস্কারের কাজে শহরের ছেলেরা যদি যথোপযুক্ত অংশ গ্রহণ করতে চায় তবে তাদের শিক্ষা-পদ্ধতির সঙ্গে গ্রামের প্রয়োজনীয়তার প্রত্যক্ষ সংস্রব থাকা দরকার।

গ্রাম আজ নিম্নোক্ত বিবিধ ব্যাধির কবলে রয়েছে ঃ (ক) সামূহিক সাফাই-এর ব্যবস্থার অভাব, (খ) অপুষ্টিকর খাদ্য এবং (গ) জড়তা। এর চিকিৎসার ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে।······গ্রামবাসীরা নিজেদের শুভাশুভের ব্যাপারেও আগ্রহশীল নয়। তারা আধুনিক সাফাই-পদ্ধতির গুণগ্রাহী নয়। কোন মতে ক্ষেতটুকু চাষ করা বা সনাতন কাল থেকে যা করে আসছে তার অতিরিক্ত কোন কিছু করার আগ্রহ তাদের নেই। এসব অসুবিধা বাস্তব ও গুরুতর। তবে এ সব আমাদের মনে যেন হতাশা সৃষ্টি না করে। আমাদের লক্ষ্যের উপর যেন আমাদের অনির্বাণ বিশ্বাস থাকে। আর যেন থাকে ধৈর্য। গ্রামের কাজ সম্বন্ধে আমরা স্বয়ং শিক্ষানবীশ। আর আমাদের যুদ্ধ করতে হবে এক পুরাতন ব্যাধির সঙ্গে। আমাদের যদি ধৈর্য ও স্থৈর্য থাকে তাহলেই কেবল পর্বতপ্রমাণ অসুবিধা অতিক্রম করতে সমর্থ হব। শুশ্রূষাকারীরা যেমন রোগীর দুরারোগ্য ব্যাধি হয়েছে জেনেও তাকে ছেড়ে যায় না, আমাদেরও তেমন হতে হবে।

তাদের (ভারতীয় কৃষককুলের) সঙ্গে আপনি যখন আলাপ করবেন এবং তারা যেই কথা বলা শুরু করবে, আপনি দেখবেন যে, তারাও কেমন জ্ঞানের পরিচয় দেয়। বাইরের রূঢ় আবরণের পিছনে আপনি এক গভীর আধ্যাত্মিকতার খনির সন্ধান পাবেন। একে আমি সংস্কৃতি আখ্যা দিই—পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহে আপনি এমনটি কখনও পাবেন না। কোন ইউরোপীয় কৃষকের সঙ্গে কথাবার্তা বলে দেখুন, আধ্যাত্মিক বিষয়ের প্রতি তার আকর্ষণ নেই।

ভারতীয় কৃষকদের রূঢ়তার আবরণের মধ্যে এক যুগ-যুগান্তরের পুরানো সংস্কৃতি লুকিয়ে আছে। তার সে আবরণ সরিয়ে নিন, দূর করুন তার বহু দিনের সঞ্চিত দারিদ্র্য ও অশিক্ষা, তা হলেই আপনি সংস্কৃতিসম্পন্ন, সুসভ্য, স্বাধীন নাগরিকের সুন্দরতম নমুনা দেখতে পাবেন।

॥ একুশ ॥

প্রতিটি গ্রামে একটি সাধারণতন্ত্র

অত্যাবশ্যক প্রয়োজনসমূহ মেটানোর জন্য প্রতিবেশীর উপর নির্ভরশীল না হয়েও আবার দরকারী বহুবিষয়ে পরস্পর নির্ভরশীল স্বাধীন গ্রাম্য সাধারণতন্ত্রই হচ্ছে গ্রাম স্বরাজের অর্থ। সুতরাং প্রত্যেক গ্রামের প্রাথমিক কর্তব্য হবে নিজেদের প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য এবং বস্ত্রের জন্য প্রয়োজনীয় তুলার উৎপাদন করা। গোচারণভূমি এবং শিশু ও যুবকদের জন্য খেলার মাঠ ইত্যাদি এখানে থাকবে। এর অতিরিক্ত জমি থাকলে গাঁজা, তামাক, আফিং ইত্যাদির চাষ না করে কোন প্রয়োজনীয় অর্থকরী ফসল উৎপন্ন করতে হবে।

গ্রামের নিজস্ব নাট্যশালা, বিদ্যালয় এবং সাধারণ সভাগৃহ থাকবে। বিশুদ্ধ জলের জন্য গ্রামের স্বকীয় জলসরবরাহ ব্যবস্থা থাকবে। নিয়ন্ত্রিত কূপ বা পুষ্করিণী দ্বারা এ করা সম্ভব। বনিয়াদী শিক্ষার সর্বোচ্চ মান পর্যন্ত শিক্ষা হবে বাধ্যতামূলক। যতদূর সম্ভব যাবতীয় কার্যকলাপ সমবায়ের ভিত্তিতে পরিচালিত করতে হবে। অস্পৃশ্যতামণ্ডিত বর্তমান জাতিভেদ প্রথা তখন থাকবে না।

সত্যাগ্রহ এবং অসহযোগের নীতি সমন্বিত অহিংসা গ্রাম্য-সমাজের অনুমোদন লাভ করবে। প্রত্যেককে বাধ্যতামূলকভাবে গ্রামরক্ষী দলে কাজ

করতে হবে। গ্রামবাসীদের দ্বারা রচিত একটি তালিকা থেকে পর্যায়ক্রমে এদের বেছে নেওয়া হবে। নরনারী নির্বিশেষে ন্যূনতম যোগ্যতা বিশিষ্ট যাবতীয় সাবালকের মতামত দ্বারা বৎসরান্তে নির্বাচিত পাঁচজনের একটি পঞ্চায়েত গ্রামের শাসনকার্য চালাবে। এই সমস্ত পঞ্চায়েতের যাবতীয় ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব থাকবে। পরিকল্পিত এই ব্যবস্থায় শাস্তিদান প্রথা না থাকায়, নিজেদের কার্যকালের এক বৎসর, এই পঞ্চায়েতগুলি একাধারে ব্যবস্থাপরিষদ বিচারালয় এবং শাসনব্যবস্থার কেন্দ্র হিসাবে কাজ করবে।

বর্তমান অবস্থাতেও যে কোন গ্রাম এই রকম সাধারণতন্ত্রে পরিণত হতে পারে ; এবং কর আদায় করা ছাড়া বর্তমানে গ্রামের সঙ্গে সরকারের আর বিশেষ কিছুই সম্বন্ধ না থাকায়, তারাও এতে বিশেষ কিছু হস্তক্ষেপ করতে সমর্থ হবে না। পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহ বা তাদের যদি কোন কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান থাকে, তার সঙ্গে এর সম্পর্কের বিষয় আমি অবশ্য আলোচনা করিনি, গ্রাম্য-শাসনব্যবস্থার একটি মোটামুটি ধারণা দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য। ব্যক্তি-স্বাধীনতার ভিত্তিতে রচিত আসল গণতন্ত্র এখানে দৃষ্টিগোচর হবে। প্রতিটি ব্যক্তিই হচ্ছে নিজ শাসনব্যবস্থার স্রষ্টা। অহিংসনীতি তাকে এবং তার শাসনব্যবস্থাকে পরিচালিত করে। সে এবং তার গ্রাম জগতের সমস্ত শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে। প্রত্যেক গ্রামবাসী যেন এই আদর্শে পরিচালিত হয় যে নিজের এবং গ্রামের সম্মান রক্ষার্থে সে প্রয়োজন হলে মৃত্যুবরণ করবে।

এ রকম গ্রাম সৃষ্টি করতে হয়ত জীবনব্যাপী প্রচেষ্টার দরকার। গণতন্ত্র এবং গ্রামীণ জীবনে অনুরাগী যে কেউ একটি গ্রাম নিয়ে, সে-টিকেই তাঁর জগৎ এবং একমাত্র কাজ বিবেচনা করে চেষ্টা করে দেখলে সুফল পাবেন। একাধারে তিনি গ্রাম্য ঝাড়ুদার, কাটুনী, চৌকিদার, চিকিৎসক ও শিক্ষকের কাজ করবেন। তাঁর কাছে কেউ যদি না আসে তবে আবর্জনা পরিষ্কার করে এবং সুতা কেটে তিনি সন্তুষ্ট থাকবেন।

গ্রামবাসীরা এতখানি হস্তকুশলতা অর্জন করবে যে তাদের তৈরী পণ্য অনায়াসে বাইরে বিক্রি হতে পারে। আমাদের গ্রামগুলি পূর্ণমাত্রায় বিকাশ লাভ করলে সেখানে উচ্চ শ্রেণীর কারিগরী কুশলতা এবং শিল্প-প্রতিভাসম্পন্ন মানুষের অভাব হবে না। তখন গ্রামের নিজস্ব কবি, চিত্রশিল্পী, ভাস্কর, ভাষা বিশেষজ্ঞ ও গবেষক থাকবে। সংক্ষেপে জীবনের এমন কোন কাম্য বস্তু

বা বিষয় থাকবে না, যার অস্তিত্ব গ্রামে নেই। আজকে গ্রামগুলি গোময়-স্তূপ। কালকে এগুলি হবে নন্দন-কাননের মত যেখানে এমন উচ্চ বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন মানুষের বসবাস হবে যাঁদের কেউ প্রতারিত অথবা শোষণ করতে পারবে না।

সৎ পরিকল্পিত গ্রাম একক্ সর্বাপেক্ষা শক্তিশালীর চেয়েও বলসম্পন্ন। আমার কল্পনার এই গ্রামে একহাজার লোকের বাস। স্বাবলম্বনের ভিত্তিতে ঠিকমত সংগঠিত করতে পারলে এরকম একটি একক্ ভাল কাজ করতে পারে।

আদর্শ ভারতীয় গ্রাম এমনভাবে গড়ে উঠবে যেখানে সাফাই-এর সুচারু ব্যবস্থা করা সম্ভব। এর কুটীরগুলিতে প্রচুর আলো বাতাস খেলবে এবং এগুলি তৈরী হবে এমন সব মাল মশলা দ্বারা যা পাঁচ মাইল এলাকার মধ্যে পাওয়া যায়। প্রত্যেকটি কুটীর সংলগ্ন এক একটি অঙ্গন থাকবে যেখানে গৃহস্থ নিজের প্রয়োজনীয় শাকসব্জী উৎপাদন করবে ও গৃহপালিত পশুদের রাখবে। গ্রামের পথঘাট ধূলা ও আবর্জনামুক্ত হবে। প্রয়োজন মত গ্রামে কুঁয়ো থাকবে এবং সে কুঁয়ার জল নেবার অধিকার থাকবে সবার। সকলের জন্য উপাসনা স্থল, সর্বসাধারণের সভার জায়গা, গোচারণ ভূমি, সমবায় দুগ্ধশালা এবং শিল্পভিত্তিক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় গ্রামে থাকবে। গ্রামের বিবাদ আদি নিষ্পত্তির জন্য গ্রাম্য পঞ্চায়েত থাকবে। গ্রাম নিজের প্রয়োজনীয় শস্য শাকসব্জী ফল ও খদ্দর উৎপাদন করবে।

॥ বাইশ ॥

পঞ্চায়েত রাজ

একেবারে মূল থেকে স্বাধীনতা আরম্ভ করতে হবে। এইজন্য প্রত্যেক গ্রামকে হয় একটি সাধারণতন্ত্রে পরিণত করতে হবে, আর নয় পূর্ণ ক্ষমতাসম্পন্ন এক একটি পঞ্চায়েত সেখানে স্থাপনা করতে হবে। সুতরাং স্বভাবতই প্রত্যেক গ্রাম আত্ম-নির্ভরশীল হবে এবং এমন কি সমস্ত দুনিয়ার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করার উপযুক্ত শক্তির সঞ্চয় করবে। কোন বহিঃশক্তির আক্রমণের সামনে আত্মরক্ষা করতে এবং প্রয়োজন হলে সেই প্রচেষ্টায় আত্মত্যাগ করতে তাকে

শিখতে হবে। এইভাবে শেষ পর্যন্ত এককভাবে প্রতিটি ব্যক্তিই হচ্ছে এর অন্তিম লক্ষ্য। এতে অবশ্য প্রতিবেশী বা সমগ্র জগতের উপর নির্ভরশীল হতে বা তাদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সাহায্য নিতে কোন মানা নেই। পারস্পরিক শক্তির এ হবে স্বাধীন এবং স্বেচ্ছাপ্রণোদিত আদান-প্রদান। স্বভাবতই ঐ রকম সমাজ হবে যথেষ্ট সংস্কৃতিসম্পন্ন এবং এই সমাজের প্রত্যেক নরনারী শুধু তাদের প্রয়োজনের কথাই জানবে না, সমপরিমাণ শ্রম দ্বারা অপরে যা পায় না, তা কারও পাওয়া উচিত নয় একথাও তাদের জানা থাকবে।

স্বভাবত এই সমাজ সত্য এবং অহিংসার ভিত্তিতে রচিত হবে। ঈশ্বরে স্থির বিশ্বাস না থাকলে এ আবার সম্ভব নয়। ঈশ্বরের অর্থ হচ্ছে আবহমানকাল বিরাজিত, সর্বজ্ঞ, জীবন্ত এক শক্তি। এর সঙ্গে দুনিয়ার অন্যান্য যাবতীয় শক্তি দৃঢ়সংলগ্ন হওয়া সত্ত্বেও কারও উপর এ নির্ভরশীল নয়, এবং অন্যান্য যাবতীয় শক্তি যখন ধ্বংসপ্রাপ্ত বা অকার্যকারী হয়ে যাবে তখনও এর অস্তিত্ব থাকবে। ঐ জীবন্ত আলোকরশ্মিতে বিশ্বাস ছাড়া আমার কার্যকলাপের কোন সদুত্তর দিতে আমি অপারগ।

অসংখ্য গ্রাম দ্বারা নির্মিত এই কাঠামো, নিয়ত পরিবর্ধনশীল গ্রাম-গোষ্ঠী নিয়ে রচিত হবে। জীবন এখানে পিরামিডের মত হবে না, যার চূড়া দাঁড়িয়ে থাকে তলদেশের শক্তিতে। এ হবে এক সামুদ্রিক বেষ্টনীর মত, যার কেন্দ্র হবে প্রত্যেকটি ব্যক্তি। এই সব ব্যক্তি গ্রামের জন্য এবং এই গ্রামগুলি গ্রাম-গোষ্ঠীর জন্য আত্মত্যাগে সদাই প্রস্তুত থাকবে। ব্যক্তিসমষ্টি দ্বারা গঠিত এই কাঠামো এইভাবে শেষে একটিমাত্র সত্তায় পরিণত হবে। উদ্ধত হয়ে এরা কখনও অপরের উপর চড়াও হবে না বরং মহাসাগররূপ গ্রাম-গোষ্ঠীর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হওয়ায় সদাই তারা হবে বিনয়ী।

সুতরাং সর্ববহিঃস্থ বেষ্টনীরেখা, অভ্যন্তরীণ বেষ্টনীকে চূর্ণ করার জন্য তার শক্তি প্রয়োগ করবে না, বরং ভিতরের মণ্ডলীগুলিতে শক্তি সঞ্চার করবে এবং নিজে কেন্দ্র থেকে শক্তি পাবে। এ সব আকাশকুসুম এবং চিন্তার অযোগ্য বিষয় বলে আমাকে হয়ত বিদ্রূপ করা যেতে পারে। মনুষ্যকর্তৃক অঙ্কিত হওয়া সম্ভব না হলেও ইউক্লিড-বর্ণিত বিন্দুর যেমন চিরস্থায়ী মূল্য আছে, তেমনি মনুষ্যজাতির অস্তিত্বের জন্যই মৎকর্তৃক বর্ণিত চিত্রেরও স্বকীয় মূল্য বর্তমান। পরিপূর্ণরূপে অনুসরণে সমর্থ না হলেও ভারত যেন এই বাস্তব চিত্রানুযায়ী নিজ জীবন পরিচালিত করে। আদর্শের কাছে পৌঁছানোর জন্য

প্রযত্ন করার আগে আদর্শ সম্বন্ধে আমাদের সম্যক্ ধারণা থাকা প্রয়োজন। ভারতের গ্রামসমূহে কোনদিন যদি এক একটি সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে আমার আলেখ্যকেই আমি যথার্থ বলে দাবী করব ; কারণ আমার পরিকল্পিত সর্বশেষেরটি হবে সর্বপ্রথমের সমান, অর্থাৎ এক কথায় এতে বড় ছোটর বাছ-বিচার থাকবে না।

এই আলেখ্যে প্রত্যেক ধর্মেরই সমান এবং যথাযোগ্য স্থান আছে। আমরা সবাই হচ্ছি এক বিশাল মহীরুহের পত্রগুচ্ছ, যার শিকড় চলে গেছে ভূমির বহু নিম্নে এবং এর কাণ্ডকে এখন আর নাড়া দিয়ে শিকড় থেকে বিচ্যুত করা যায় না। প্রবল বাত্যাও এখন আর একে নড়াতে পারে না।

যে যন্ত্রের দ্বারা মানুষের শ্রমশক্তি বেকার হয় এবং মুষ্টিমেয় জনকয়েকের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়, তার স্থান এখানে নেই। সংস্কৃতিসম্পন্ন মানব-জীবনে শ্রমের মর্যাদা অতুলনীয়। যে সব যন্ত্র প্রত্যেকের সহায়তা করে, তার যথাযোগ্য স্থান আছে। তবে একথা স্বীকার করতে আমি বাধ্য যে যন্ত্রের ভবিষ্যৎ কি হতে পারে, সে সম্বন্ধে আমি চিন্তা করি নি। সিঙ্গারের সেলাই-কল সম্বন্ধে আমি চিন্তা করেছি। তবে তাও বিশেষ মনোযোগ সহকারে নয়। আমার চিত্র সম্পূর্ণ করতে এরও প্রয়োজনীয়তা নেই।

পঞ্চায়েত রাজ প্রতিষ্ঠিত হলে জনমত এমন সব কার্য সাধন করবে যা হিংসার পক্ষে কদাচ করা সম্ভব নয়। সাধারণ মানুষ যতদিন পর্যন্ত না নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হচ্ছে কেবল ততদিন পর্যন্তই জমিদার পুঁজিপতি ও রাজাদের বর্তমান প্রতিপত্তি থাকবে। জনসাধারণ জমিদারী ও পুঁজিবাদের পরিণামের সঙ্গে অসহযোগ করলে এসব প্রথা অবশ্যই অপুষ্টির জন্য মৃত্যুমুখে পতিত হবে। পঞ্চায়েত রাজে একমাত্র পঞ্চায়েতের কথাই মানা হবে এবং পঞ্চায়েত চলতে পারে কেবল জনসাধারণের দ্বারা নির্মিত আইনের দ্বারা।

॥ তেইশ ॥

চরখার গান

চরখায় যখনই আমি সুতা কাটি, ভারতের দরিদ্রদের কথা আমার মনে পড়ে যায়। ধনিক বা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের চেয়েও বেশী মাত্রায় আজ

ভারতের দরিদ্র জনসাধারণ ঈশ্বরের উপর আস্থা হারিয়েছে। ক্ষুধার তাড়নায় যে উৎপীড়িত, এবং শুধু পেটভরা ছাড়া আর কিছু যার কাম্য নেই, তার কাছে পেটই ভগবান। তার অন্নের সংস্থান যে করে দেয় সে-ই তার কাছে ঈশ্বর। তার মধ্য দিয়েই হয়তো সে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করতে পারে। শরীরে যাদের সামর্থ্য আছে তাদের ভিক্ষা দেওয়ার অর্থ হচ্ছে, নিজেকে এবং তাদের হীন প্রতিপন্ন করা। তারা চায় কোন ধরনের পেশা, আর যে পেশা লক্ষ লক্ষ জনসাধারণকে কাজ দিতে পারবে সে হচ্ছে সুতা কাটা।······সুতা কাটাকে আমি কৃচ্ছ্রসাধন বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান বলে অভিহিত করেছি। আর যেহেতু আমি বিশ্বাস করি যে, যেখানে দরিদ্রের প্রতি খাঁটি এবং কার্যকরা প্রেম, সেখানেই ঈশ্বর। সেইজন্য চরখায় যতটুকু আমি সুতা কাটি তার সবটুকুর মধ্যেই আমি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করি।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, ভারতের আর্থিক এবং নৈতিক অভ্যুত্থানের পথে চরখা এবং হস্তচালিত তাঁতের পুনরুদ্ধারই হবে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান পাথেয়। কৃষি-কার্যের পরিপূরক হিসাবে লক্ষ লক্ষ জনসাধারণের জন্য কোন সহজ শ্রমশিল্পের প্রয়োজন। পূর্বে সুতা কাটা ছিল সেই কুটীরশিল্প, আর লক্ষ লক্ষ জনসাধারণকে বুভুক্ষার হাত থেকে বাঁচাতে হলে তাদের গৃহে আবার সুতা কাটা প্রচলন করতে হবে এবং প্রত্যেক গ্রাম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করবে তার তন্তুবায়দের।

অতি স্বাভাবিক এবং সরল উপায়ে, নিতান্ত কম খরচে ও ব্যবসায়ী-সুলভ দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা আর্থিক অনটন রূপ সমস্যার সমাধানের গৌরবের অধিকারী বলে চরখার তরফ থেকে···আমি দাবী জানাই। চরখা তাই অপ্রয়োজনীয় নয়···প্রত্যেক গৃহস্থের এ এক অত্যাবশ্যক এবং অপরিহার্য সামগ্রী। এ হচ্ছে জাতীয় সমৃদ্ধি অর্থাৎ মুক্তির নিদর্শন। বাণিজ্যিক সংগ্রামের নিদর্শন এ নয়, এ হচ্ছে বাণিজ্যিক শান্তির প্রতীক বিশ্বের কোন জাতির প্রতিই এ বিদ্বেষ পোষণ করে না, সবার কাছেই এ শুভেচ্ছা এবং স্বাবলম্বনের বাণী পৌঁছে দেয়। জগতের শান্তিভঙ্গকারী বা দুনিয়ার যাবতীয় সম্পদ শোষণকারী কোন নৌবাহিনীর সহায়তার প্রয়োজন এর নেই। আজ যেমন সকলে নিজের খাদ্যদ্রব্য স্বগৃহে প্রস্তুত করে নেয় তেমনি এর জন্য লক্ষ লক্ষ জনসাধারণকে ধর্মীয় সঙ্কল্পে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেদের প্রয়োজনীয় সুতা নিজ গৃহে কেটে নিতে হবে। আমার বহু ভুলভ্রান্তির জন্য ভাবীকাল হয়তো

আমার প্রতি দোষারোপ করবে, তবে চরখার পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনা দেবার জন্যে যে তাঁরা আমায় প্রশংসা করবে এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। এর জন্য আমার সব কিছু আমি পণ করেছি। কারণ চরখার চাকার প্রতিটি আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এর থেকে বেরিয়ে আসে শান্তি, শুভেচ্ছা এবং প্রেম। এই সবের অভাবের ফলে ভারত পরাধীন হয়ে পড়ায় এর স্বেচ্ছাপ্রণোদিত পুনরুদ্ধারের ফলেই আসবে ভারতের স্বাধীনতা।

চরখার তরফে বক্তব্য হচ্ছে ঃ

১। যাঁদের অবসর আছে ও যাঁরা কাজ করে কয়েকটি পয়সা উপার্জন করতে ইচ্ছুক অবিলম্বে তাঁদের কাজ দেবার উপায় হল চরখা।

২। লক্ষ লক্ষ লোক এ কাজ জানেন।

৩। সহজেই এ শেখা যায়।

৪। এ কাজ শুরু করতে নাম মাত্র পুঁজি বিনিয়োগ করতে হয়।

৫। সহজে এবং সস্তায় চরখা তৈরী করা যায়। আমাদের মধ্যে অনেকেই এখনও বোধ হয় একথা জানেন না যে একটি খোলামকুচি ও বাঁশের শলা দিয়েই সুতা কাটা যায়।

৬। জনসাধারণের মনে এর প্রতি কোন বিরোধ নেই।

৭। দুর্ভিক্ষ ও অনটনের সময় অবিলম্বে এর মাধ্যমে সহায়তা দেওয়া যায়।

৮। বিদেশী কাপড় কেনার ফলে দেশের যে টাকা বিদেশে যায় চরখাই একমাত্র তা বন্ধ করতে পারে।

৯। এইভাবে যে লক্ষ লক্ষ টাকা বাঁচে চরখার মাধ্যমে স্বভাবতই তা যোগ্য দরিদ্র ব্যক্তিদের মধ্যে বিতরিত হয়।

১০। এ কাজ অল্প মাত্রাতে সফল হলেও জনসাধারণের অনেকখানি প্রত্যক্ষ লাভ হয়।

১১। জনসাধারণের ভিতর সহযোগিতা স্থাপনের এ অতীব শক্তিশালী মাধ্যম।

কৃষিকার্যে নিরত চাষীদের কথা যখন আমার মনে পড়ে তখন আমার অস্বস্তি বোধ হয়। সেই দিনের প্রত্যাশায় আমি রয়েছি, যেদিন দেশের শাসক সম্প্রদায় এবং রাজনৈতিক-চেতনা-সম্পন্ন-শ্রেণী, দেশের দরিদ্র কৃষককুলের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রেখে, নিজেদের জীবনযাত্রা এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করবেন, যে তাঁদের ও গরীবদের মধ্যে আজ এই যে ব্যবধান বর্তমান তা মিটে যাবে।

…সেইজন্যেই আমি আপনাদের বলছি যে, চরখার ঐ ক্ষীণ সুতাই হচ্ছে সেই জিনিস, দরিদ্র জনসাধারণের সঙ্গে যা আমাদের এক পবিত্র এবং অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারে। দেশের হাতে কাটা সুতার পরিমাণ বৃদ্ধি করা থেকেই জানা যাবে যে, প্রাসাদ এবং কুটীরের ব্যবধান ঘোচাবার কাজে কতটুকু আপনার অবদান। প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়ে কোন প্রচলিত শ্রমশিল্পকে স্থানচ্যুত করা চরখার কাজ নয়, বা সুতা কাটার উদ্দেশ্যও সে রকম নয়। যে সুস্থ সমর্থ লোক অন্য কোন লাভজনক পেশা দ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করে, তাদের একজনকেও সে কাজ ছাড়ানোর উদ্দেশ্য চরখার নেই। ভারতের অন্যতম প্রধান সমস্যা অর্থাৎ কৃষির পরিপূরক কোন শ্রমশিল্প না থাকার দরুন, ভারতের জনসংখ্যার যে বিরাট অংশকে বৎসরে প্রায় ছয় মাস কাল বাধ্য হয়ে বেকারত্বকে বরণ করতে হয়, এবং তার ফলে জনসাধারণকে যে চিরস্থায়ী অনশনে কালাতিপাত করতে হয়, তার একমাত্র দ্রুত বাস্তব এবং স্থায়ী সমাধান এ করতে পারে, এই হচ্ছে এর তরফ থেকে একমাত্র দাবী।

সমালোচক বলবেন, "সুতাকাটাই যদি আপনার একমাত্র বক্তব্য হয়ে থাকে তাহলে এতদিনেও সর্বসাধারণ একে গ্রহণ করল না কেন?" সঙ্গত প্রশ্ন এ। এর উত্তর অত্যন্ত সহজ। এমন লোকেদের কাছে চরখার বাণী নিয়ে যেতে হবে যাঁদের কোন আশা নেই, নেই কোন উদ্যমের অবশেষ এবং নিজেদের ভাগ্যের উপর তাঁদের ছেড়ে দিলে তাঁরা পরিশ্রম করে বাঁচার চেয়ে বরং উপবাসে মৃত্যু বরণ করবেন। চিরকালই তাঁদের এ অবস্থা ছিল না; কিন্তু দীর্ঘকাল অনাদৃত থাকার ফলে আলস্য তাঁদের মজ্জাগত অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে। এ আলস্য নিরাকরণের একমাত্র পন্থা হল চরিত্রবান উদ্যমী লোকেদের সঙ্গে তাঁদের জীবন্ত সংযোগ সাধন। এই রকম লোকেরা তাঁদের সামনে চরখা কেটে দৃষ্টান্ত স্থাপনা করবেন এবং সৌম্য পদ্ধতিতে তাঁদের পথ দেখাবেন। দ্বিতীয় অসুবিধা হল খদ্দরের বাজারের অভাব। আমি স্বীকার করছি যে আপাতত খদ্দরের পক্ষে কলের কাপড়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা সম্ভব নয়। আর আমি এ জাতীয় কোন প্রাণঘাতী প্রতিযোগিতায় সম্মতিও দেব না। পুঁজিপতি বাজার দখল করার জন্য তাঁর কাপড় বিনা পয়সায় দিতে পারেন। কিন্তু যে উৎপাদনকারীর নিজ শ্রমই একমাত্র পুঁজি তাঁর পক্ষে এরকম করা সম্ভব নয়।…খদ্দরের সপক্ষে কল্যাণকর জাতীয় অভ্যাসকে পুনরুজ্জীবিত করুন, তাহলেই দেখবেন দেশের প্রতিটি গ্রাম মৌচাকের মত কর্মগুঞ্জনে মুখর।

লাভজনক উপায়ে পেরে উঠলে মিলের মালিকেরা অবশ্যই কলের সুতা বিক্রি বন্ধ করে নিজেরাই সে সুতা বোনার ব্যবস্থা করবেন। তাঁরা তো আর বিশ্বপ্রেমিক নন। টাকা রোজগার করার জন্য তাঁরা কল তৈরী করেছেন। সুতা বোনায় বেশী লাভ দেখলে তাঁরা তাঁতীদের সুতা বিক্রি করা বন্ধ করবেন।

তাঁত-শিল্পের (হ্যাণ্ডলুম) পক্ষে সবচেয়ে শ্বাসরোধকর পরিস্থিতি হচ্ছে কলের সুতা ব্যবহার করা। হাতে কাটা সুতার দ্বারাই কেবল তাঁত-শিল্পের এ সমস্যার সমাধান হতে পারে। চরখা যদি চলে যায় তাহলে তাঁতেরও অনুরূপ গতি হতে বাধ্য।

সুতা কাটা হচ্ছে কর্তব্য এবং কৃচ্ছ্রসাধন। ভারত মরতে বসেছে। দেশ আজ মৃত্যুশয্যাশায়ী। কোন মুমূর্ষুকে কি কখনও আপনারা দেখেছেন? কখনও কি তার পদতল স্পর্শ করেছেন? তার পদতল শীতল ও অসাড় হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও কপালে তখনও কিয়ৎ পরিমাণ উষ্ণতা থাকায়, আপনি হয়তো এই বলে সান্ত্বনা লাভ করতে পারেন যে এখনও তার প্রাণবায়ু নির্গত হয় নি। তার জীবনদীপ কিন্তু ধীরে ধীরে নির্বাপিত হচ্ছে। আমাদের মাতৃভূমির পদযুগল অর্থাৎ জনগণেরও এই একই অবস্থা। তারা শীতল ও অবশ। ভারতকে যদি বাঁচাতে চান, তবে আমি যে সামান্য কাজটুকু করতে বলছি, তাই করুন। সময় থাকতে চরখা ধরুন, নয়তো ধ্বংস হয়ে যাবেন।

চরখা আমার কাছে জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। চরখার বিনষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই জনসাধারণের যেটুকু স্বাধীনতা ছিল, তা অবলুপ্ত হয়। চরখা গ্রামবাসীদের কৃষির পরিপূরক ছিল এবং ছিল তাঁদের মর্যাদার প্রতীক। বিধবার বন্ধু ও সান্ত্বনা ছিল চরখা। চরখার জন্য গ্রামবাসীরা আলস্য পরিহার করতে পারত। কারণ চরখা বলতে কাপাসের বীজ ছাড়ান, তুলা ধোনা, নাটাই-এ জড়ান, টানা দেওয়া, মাড় লাগান, রং করা এবং কাপড় বোনা ইত্যাদি সুতা কাটার পূর্বেকার ও পরের যাবতীয় শিল্প বোঝায়। এর পরিণামে আবার গ্রামের ছুতোর কামার কাজ পেত। চরখা দেশের সাত লক্ষ গ্রামকে স্ব-রাট করেছিল। চরখার বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে ঘানী ইত্যাদি অন্যান্য কুটীর-শিল্পও ধ্বংস হয়ে গেল। এর বদলে গ্রামে অপর কোন শিল্পের প্রবর্তন হল না। সুতরাং গ্রামগুলি থেকে জীবিকার বিভিন্ন মাধ্যম, গ্রামবাসীদের সৃজনাত্মক প্রতিভা এবং এ সবের দ্বারা যতটুকু সম্পদ অর্জিত হত—সব বিদায় নিল।

সুতরাং গ্রামবাসীদের আবার স্বপ্রতিষ্ঠ করতে হলে স্বভাবতই চরখা এবং তার সংশ্লিষ্ট সব কিছুকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে।

স্বার্থলেশশূন্য এবং বুদ্ধিমান ও স্বদেশপ্রেমী একদল ভারতবাসীর অক্লান্ত প্রয়াস ছাড়া চরখার এই পুনরুজ্জীবন সম্ভব নয়। একাগ্রচিত্তে তাঁদের গ্রামে গ্রামে চরখার বাণী প্রচার করতে হবে এবং এর দ্বারা গ্রামবাসীদের দীপ্তি-বিহীন চোখে আশার আলো ফুটিয়ে তুলতে হবে। সহযোগিতা এবং বয়স্ক-শিক্ষার এক মহান প্রয়াস এ। এর পরিণামে চরখার নীরব অথচ প্রাণসঞ্চারী আবর্তনের মতই দেশে এক নিঃশব্দ অথচ সুনিশ্চিত বিপ্লব সংঘটিত হবে।

॥ চব্বিশ ॥

গ্রামীণ শিল্প

গ্রামীণ শিল্পের বিলুপ্তির অর্থ হল ভারতবর্ষের সাত লক্ষ গ্রামের ধ্বংস-কার্যের পূর্ণাহুতি।

দৈনিক সমাচার পত্রসমূহে আমার প্রস্তাবের যে বিরূপ সমালোচনা প্রকাশিত হয় তা আমি দেখেছি। আমাকে এই উপদেশ দেওয়া হয়ে থাকে যে মানুষের উদ্ভাবনী বুদ্ধি প্রকৃতির যে সব শক্তিকে করায়ত্ত করেছে তার সহায়তা নেবার মধ্যেই মুক্তির উপায় নিহিত। সমালোচকরা বলে থাকেন যে প্রগতিশীল পাশ্চাত্য দেশসমূহের মত আমাদেরও জল বায়ু তৈল এবং বিদ্যুৎ শক্তিকে পূর্ণ মাত্রায় কাজে লাগাতে হবে। তাঁরা আরও বলেন যে প্রকৃতির এই সব গোপন শক্তিটুক নিয়ন্ত্রিত করার ফলে প্রতিটি আমেরিকাবাসী তেত্রিশজন ক্রীতদাসের কাজ পাচ্ছেন।

ভারতবর্ষে এই পদ্ধতির অনুকরণ করে দেখুন। আমি বেশ জোর দিয়ে বলছি যে তাহলে এদেশের প্রতিটি অধিবাসী তেত্রিশটি ক্রীতদাসের সেবা পাওয়ার পরিবর্তে তেত্রিশ গুণ বেশী করে দাসত্ববন্ধনে আবদ্ধ হবেন।

কাজের তুলনায় কাজ করার লোকের সংখ্যা যখন খুব কম হয় তখনই কেবল যন্ত্রের সহায়তা নেওয়া ভাল। ভারতবর্ষের মত যে দেশে কাজের তুলনায় কর্মপ্রার্থী মানুষের সংখ্যা বেশী সেখানে এ এক অভিশাপ। কয়েক বর্গগজের এক টুকরা জমি খোঁড়ার জন্য আমি নিশ্চয় লাঙ্গল ব্যবহার করব

না। দেশের গ্রামগুলির বাসিন্দা লক্ষ লক্ষ মানুষ কি করে আরও বেশী অবসর পেতে পারে—এ আমাদের সমস্যা নয় সমস্যা হল কি করে তাদের বেকার সময়কে কাজে লাগান যায় এবং তাদের এই বেকার সময়ের পরিমাণ হল বছরে ছয় মাস। কথাটি শুনতে বিচিত্র মনে হলেও সত্য যে সাধারণত প্রতিটি কারখানাই গ্রামের পক্ষে বিপদ স্বরূপ। আমি অবশ্য সূক্ষ্ম হিসাব করিনি, তবে নির্বিবাদে আমি এই কথা বলতে পারি যে কারখানার প্রতিটি শ্রমিক গ্রামের অনুরূপ কার্যে নিরত অন্ততঃ দশ জন শ্রমিকের কাজ করে থাকেন।' অর্থাৎ একজন করখানার শ্রমিক তার গ্রামের দশটি ভাইকে বঞ্চিত করে তাদের থেকে বেশী রোজগার করেন। এই ভাবে সুতা কাটা ও কাপড় বোনার কলগুলি গ্রামবাসীদের নিজ রোজগারের একটা মোটা অংশ থেকে বঞ্চিত করছে। জবাবে একথা বলে লাভ নেই যে কলে সস্তায় ভাল কাপড় হয়। এ দাবী আদৌ সত্য কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ থাকলেও এখনকার মত না হয় সেকথা ছেড়ে দেওয়া গেল। কিন্তু কল যখন হাজার হাজার কাটুনী ও তাঁতীকে বেকার করে তখন সব চেয়ে সস্তার কলের কাপড়ও গ্রামে উৎপন্ন সর্বাপেক্ষা মহার্ঘ খদ্দরের তুলনায় বেশী দামী। কয়লা খাদানের যে শ্রমিক নিজ কর্মক্ষেত্রের ধারে কাছে অবিলম্বে কয়লা ব্যবহার করতে পারে তার কাছে কয়লা দামী বস্তু নয়। এই ভাবে যে গ্রামবাসীটি নিজের খদ্দর উৎপাদন করে নেন তাঁর কাছে খাদি মোটেই মহার্ঘ নয়।

গ্রামীণ শিল্প পরিকল্পনার পিছনে উদ্দেশ্য হল এই যে আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয়তাসমূহের পরিপূর্তির জন্য আমরা গ্রামের উপর নির্ভরশীল হব এবং যখন দেখব যে কোন কোন জিনিস গ্রাম থেকে পাওয়া যাচ্ছে না তখন চেষ্টা করতে হবে যাতে একটু পরিশ্রম ও কিঞ্চিৎ সংগঠনের দ্বারা সেই সব জিনিসগুলি লাভজনক উপায়ে গ্রাম থেকে সরবরাহ করা যায়। এ ক্ষেত্রে লাভের হিসাব করার সময় নিজেদের কথা নয়, গ্রামবাসীদের কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। হতে পারে যে প্রথম দিকে বাজারের চেয়ে কিছু বেশী দাম দিয়েও আমাদের অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট জিনিস কিনতে হবে। তবে আমাদের প্রয়োজন পরিপূর্তিকারীদের প্রতি নজর দিলে অবস্থার উন্নতি হবে। আমাদের দেখতে হবে যে তাঁরা যেন আরও কুশলী হয়ে ওঠেন এবং এর, জন্য তাঁদের সাহায্যও করতে হবে।

ব্যাপকভাবে যন্ত্রশিল্পের প্রবর্তনের ফলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বাজার পাবার

সমস্যা দেখা দেবে ও তার পরিণামে নিঃসন্দেহে গ্রামবাসীদের প্রচ্ছন্ন বা সক্রিয় শোষণ আরম্ভ হবে। সুতরাং গ্রামকে স্বাবলম্বী করার প্রতি আমাদের নজর দিতে হবে অর্থাৎ গ্রামে উৎপাদন হবে প্রধানতঃ উপভোগের জন্য। গ্রামীণ শিল্পের এই চারিত্রধর্ম বজায় থাকলে গ্রামবাসীরা তাদের সাধ্য ও শক্তি অনুসারে একেবারে আধুনিকতম যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে পারেন। শুধু এই সব যন্ত্রপাতিকে অপরের শোষণের জন্য ব্যবহার করা চলবে না।

শহরগুলি আজকে গ্রামের উপর আধিপত্য করে ও গ্রামের সম্পদ শহরে চলে যায়। এর ফলে গ্রামগুলি নিঃস্ব হতে হতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে। আমার খাদি মনোবৃত্তি আমাকে এই শিক্ষা দেয় যে বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন হয়ে শহরগুলির গ্রামের সেবকের ভূমিকা গ্রহণ করা উচিত। গ্রামের শোষণ স্বয়ং সংগঠিত হিংসা। অহিংসার বনিয়াদের উপর স্বরাজ-সৌধ গড়ার ইচ্ছা থাকলে গ্রামগুলিকে তাদের ন্যায্য স্থান দিতে হবে।

আটা পেষা, ধান ভানা, সাবান, কাগজ, দেশলাই ইত্যাদি তৈরী, চামড়া পাকানো, ঘানী ইত্যাদি অপরিহার্য গ্রামীণ শিল্প ছাড়া গ্রামের অর্থব্যবস্থা সম্পূর্ণ হতে পারে না। কংগ্রেস কর্মিরা এই সব গ্রামীণ শিল্পের দিকে নজর দিতে পারেন এবং তাঁরা যদি গ্রামবাসী হন অথবা গ্রামে বসতি স্থাপন করেন তাহলে তাঁরা এই সব শিল্পকে নবজীবন ও নূতন রূপ দেবেন। যখন ও যেখানে পাওয়া যায় কেবল কুটীরশিল্পজাত পণ্য ব্যবহার করাকে সকলে সম্মানের বিষয় বলে মনে করবেন। চাহিদা থাকলে আমাদের প্রয়োজনীয় অধিকাংশ জিনিসই যে গ্রাম থেকে সরবরাহ করা যায় এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমাদের মন গ্রামাভিমুখী হয়ে উঠলে আমরা পাশ্চাত্য দেশে তৈরী বা যন্ত্র নির্মিত পণ্যের অনুকরণে প্রস্তুত দ্রব্য সামগ্রী চাইব না। আমাদের ভিতর তখন দারিদ্র্য বুভুক্ষা ও বেকারত্ব রহিত নবীন ভারতবর্ষের উপযুক্ত এক যথার্থ জাতীয় রুচির বিকাশ হবে।

কি ভাবে শুরু করা যায়?

পত্রলেখক এবং দর্শনার্থী বন্ধুরা আমাকে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করেন যে কি ভাবে গ্রামীণ শিল্পের কাজ শুরু করা যায় এবং প্রথমে কি করতে হবে।

এর একমাত্র উত্তর হল, "নিজেকে দিয়ে প্রথমে আরম্ভ করুন এবং আপনার পক্ষে সব চেয়ে সহজে প্রথমে যা করা সম্ভব তাই করুন।"

কেবল এইটুকু জবাবে অবশ্য প্রশ্নকারীরা সন্তুষ্ট হন না। সুতরাং আর একটু বিস্তারপূর্বক কথাটি বলা যাক।

প্রত্যেক ব্যক্তি খাদ্য বস্ত্র বা অন্যান্য যে সব জিনিস প্রত্যহ ব্যবহার করে থাকেন সেগুলি একবার পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। তারপর বিদেশ বা শহরে প্রস্তুত জিনিসের বদলে গ্রামবাসীদের দ্বারা সহজ ও সস্তা হাতিয়ার পত্র—যেসব হাতিয়ার তাঁরা সহজে চালাতে ও মেরামত করতে পারেন, তার সহায়তায় উৎপন্ন পণ্য ব্যবহার করা আরম্ভ করতে পারেন। এই ভাবে বিদেশ ও শহরের তৈরী জিনিসের বদলে গ্রামের জিনিস ব্যবহার করতে আরম্ভ করা স্বয়ং একটি বহু মূল্যবান শিক্ষা ও এক দৃঢ় ভিত্তিক প্রারম্ভ। পরবর্তী পদক্ষেপ আপনা আপনি বোঝা যাবে। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক যে গ্রামীণ শিল্পের পৃষ্ঠপোষণে ইচ্ছুক কেউ বোম্বাই-এর কোন কারখানায় তৈরী একটি দাঁত মাজার বুরুশ ব্যবহার করেন। এর বদলে তিনি গ্রামের বুরুশ ব্যবহার করতে চান। তাঁকে তাই বাবলার দাঁতন ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হবে। তাঁর দাঁত যদি কমজোর হয় অথবা পড়ে গিয়ে থাকে তাহলে শক্ত কোন কিছুর উপর রেখে একটি গোল পাথর বা হাতুড়ির সাহায্যে দাঁতনের একটি দিক তাঁকে থেঁতলে নিতে হবে। দাঁতনের অপর দিকটি ছুরী দিয়ে দুই ফালা করে নিয়ে তিনি জিভ ছোলা হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন। তিনি দেখবেন যে এই বুরুশ কারখানায় তৈরী অস্বাস্থ্যকর বুরুশের চেয়ে অনেক সস্তা ও অনেক পরিষ্কার হবে। শহরে তৈরী দাঁতের মাজনের পরিবর্তে তিনি ভালভাবে গুঁড়িয়ে নেওয়া পরিষ্কার কাঠকয়লার সঙ্গে সমপরিমাণ পরিষ্কার নূন মিশিয়ে নেবেন। এইভাবে কলের কাপড়ের পরিবর্তে তিনি গ্রামের খদ্দর, কলের চালের বদলে হাতে কোটা চাল এবং কলের চিনির বদলে গুড় ব্যবহার করবেন। উদাহরণগুলি কেবল নমুনা স্বরূপ।
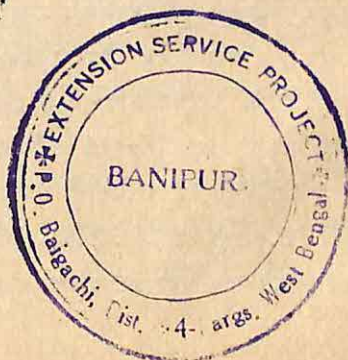
॥ পঁচিশ ॥

সরকার কি করতে পারে

কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর খদ্দর ও অন্যান্য গ্রামীণ শিল্পের জন্য তাঁরা কি করবেন সঙ্গতভাবেই সে প্রশ্ন উঠেছে। এর জন্য পৃথক কোন মন্ত্রী নিযুক্ত হন বা না-ই হন এই কাজের জন্য অবশ্যই আলাদা একটি বিভাগের প্রয়োজন হবে। আজকালকার মত অন্ন-বস্ত্রের অনটনের সময় এই বিভাগ খুবই সহায়ক হতে পারে। মন্ত্রীরা অখিল ভারত চরখা সঙ্ঘ ও অখিল ভারত গ্রামোদ্যোগ সঙ্ঘের কাছ থেকে এ কাজের জন্য বিশেষজ্ঞ পেতে পারেন। নামমাত্র অর্থ বিনিয়োগ করে এবং অত্যল্প কালের মধ্যে সমগ্র ভারতকে খদ্দরের কাপড় পরাবার ব্যবস্থা করা যায়। প্রত্যেকটি প্রাদেশিক সরকারকে নিজ নিজ প্রদেশের জনসাধারণকে জানিয়ে দিতে হবে যে তাঁদের নিজেদের পরার উপযুক্ত খদ্দর তৈরী করে নিতে হবে। এর ফলে স্বাভাবিক ভাবেই স্থানীয় উৎপাদন ও বণ্টনের সূত্রপাত হবে। আর গ্রামে শহরবাসীদের ব্যবহারের জন্য কিছুটা বাড়তি খদ্দর উৎপাদন হবে এবং তার ফলে স্থানীয় কাপড়ের কলগুলির উপর চাপ কম পড়বে। দেশের কাপড়ের কলগুলি তখন পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীদের বস্ত্রের প্রয়োজনপূর্তির কাজ করতে পারবে।

কিভাবে এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায় ?

সরকার গ্রামবাসীদের কাছে এই কথা বিজ্ঞাপিত করে দেবেন যে একটা নির্দিষ্ট সময়ের ভিতর তাঁদের নিজ প্রয়োজনীয় খদ্দর উৎপাদন করে নিতে হবে এবং তারপর তাঁদের কাপড় সরবরাহ করার দায়িত্ব সরকারের উপর থাকবে না। আর সরকারের কাজ হবে প্রয়োজন মত গ্রামবাসীদের পড়তা দরে তুলারবীজ ও তুলা সরবরাহ করা। সরকারচরখা ও তাঁত ইত্যাদিও উৎপাদন মূল্যে গ্রামবাসীদের দেবেন এবং এই দাম পাঁচ বা তার বেশী বাৎসরিক কিস্তিতে তাদের কাছ থেকে নেবার ব্যবস্থা থাকবে। সরকার গ্রামবাসীদের খদ্দর উৎপাদন-কলা শেখাবার জন্য শিক্ষক পাবার ব্যবস্থা করে দেবে এবং গ্রামবাসীরা খাদিধারী হবার পর গ্রামের উদ্বৃত্ত খদ্দর কিনে নেবে। এর ফলে খুব একটা হৈ-চৈ না করেই দেশের বস্ত্রাভাব সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হবে এবং এর ব্যবস্থা-খরচও হবে খুব কম।

শিল্পের দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রামের সমীক্ষা করতে হবে এবং বিনা সাহায্যে বা নামমাত্র সহায়তায় গ্রামবাসীদের উপভোগ্য যেসব পণ্য গ্রামে উৎপাদন করা যায় তার একটা তালিকা তৈরী করতে হবে। ঘানীর তেল ও খইল, ঘানীতে উৎপন্ন জ্বালানী তেল, হাতে কোটা চাল, তাল-খেজুরের গুড়, খেলনা, মাদুর, হাতে তৈরী কাগজ, সাবান ইত্যাদি এই তালিকায় পড়বে। এইভাবে যথোচিত প্রযত্ন করলে যেসব গ্রাম আজকে প্রায় মৃত বা মুমূর্ষু আবার সেগুলি প্রাণস্পর্শে গুঞ্জন করে উঠবে। নিজেদের ও ভারতবর্ষের শহরগুলির প্রয়োজনপূর্তির যে সুপ্ত ক্ষমতা গ্রামগুলির ভিতর রয়েছে তা আবার কার্যকর হবে।

॥ ছাব্বিশ ॥

স্বদেশীর বাণী

যে উদ্দীপনার বশবর্তী হয়ে আমরা দূরের জিনিসের পরিবর্তে আমাদের চতুষ্পার্শ্বে প্রাপ্ত দ্রব্যসামগ্রী দ্বারা আমাদের প্রয়োজন মেটাই তাকেই বলে স্বদেশী। এইভাবে ধর্মের ব্যাপারে এই সংজ্ঞা অনুযায়ী উপযুক্ত আচরণ হচ্ছে পৈতৃক ধর্মের গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখা। এরই নাম হচ্ছে স্বীয় চতুষ্পার্শ্বস্থ ধর্মের গণ্ডীর উপযোগ করা। আমার নিজের ধর্মে আমি যদি কোন দোষ দেখি তবে আমি তার সে দোষ মুক্ত করে তার সেবা করব। রাজনীতির ক্ষেত্রে আমি স্বদেশী প্রতিষ্ঠানসমূহের সহায়তা করব এবং তাদের যাবতীয় দোষের সংশোধন করে তার সেবা করব। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমার নিকটতম প্রতিবেশী দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্যসমূহই শুধু আমি ব্যবহার করব এবং ঐ ব্যবসাগুলির কোন ত্রুটিবিচ্যুতি থাকলে সেগুলির সংশোধন করে তাদের সুচারুরূপে পরিচালনার বন্দোবস্ত করে আমি তার সেবা করব। অনেকে বলেন এরকম স্বদেশীকে কাজে পরিণত করতে পারলে স্বর্ণযুগের সূত্রপাত হবে।

স্বদেশীর উপযুক্ত তিনটি বিভাগ সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচনা করে দেখা যাক। স্বদেশী মনোবৃত্তি অন্তর্নিহিত থাকার জন্য হিন্দুধর্ম এক রক্ষণশীল ধর্মে এবং সেই কারণে এক বিরাট শক্তিতে পরিণত হয়েছে। হিন্দুধর্ম সর্বাপেক্ষা

অধিক পরমতসহিষ্ণু, কারণ এতে ধর্মান্তরিতকরণের স্থান নেই এবং পূর্বের ন্যায় এখনও এই ধর্ম সম্প্রসারণক্ষম। আমার মতে হিন্দুধর্ম বৌদ্ধধর্মের বিলুপ্তি ঘটায়নি, বরং সুষ্ঠুভাবে বৌদ্ধধর্মকে নিজের ভিতর একাঙ্গীভূত করেছে। স্বদেশী ভাবের জন্যই একজন হিন্দু ধর্ম-পরিবর্তনে অনিচ্ছুক। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, তার নিজ ধর্মই সর্বশ্রেষ্ঠ, বরং সে জানে যে এর সংস্কারসাধন দ্বারা সে এর পরিপূর্তি ঘটাতে পারে। আমার বোধ হয় যে, হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে আমার বক্তব্য জগতের যাবতীয় মহান ধর্মবিশ্বাসগুলি সম্বন্ধে প্রযোজ্য। এবার আসছে সেই কথা যার জন্য আমি এত উপক্রমণিকা করেছি। যেসব-কথা আমি বলেছি তার মধ্যে যদি বিন্দুমাত্র পদার্থ থাকে, তবে ভারতে যে সমস্ত ধর্ম প্রচারের প্রতিষ্ঠান আছে, যাদের কাছে তাদের অতীত এবং বর্তমান কার্যকলাপের জন্য ভারতবাসী কৃতজ্ঞ, তারা ধর্মান্তরিতকরণের উদ্দেশ্য বর্জন করে, জনসেবামূলক কাজগুলি চালিয়ে গেলে, সে কি অধিকতর সুচারুরূপে খ্রীষ্টীয় আদর্শের সেবা হয় না ?

এই স্বদেশী মনোবৃত্তির দৃষ্টিকোণ থেকে আমি দেশীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে দেখি এবং গ্রাম্য পঞ্চায়েত-প্রথা আমার ভাল লাগে। সত্যসত্যই ভারত একটি প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র এবং এইজন্য অতীতের যাবতীয় আঘাতের হাত এড়িয়ে ভারত আজও টিকে আছে। রাজস্ব আদায় করা ছাড়া, ভারতীয় বা অভারতীয় রাজন্যবর্গ কোনদিনই আর কোনভাবে ভারতের জনসাধারণের সংস্রবে আসেন নি। জনসাধারণও তাঁদের পাওনাটুকু মাত্র তাঁদের দিয়ে নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী আর সবই করেছে। শুধু ধর্মের প্রয়োজনেই এই বিরাট জাতিভেদ-প্রথা গড়ে ওঠেনি, রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও এর প্রয়োজনীয়তা ছিল। জাতিভেদ-প্রথা মারফৎ গ্রামবাসীরা তাদের আভ্যন্তরীণ কার্যকলাপ পরিচালিত করত এবং এর দ্বারা তারা শাসকগোষ্ঠীর যে কোন অত্যাচারের সম্মুখীন হত! জাতিভেদ-প্রথা মারফৎ যে জাতি এই রকম এক অনবদ্য সংগঠন-প্রতিভার সৃষ্টি করতে পারে, তাদের সংগঠনী শক্তিকে অস্বীকার করা যায় না। সে সংগঠনী শক্তির দক্ষতা যে কতখানি তা বোঝা যায় শুধু হরিদ্বারের কুম্ভমেলা দেখলে···যেখানে বাহ্যত কোন প্রচেষ্টা বিনা লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রীর ব্যবস্থা হয়ে থাকে! আমাদের সংগঠনী শক্তির অভাব আছে বলাটাই তবু রেওয়াজ হয়ে উঠেছে। অবশ্য নতুন পরিপ্রেক্ষিতে যাঁরা মানুষ হয়েছেন, তাঁদের বেলায় একথা অংশত সত্য।

স্বদেশী মনোবৃত্তির মারাত্মক অভাবজনিত ভীষণ বিপত্তির মধ্যে দিয়ে আমাদের কাজ করতে হয়েছে। বিদেশী ভাষায়, আমরা এই শিক্ষিত সম্প্রদায়, শিক্ষা পেয়েছি। জনসাধারণের ভিতর আমরা তাই কোন প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হইনি। আমরা জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করতে চাই ; কিন্তু পারি না। আমাদের তারা ইংরেজ রাজকর্মচারীদের মতই ভাবে। আমাদের উভয়ের মধ্যে কারও কাছেই তারা হৃদয়ের দুয়ার খোলে না। তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা আমাদের মনে সাড়া জাগায় না। তাই এই বিচ্ছেদ। সুতরাং বাস্তব ক্ষেত্রে এতে সংগঠনী শক্তির ব্যর্থতা প্রতীয়মান হয় না বরং দেখা যায় জনসাধারণ ও তাদের প্রতিনিধিবর্গের ভিতর সংযোগের অভাব। বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে যদি মাতৃভাষা মারফৎ আমাদের শিক্ষা দেওয়া হত তবে আমাদের বয়সী দেশবাসী, পরিচারক বা প্রতিবেশী-বর্গ আমাদের জ্ঞানের অংশ গ্রহণ করতেন এবং বসু বা রায়ের আবিষ্কারসমূহ রামায়ণ-মহাভারতের মতই আমাদের ঘরোয়া সম্পত্তি হত। জনসাধারণের কাছে বর্তমানে এই সব বিরাট আবিষ্কারগুলি কোন বিদেশীর হলেও বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। আমি জোর গলায় বলতে পারি যে, জ্ঞানের সমস্ত বিভাগে যদি মাতৃভাষা মারফৎ শিক্ষা দেওয়া হত, তবে তার অভাবনীয় সমৃদ্ধি ঘটত। গ্রাম্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি সমস্যারও বহুপূর্বে সমাধান হয়ে যেত। স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে গ্রাম্য পঞ্চায়েতগুলি আজ তাহলে এক জীবন্ত শক্তির আধার হত এবং ভারতবর্ষ তার প্রয়োজনানুগ স্বায়ত্তশাসন উপভোগ করত। ভারতের পুণ্যভূমিতে তাহলে এই ঘৃণ্য সঙ্ঘবদ্ধ হানাহানির দৃশ্য প্রত্যক্ষ করা থেকে রেহাই পাওয়া যেত। তবে শোধরানোর অবসর এখনও আছে।

স্বদেশীর তৃতীয় এবং শেষ লক্ষ্যটির সম্বন্ধে এখন আলোচনা করা যাক। অর্থনীতি এবং শিল্পনীতির ক্ষেত্রে স্বদেশী মনোবৃত্তির মারাত্মক অভাবই জনগণের এই বিরাট দারিদ্র্যের জন্য বহুলাংশে দায়ী। একটিমাত্র পণ্যও যদি বিদেশ থেকে ভারতে না আনতে হয়, তবে ভারত আমার ধনধান্যে ভরে উঠবে। কিন্তু তা হবার নয়। আমরা ছিলাম লোভাতুর এবং ইংল্যাণ্ডও তদ্রূপ। ভারত এবং ইংল্যাণ্ডের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল ভুলের ভিত্তির উপর। তবে ইংল্যাণ্ড যে ভারতের উপর চেপে রয়েছে এতে কোন ভুল নেই। ভারতকে তার জনসাধারণের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেওয়া হবে—এই হচ্ছে ইংল্যাণ্ডের বহুবিঘোষিত নীতি। এ যদি সত্য হয় তবে

ল্যাঙ্কাশায়ারের স্থান এর মধ্যে নেই। আর স্বদেশী নীতি যদি অভ্রান্ত হয় তবে ল্যাঙ্কাশায়ারের সাময়িক ক্ষতি হলেও শেষ পর্যন্ত এ অক্ষত হয়ে বিরাজিত থাকবে। স্বদেশীকে আমি প্রতিশোধাত্মক বর্জননীতি বলে মনে করি না। একে আমি সর্বজনগ্রাহ্য ধর্মনীতি বলে বিবেচনা করি। আমি অর্থনীতিবিদ নই, তবে এমন অনেক বই আমি পড়েছি যার থেকে জানতে পেরেছি যে সহজেই ইংল্যাণ্ড প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনকারী আত্মনির্ভরশীল দেশে পরিণত হতে পারে। হয়ত একে এক নিতান্ত হাস্যকর তথ্য বলে মনে হতে পারে এবং এ যে মিথ্যা তার সবচেয়ে শক্তিশালী যুক্তি হচ্ছে এই যে ইংল্যাণ্ড তুনিয়ার ভিতর অন্যতম প্রধান আমদানীকারী দেশ। তবে নিজের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত ল্যাঙ্কাশায়ারের জন্য ভারত জীবনধারণ করতে পারে না। ভারত যদি তার সীমানার মধ্যে নিজের প্রয়োজনীয় যাবতীয় জিনিস উৎপন্ন করতে পারে তবেই সে তার নিজের ব্যবস্থা করতে পারবে। যে উন্মত্ত এবং ধ্বংসদ্যোতক প্রতিযোগিতার ফলে হিংসা এবং ভ্রাতৃঘাতী দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়, তার আবর্তের মধ্যে ভারত যাবে না এবং তার যাওয়া উচিতও হবে না। কিন্তু ভারতের কোটিপতিদের জগৎজোড়া প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখবে কে? আইন নিশ্চয় তা পারবে না। এই আকাঙ্ক্ষিত মার্গে পৌঁছানর জন্য জনমতের চাপ এবং উপযুক্ত শিক্ষা অবশ্যই যথেষ্ট কিছু করতে পারে। হস্তচালিত বয়নশিল্প আজ মৃতপ্রায়। ভ্রমণকালে আমি যতগুলি পারি বয়নকারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার চেষ্টা করেছি। কেমনভাবে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, কেমনভাবে বহু পরিবার একটা সমৃদ্ধিশালী এবং সম্মানজনক এই পেশা পরিত্যাগ করেছে, এ দেখে আমার হৃদয় বেদনায় অভিভূত হয়ে উঠেছে।

স্বদেশী নীতি গ্রহণ করলে আপনার আমার সকলেরই কর্তব্য হবে আমাদের যে সমস্ত প্রতিবেশী আমাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহের চাহিদা মেটাতে পারে, তাদের খুঁজে বের করা। কি করে আমাদের চাহিদা মেটানো যেতে পারে, একথা যাদের জানা নেই, তাদের এ শেখাতে হবে. কারণ আমাদের দেশে এমন বহু লোক আছে যাদের যথোপযুক্ত পেশার নিতান্তই অভাব। তাহলে ভারতের প্রত্যেক গ্রাম মোটামুটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ এবং আত্মনির্ভরশীল হবে এবং একমাত্র যে সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিস স্থানীয় প্রচেষ্টায় তৈরী হওয়া সম্ভব নয়, অপরাপর গ্রামের সঙ্গে সেইগুলির বিনিময়

করবে। এসব হয়ত অর্থহীন মনে হতে পারে। সারা ভারতবর্ষই যে অসঙ্গতিতে পূর্ণ। কোন সহৃদয় মুসলমান যখন বিশুদ্ধ পানীয় জল দেন, তখন তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে মরা অর্থহীন। তবু এমন বহু হিন্দু আছেন, যাঁরা তৃষ্ণায় মরে যাবেন কিন্তু কোন মুসলমান গৃহস্বামীর হাতের জল খাবেন না। ধর্মের খাতিরেই তাঁদের ভারতে প্রস্তুত পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করা ও খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। একথা যদি একবার এই সমস্ত অসঙ্গত আচরণকারী জনসাধারণকে বোঝান যায়, তবে এরাও বিদেশী পোশাক-পরিচ্ছদ এবং খাদ্য বর্জন করতে পারে।

ভগবদ্‌গীতাতে একটি শ্লোক আছে যার মোটামুটি অর্থ হচ্ছে এই যে, জনসাধারণ গোষ্ঠীরই অনুকরণ করে। সাময়িকভাবে প্রভূত অসুবিধা হওয়া সত্ত্বেও কোন গোষ্ঠীর চিন্তাশীল অংশ যদি স্বদেশী ব্রত গ্রহণ করে, তবেই এই অন্যায় দূরীভূত হতে পারে। জীবনের যে কোন ক্ষেত্রে আইনের হস্তক্ষেপকে আমি ঘৃণা করি। বড়জোর একে ন্যূনতর অন্যায় বলা যেতে পারে। কিন্তু বিদেশী পণ্যের উপর উচ্চহারে রক্ষণ-শুল্ক চাপানোকে আমি মেনে নেব, অভিনন্দন জানাবো এবং এমন কি এর স্বপক্ষে আন্দোলন চালাব। নাটাল একটি ব্রিটিশ উপনিবেশ হওয়া সত্ত্বেও অপর একটি ব্রিটিশ উপনিবেশ মরিশাসের চিনির উপর শুল্ক ধার্য করে নিজের চিনির ব্যবসা রক্ষা করেছিল। ভারতের সঙ্গে অবাধ বাণিজ্য চালিয়ে ইংল্যাণ্ড ভারতের প্রতি অন্যায় করেছে। তাদের কাছে এ জীবনরসায়ন হতে পারে, কিন্তু এদেশে এ প্রথা বিষতুল্য পরিগণিত হয়েছে।

কখনও কখনও বলা হয় যে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারত কোন দিনই স্বদেশী নীতি গ্রহণে সমর্থ হবে না। যাঁরা এ আপত্তি তোলেন, স্বদেশীকে তাঁরা জীবনের ধর্ম বলে মনে করেন না। তাঁদের কাছে এ শুধু এক দেশপ্রেমিকতার প্রচেষ্টা এবং আত্মনিগ্রহের সম্ভাবনা থাকলে এ প্রচেষ্টার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। এই স্থলে প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী স্বদেশী হচ্ছে এক ধর্মীয় অনুশাসন, ব্যক্তিগত শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তিলমাত্র দৃষ্টিপাত না করেও যা পালন করা কর্তব্য। এর যাদুতে পড়লে, একটি কাঁটা বা সুঁচ ভারতে তৈরী নয় বলে তাকে ত্যাগ করতে হলেও, তাতে কোন রকমেই আতঙ্ক হয় না। আজ যে সমস্ত জিনিস আমরা একান্ত আবশ্যক মনে করি, তার বহু কিছু ছাড়াই স্বদেশীওয়ালাকে কাজ চালাতে শিখতে হবে। তা ছাড়া স্বদেশীকে অসম্ভাব্য

বলে যাঁরা মন থেকে বিসর্জন দেন, তাঁরা ভুলে যান যে স্বদেশী হচ্ছে একটি আদর্শ এবং ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এ আদর্শে পৌঁছতে হয়। নির্দিষ্ট কয়েকটি দ্রব্যের মধ্যে স্বদেশীকে সীমাবদ্ধ রেখে সাময়িকভাবে যদি আমরা ভারতের যে সব জিনিস পাওয়া সম্ভব নয় সেগুলি ব্যবহার করি তবুও আমরা স্বদেশী আদর্শের পরিপূর্তির পথে অগ্রসর হব।

স্বদেশীর বিরুদ্ধে আর একটি আপত্তি তোলা হয়, সে সম্বন্ধে আলোচনা করা বাকী রয়ে গেছে। আপত্তিকারীরা একে সভ্যতার নীতিশাস্ত্রের বিধিবহির্ভূত এক নিতান্ত স্বার্থপর মতবাদ বলে বিবেচনা করেন। তাঁদের কাছে স্বদেশী গ্রহণ করার অর্থ হল বর্বরতার যুগে প্রত্যাবর্তন। আমার পক্ষে বর্তমানে এই ব্যাপারের বিশদ বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। তবে আমি একথা বলব যে, স্বদেশীই হচ্ছে একমাত্র নীতি যার সঙ্গে প্রেম এবং বিনয়ের সঙ্গতি বিদ্যমান। নিজের পরিবারের যখন আমি সেবা করতে পারি না, তখন সারা ভারতের সেবা করার পরিকল্পনা করা অনুচিত ঔদ্ধত্য মাত্র। বরং নিজ পরিবারের মধ্যেই আমার প্রচেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করা উচিত এবং আমার ভাবা উচিত যে এর মারফৎই আমি সমস্ত জাতি ও এমন কি সমগ্র মানব-সমাজের সেবা করছি। এই হচ্ছে বিনয় এবং একেই বলে প্রেম। উদ্দেশ্যই কাজের গুণাগুণ বিচার করবে। অপরের প্রতি আমি যে অবিচার করছি সেদিকে কিছুমাত্র দৃকপাত না করেও আমি নিজ পরিবারের সেবা করতে পারি। উদাহরণ স্বরূপ, আমি এমন একটি চাকুরি নিতে পারি, যাতে জনসাধারণের কাছ থেকে অর্থশোষণ করা যায়। এর দ্বারা আমি নিজে ধন সংগ্রহ করে আমার পরিবারের বহু অন্যায় দাবী পূর্ণ করতে পারি। এ অবস্থায় আমি নিজ পরিবার বা রাষ্ট্রের কোনটিরই সেবা করছি না। আমি বরং ভাবব যে, ভগবান আমাকে নিজের এবং আমার আশ্রিতবর্গের ভরণপোষণের জন্য পরিশ্রমার্থ হাত পা দিয়েছেন। সে ক্ষেত্রে আমি তৎক্ষণাৎ নিজের এবং সহজে যাদের প্রবুদ্ধ করতে পারি, তাদের জীবনযাত্রাপ্রণালী আরও সাদাসিধে করব। এক্ষেত্রে অপর কারও ক্ষতি না করে নিজের পরিবারের সেবা করা হবে। সকলে এই রকম জীবনযাত্রাপ্রণালীকে অনুসরণ করলে এক আদর্শ অবস্থার সৃষ্টি হবে। সবাই অবশ্য এই আদর্শে একযোগে উপনীত হতে পারবে না। তবে এর অন্তর্নিহিত সত্যকে অনুধাবন করে আমাদের মধ্যে যাঁরা একে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করবেন, নিঃসন্দেহেই তাঁরা সেই সুখপ্রভাতের

আবির্ভাবকে ত্বরান্বিত করবেন। এই জীবনযাত্রা-প্রণালীতে অন্যান্য দেশকে বাদ দিয়ে শুধু ভারতের সেবা করা হয় মনে হলেও, আমার মতে এতে অপর কোন দেশেরই অনিষ্ট করা হয় না। আমার স্বদেশপ্রেম যেমন বর্জন-ধর্মী তেমনি আবার গ্রহণ-ধর্মীও বটে। বর্জন-ধর্মী এই অর্থে যে যথোচিত বিনয় সহকারে আমি আমার জন্মভূমির প্রতিই আমার মনোযোগকে সীমাবদ্ধ করে রাখি, আবার এ গ্রহণ-ধর্মী এই অর্থে যে আমার সেবা প্রতিযোগিতা বা বিরোধের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। "এমনভাবে নিজের জিনিস ব্যবহার কর যে, অপরের যেন ক্ষতি না হয়"—প্রবচনটি শুধু আইনের কথাই নয়। জীবনের এ একটি সুন্দর মূলমন্ত্র। যথাযোগ্যভাবে অহিংসা বা প্রেমের সাধনায় এই হচ্ছে আসল কথা।

জড় উপাসনার বস্তুতে পরিণত করলে অপর যে কোন ভাল জিনিসের মত স্বদেশীও মৃত্যু সমতুল্য হয়ে উঠতে পারে। এই বিপদের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকতে হবে। কেবল বিদেশী বলেই কোন পণ্য বর্জন করে নিজেদের দেশ সেইসব পণ্য উৎপাদনের অনুপযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তার উৎপাদনের জন্য জাতির সময় ও অর্থের অপচয় করা মারাত্মক নির্বুদ্ধিতার লক্ষণ এবং এ মনোভাব স্বদেশীবৃত্তির পরিপন্থীও বটে। স্বদেশীর যথার্থ অনুরাগী বিদেশীদের বিরুদ্ধে কোনরকম বিরূপ মনোভাব পোষণ করবেন না—পৃথিবীর কারও প্রতি কোনরকম শত্রুতা তাঁর মনে থাকবে না। স্বদেশী বিদ্বেষপ্রসূত ধর্ম নয়। এ হল স্বার্থলেশশূন্য সেবার নীতি এবং এর মূল রয়েছে বিশুদ্ধ অহিংসা বা প্রেমে।

॥ সাতাশ ॥

গ্রামের সাফাই

বুদ্ধিবৃত্তি ও শ্রমের বিচ্ছেদের কারণ গ্রামগুলি মারাত্মকভাবে উপেক্ষিত হয়েছে। এইজন্য সমগ্র দেশে আভিজাত্যপূর্ণ কুটীরশ্রেণী ছড়িয়ে থাকার পরিবর্তে আজ গোময়স্তূপ পরিদৃষ্ট। বহু ক্ষেত্রেই গ্রামের প্রবেশপথ পূতিগন্ধময়। ময়লা নোংরা ও দুর্গন্ধের কারণ মানুষকে চোখ বন্ধ করে নাকে কাপড় চাপা দিয়ে গ্রামে ঢুকতে হয়।

...আমাদের ভিতর জাতীয় ও সমাজিক পরিচ্ছন্নতা জ্ঞানের একান্ত

অভাব। আমরা স্নান করতে পটু হলেও যে কুঁয়া পুষ্করিণী অথবা নদীতে স্নান করি সেগুলিকে ময়লা করতে আমাদের বাধে না। জাতি চরিত্রের এই ত্রুটীকে আমি এক ভীষণ পাপ বলে মনে করি। এই পাপ আমাদের গ্রামগুলি ও পবিত্র নদীসমূহের পবিত্র তটভূমির লজ্জাজনক অবস্থার জন্ম দায়ী। অপরিচ্ছন্নতাপ্রসূত রোগসমূহের মূলেও এই কারণ বিদ্যমান।

গ্রামের পুষ্করিণী আর কুঁয়াগুলি পরিষ্কার করা ও পরিষ্কার রাখা এবং গ্রামের গোবর গাদা সাফ করা—এই হবে গ্রামসেবকের কাজ। কর্মী যদি নিজের হাতে একাজ করা শুরু করেন এবং বেতনভুক্ ঝাড়ুদারের মত নিয়মিতভাবে সাফাই-এর কাজ করতে থাকেন এবং সেই সঙ্গে গ্রামবাসীদের এই কথাও বুঝিয়ে দেন যে ভবিষ্যতে সাফাই-এর যাবতীয় কাজ নিজেরাই করে নেবার জন্য এখন থেকে তাঁদের গ্রামসেবকের সঙ্গে কাজে লেগে পড়া উচিত। তাহলে এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যেতে পারে যে আজ হক কাল হক গ্রামবাসীরা সেবকের সঙ্গে সহযোগিতা করবেই।

গ্রামের রাস্তা ও গলিগুলি থেকে সমস্ত রকমের আবর্জনা পরিষ্কার করে এই সব জঞ্জালের শ্রেণীবিভাগ করতে হবে। এর ভিতর এমন অনেক জিনিস পাওয়া যাবে, যাকে সারে পরিণত করা যায় এবং এমন অনেক জিনিস আছে যা মাটিতে পুঁতে ফেলা ছাড়া গত্যন্তর নেই। এক শ্রেণীর জঞ্জালকে আবার সরাসরি সম্পদে রূপান্তরিত করা চলে। কুড়িয়ে পাওয়া প্রত্যেকটি হাড়ের টুকরা অতীব মূল্যবান কাঁচামাল। এর থেকে প্রয়োজনীয় অনেক জিনিস তৈরী করা যায় অথবা একে গুঁড়িয়ে উৎকৃষ্ট সারে পরিণত করা চলে। ছেঁড়া ন্যাকড়া ও বাজে কাগজ দিয়ে ভাল কাগজ তৈরী হতে পারে।

বিষ্ঠা গ্রামের কৃষিক্ষেত্রের জন্য অতি মূল্যবান সারের কাজ করবে। বিষ্ঠাকে নিম্নবর্ণিত উপায়ে কাজে লাগানো যেতে পারে। মাটিতে বড় জোর এক ফুট গর্ত খুঁড়ে তরলিত বা শুষ্ক বিষ্ঠার সঙ্গে শুকনো মাটি মিশিয়ে সেই গর্ত বোঝাই করতে হবে।...এর জন্য দুটি পদ্ধতির শরণ নেওয়া যেতে পারে। স্থায়ী পায়খানা তৈরী করে সেখানে মাটি বা লোহার বালতি রাখা চলতে পারে এবং প্রত্যহ এই বালতির মল পূর্বোক্ত প্রকারে বিশেষভাবে প্রস্তুত মাটির গর্তে ঢেলে দেওয়া যায়। আর তা না হলে মাটিতেই ঐভাবে গর্ত খুঁড়ে সেখানে মলত্যাগ করা যেতে পারে।

মল চাপা দেবার জন্য গ্রামে সাধারণ জায়গা থাকতে পারে অথবা কৃষক তাঁর নিজস্ব কৃষিক্ষেত্রেও এ রকম গর্ত তৈরী করতে পারেন। তবে একমাত্র গ্রামবাসীদের সহায়তায় এ কাজ করা সম্ভব, আর নিতান্ত যদি এই সহযোগিতা লাভ সম্ভবপর না হয় তাহলে যে কোন উৎসাহী গ্রামবাসী স্বয়ং এইভাবে মল সংগ্রহ করে নিজের জন্য তাকে সম্পদে রূপান্তরিত করতে পারেন। বর্তমানে লক্ষ লক্ষ টাকা মূল্যের এই রকম উৎকৃষ্ট শ্রেণীর সার প্রত্যহ নষ্ট হচ্ছে এবং এইভাবে যত্রতত্র মলত্যাগ করার জন্য গ্রামের বায়ু দূষিত হচ্ছে ও নানা রকম রোগ ছড়াচ্ছে।

গ্রামের পুষ্করিণীগুলির জল স্নান করা, কাপড় কাচা, পান এবং রন্ধন—সব রকমের কাজের জন্যই নির্বিচারে ব্যবহার করা হয়। অনেক গ্রামের জলাশয়ে গবাদি পশুকেও স্নান করান হয়। অনেক সময় দেখা যায় যে মহিষের পাল পুকুরের জলে গা ডুবিয়ে বসে আছে। আশ্চর্যের কথা এই যে গ্রামের জলাশয়গুলির এই রকম অপব্যবহার হওয়া সত্ত্বেও এদেশের গ্রামগুলি এখনও মহামারীতে ধ্বংস হয়ে যায় নি। স্বাস্থ্যবিজ্ঞানী মাত্রেই একবাক্যে ঘোষণা করবেন যে গ্রামবাসীরা যে সব রোগে ভুগে থাকে তার অনেকগুলির কারণ হচ্ছে গ্রামে বিশুদ্ধ জল সরবরাহের ব্যাপারে ঔদাসীন্য।

॥ আটাশ ॥

যুবশক্তির প্রতি আহ্বান

দেশের যুবশক্তির উপরই আমার আশা। যুবকদের অনেকে পাপাসক্ত হলেও তারা স্বভাবপাপী নয়। অসহায়ভাবে পূর্বাপর চিন্তা না করে তারা এ পথে এসে পড়েছে। এতে যে তাদের এবং সমাজের কি হানি হচ্ছে তা তাদের উপলব্ধি করতে হবে, তাদের বুঝতে হবে যে কঠোর অনুশাসনময় জীবনযাত্রা ছাড়া আর কিছুই তাদের বা দেশের ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে পারে না।

সর্বোপরি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত এবং লোভ থেকে বাঁচার জন্য তাঁর সহায়তা যাচ্ঞা না করা পর্যন্ত নীরস অনুশাসন তাদের বিশেষ কিছু হিতসাধন করতে সমর্থ হবে না। বাহ্যিক কোন প্রকাশ ছাড়াই শিশু যেমন

মায়ের স্নেহ অনুভব করতে পারে, তেমনি তিনি আমাদের হৃদয়ে বিরাজমান, এই অনুভূতি আসাকেই ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করা বলা হয়।

যে সব নবযুবক···অনতিবিলম্বে পিতৃত্বের গৌরব লাভ করবে,···জাতির পক্ষে তারা হচ্ছে ঠিক লবণের মত। লবণ তার স্বাদ হারিয়ে ফেললে পরে লবণাক্ত করা হবে কি দিয়ে?

যুবশক্তি বিশ্বের সর্বত্রই চঞ্চল। সুতরাং পাঠদ্দশায় অর্থাৎ অন্তত পঁচিশ বৎসর পর্যন্ত বিশেষ চিন্তা না করেই ব্রহ্মচর্য পালন করা একান্ত প্রয়োজন।

নিষ্পাপ যৌবন এক অমূল্য সম্পদ এবং ক্ষণিকের উত্তেজনা বা আনন্দ মেটানোর জন্য এর অপব্যয় অনুচিত।

তোমাদের (নবযুবকদের) আমি গ্রামে যেতে অনুরোধ করছি, এবং প্রভু বা উদ্ধারকর্তা হিসাবে নয়, গ্রামবাসীর দীন সেবক হিসাবে, গ্রামের মধ্যে তোমাদের ডুবে থাকতে আবেদন জানাচ্ছি। কেমন ভাবে জীবনযাত্রা-প্রণালীর পরিবর্তন সাধন করতে হয়, তা তারা তোমাদের দৈনন্দিন কার্য-কলাপ এবং জীবনযাত্রাপ্রণালী দেখে শিখুক। যথোপযুক্ত নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থেকে বাষ্প যেমন এক মহাশক্তিতে পরিণত হয়, এবং নিয়ন্ত্রণে না রাখলে বাষ্পের যেমন নিজস্ব কোন মূল্য নেই, তেমনি গ্রামবাসীদের জন্য হৃদয়ে শুধু দরদ থাকাই যথেষ্ট নয়। ভারতের ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে প্রলেপ লেপন করার জন্য ঈশ্বরের দূত হয়ে তোমাদের আমি বেরিয়ে পড়তে অনুরোধ জানাচ্ছি।

তোমাদের যাবতীয় জ্ঞান শিক্ষাদীক্ষা ও পাণ্ডিত্যকে পাল্লার এক দিকে চাপাও এবং অপর দিকে রাখ সত্য ও পবিত্রতাকে। দেখতে পাবে দ্বিতীয় দিকের পাল্লা অনেকটা ঝুঁকে পড়েছে। নৈতিক অপবিত্রতার দূষিত বায়ু আজ স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের ভিতরও ছড়িয়ে পড়েছে এবং প্রচ্ছন্ন মহামারীর মত তাদের সর্বনাশ সাধন করছে। সুতরাং ছেলে-মেয়ের দল, তোমাদের দেহ ও মনকে পবিত্র রাখার জন্য আমি আবেদন করছি। তোমাদের সকল পাণ্ডিত্য, শাস্ত্ররাজির তাবৎ জ্ঞান ব্যর্থ যাবে যদি না তোমরা সেই সব শিক্ষাকে তোমাদের দৈনন্দিন জীবনে রূপায়িত কর।······চরিত্রবিহীন জ্ঞান এক শয়তানী শক্তি। পৃথিবীতে এই জাতীয় অনেক "প্রতিভাধর চোর" এবং "ভদ্র দুরাত্মার" উদাহরণ আছে।

...ছেলের দল, তোমাদের আমি বলতে চাই যে শেষ অবধি তোমাদের ভবিষ্যৎ তোমাদের নিজেদেরই হাতে। তোমরা যদি দুটি শর্ত পালন কর তাহলে তোমরা বিদ্যালয়ে কি শেখ বা না শেখ—তার জন্য আমি কোন চিন্তা করব না। একটি শর্ত হ'ল এই যে বিপত্তিকর যে কোন রকমের অবস্থার মধ্যেই পড়না কেন তোমাদের ভীতির সম্পর্ক রহিত সত্যবাদী হতে হবে। কোন সত্যাশ্রয়ী ও সাহসী বালক এমন কি কোন মাছিকেও আঘাত করার কথা কখনও চিন্তা করবে না। নিজ বিদ্যালয়ের সব কয়টি দুর্বল ছাত্রকে সে রক্ষা করবে এবং বিদ্যালয়ের ভিতরে বা বাইরে সহায়তাপ্রার্থী প্রত্যেককে সে সাহায্য করবে। যে ছেলে ব্যক্তিগত জীবনে দেহ মন ও কর্মের শুচিতার আচরণ করেনা সে যেকোন বিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত হবার যোগ্য। বীর ও সাহসী ছেলে সদা সর্বদা তার মনকে পবিত্র রাখবে, তার চোখের দৃষ্টি হবে ঋজু এবং হাত অপবিত্রতার স্পর্শ বিরহিত। জীবনের এই সব মৌলিক নীতি শেখার জন্য কোন বিদ্যালয়ে যাবার প্রয়োজন নেই। এই ত্রিবিধ চরিত্রগুণ যদি তোমাদের থাকে তাহলে এক দৃঢ় ভিত্তিভূমির উপর তোমাদের ভবিষ্যত গড়ে উঠবে।

আমরা এক গ্রামীণ সভ্যতার উত্তরাধিকারী। আমার মনে হয় আমাদের দেশের বিশালতা, জনসংখ্যার বিপুলতা, এদেশের ভৌগোলিক অবস্থান এবং জলবায়ু ইত্যাদি সবই এ দেশের গ্রামীণ সভ্যতার কারণ স্বরূপ। এ সভ্যতার ত্রুটীবিচ্যুতি সম্বন্ধেও আমাদের ভালভাবেই জানা আছে। তবে এ ত্রুটীগুলির মধ্যে একটিও এমন নয় যা চিকিৎসার অতীত। কোন রকম চরম পন্থার শরণ নিয়ে আমাদের দেশের জনসংখ্যাকে তেত্রিশ কোটি থেকে ত্রিশ লক্ষ অথবা এমন কি তিন কোটিতে পর্যবসিত না করা পর্যন্ত দেশের এই গ্রামীণ সভ্যতার মূলোৎপাটন করে এর পরিবর্তে নাগরিক সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করা সম্ভব নয়। সুতরাং বর্তমানের গ্রামীণ সভ্যতা বজায় রাখা হবে, তবে এর সর্বজনবিদিত দোষত্রুটীগুলির সংশোধন করতে হবে—এটা ধরে নিয়ে আমি বর্তমান অবস্থার প্রতিকারের পন্থা নির্দেশ করব। বর্তমান অবস্থার উন্নতি বিধান সম্ভব কেবল তখনই যখন যুবকেরা গ্রাম-জীবন গ্রহণ করবেন। এ করতে হলে যুবকদের নিজ জীবনযাত্রার পুনর্গঠন করতে হবে। স্কুল কলেজের ছুটির সময় তাঁরা আশে পাশের গ্রামে গিয়ে থাকবেন। যে সব যুবকের শিক্ষাকাল শেষ হয়েছে অথবা যাঁরা শিক্ষানিকেতনে যাচ্ছেন না তাঁরা কোন গ্রামে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপনের কথা চিন্তা করবেন।

কায়িক শ্রমের সঙ্গে অন্যায়ভাবে যে লজ্জার ভাব জড়িয়ে আছে তার প্রভাবমুক্ত হতে পারলে দেখা যাবে যে গড়পড়তা বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন ছেলে মেয়েদের জন্য দেশে যথেষ্ট কাজ পড়ে রয়েছে।

সৎভাবে যে জীবিকা অর্জন করতে চায় তার কাছে কোন কাজই হীন নয়। এর জন্য চাই কেবল ঈশ্বর প্রদত্ত হাত পা'কে কাজে লাগানর ইচ্ছা।

॥ উনত্রিশ ॥

পানাসক্তির অপকারিতা

আপনারা নিশ্চয় এই চটকদার যুক্তির দ্বারা প্রভাবিত হবেন না যে, জোর করে ভারতকে মিতপায়ী করা অনুচিত এবং সুরাসেবীদের সুরাপানের সুবিধা দেওয়া দরকার। দেশবাসীর পাপাচরণে রাষ্ট্র সহায়তা করতে পারে না। আমরা বারবনিতালয়সমূহ পরিচালনা করি না বা তার অনুমতিও দিই না। চোরের চৌর্যবৃত্তিকে আমরা আস্কারা দিই না। আমার মতে মদ্যপান চৌর্যবৃত্তি ও এমন কি বোধ হয় বেশ্যাবৃত্তির চেয়েও হানিকর। কখনও কখনও কি এই দুই-ই মদ্যপানাসক্তির ফলে সৃষ্ট হয় না?

সুরাসক্তিকে পাপাচরণের চেয়ে বরং একটি রোগই বলা যেতে পারে। এমন বহু লোককে আমি জানি, যাঁরা এই প্রলোভনকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হক বলে অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেছেন। তাঁদের অভিপ্রায় অনুযায়ী এই প্রলোভনকে দূরে সরিয়ে দিয়েও দেখা গেছে যে গোপনে তাঁরা মদ্যপান করছেন। তবে অবশ্য এ কথা আমি বলছি না যে প্রলোভনের কারণকে সরিয়ে দেওয়া অনুচিত। নিজের কাছ থেকেই যাতে রোগীরা আত্মরক্ষা করতে পারে, সে বিষয়ে তাদের সাহায্য করা দরকার।

শ্রমিকদের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করার ফলে আমি জানি যে পানাসক্ত শ্রমিকদের সংসারে মদের ফলে কি ভীষণ সর্বনাশই না হয়েছে। এও আমি জানি যে, সহজে না পাওয়া গেলে তাঁরা মদ্য স্পর্শই করতেন না। সমসাময়িক এমন বহু উদাহরণ আমাদের কাছে আছে যে, বহু ক্ষেত্রে মদ্যপায়ীরাই মাদক দ্রব্য নিষিদ্ধ করতে চেয়েছেন।

পানাসক্তি মানুষের আত্মার বিলোপ ঘটায় এবং তাকে এমন পশুতে

পরিণত করার চেষ্টা করে যে, স্ত্রী মাতা এবং ভগ্নীর পার্থক্যও বুঝতে অক্ষম। এমন অনেককে আমি দেখেছি যে, মদের নেশায় পড়ে তাঁরা এদের পার্থক্য ভুলে যান।

বহুক্ষেত্রে মদ্যপানের অপকারিতা নিঃসন্দেহেই ম্যালেরিয়া ইত্যাদি দ্বারা অনুষ্ঠিত অনিষ্টের চেয়েও ভয়ঙ্কর। ম্যালেরিয়া ইত্যাদি শুধু দেহেরই অনিষ্ট করে, আর পানাসক্তি দেহ মন দুই-এরই ধ্বংস-সাধন করে।

আমাদের মধ্যে সহস্র সহস্র সুরাসেবী থাকার চেয়ে ভারতকে বরং ভিক্ষুকে পরিণত করা আমি বাঞ্ছনীয় মনে করব। যদি প্রয়োজন হয়, সুরা বর্জন করার জন্য ভারত বরং অশিক্ষিত থাকুক তাও স্বীকার।

পানদোষের কবলে যে জাতি পড়েছে, ধ্বংস ছাড়া তাদের আর কোন গতি নেই। এই অভ্যাসের জন্য বহু রাজ্যের ধ্বংস হয়ে যাবার নজির ইতিহাসে বিদ্যমান। ভারতে আমরা দেখেছি যে, ঐ অভ্যাসের জন্য শ্রীকৃষ্ণের বংশের মত বিরাট বংশও ধ্বংস হয়ে গেল। রোমের পতনের একটি আংশিক কারণ হচ্ছে এই ভীষণ অপরাধ।

আমি যদি মাত্র এক ঘণ্টার জন্যও ভারতবর্ষের সর্বাধিনায়কের পদ পেতাম তাহলে সব চেয়ে প্রথমে আমি কোন ক্ষতিপূরণ না দিয়েই সব মদের দোকান বন্ধ করে দিতাম। এর সঙ্গে সঙ্গে কলকারখানার মালিকদের শ্রমিকদের জন্য মনুষ্যোচিত কাজের পরিবেশ সৃষ্টি করতে বাধ্য করতাম। শ্রমিকরা যাতে নির্দোষ পেয় ও সমপরিমাণ নির্দোষ আমোদ প্রমোদের সুযোগ পেতে পারে তার জন্য মালিকদের জলযোগ ও মনোরঞ্জন কেন্দ্র খুলতে বাধ্য করতাম।

ধূমপান

মদের মতন ধূমপানকে আমি আতঙ্কজনক জ্ঞান করি। আমার মতে ধূমপান এক পাপ। মানুষের বিবেককে এ জড় করে ফেলে। সময় সময় মদ্যপানের চেয়েও খারাপ এ, কারণ এর প্রভাব প্রচ্ছন্নভাবে কাজ করে। একবার কোন মানুষ এই অভ্যাসের কবলে পড়লে তার পক্ষে নিষ্কৃতি পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এ এক ব্যয়বহুল পাপ। এর ফলে শ্বাস প্রশ্বাস দুর্গন্ধময় হয়, দাঁতে রঙের ছোপ পড়ে এবং কখনও কখনও কর্কট রোগও হয়ে থাকে। এ এক নোংরা অভ্যাস।

ভারতবর্ষে ধূমপান নস্য ও মুখে খাবার জন্য (দোক্তা খৈনী) তামাক ব্যবহার করা হয়।…স্বাস্থ্যপ্রেমীরা (বা স্বাস্থ্যান্বেষীরা) যদি পূর্বোক্ত কোন অভ্যাসের দাস হয়ে থাকেন তাহলে প্রাণপণ চেষ্টা করে তার প্রভাবমুক্ত হবেন। কোন কোন লোক-এর একটি দুটি বা তিনটি দোষেরই শিকার। তাঁদের এই সব নেশার প্রতি কোন বিরূপতা আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু একটু ধীরভাবে চিন্তা করলেই বোঝা যাবে যে মুখ দিয়ে তামাকের ধোঁয়া বার করা, সমস্ত দিন মুখে পান দোক্তা ঠেসে রাখা এবং মুহুর্মুহু নস্যের কৌটা খুলে নস্য নেওয়ার মধ্যে বাহাদুরীর কিছু নেই। তিনটিই অত্যন্ত নোংরা অভ্যাস।

॥ ত্রিশ ॥

ইংরেজীর স্থান

আমার সুচিন্তিত অভিমত এই যে, যে ভাবে ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, তাতে ইংরেজীশিক্ষিত ভারতীয় সম্প্রদায় নির্বীর্য হয়ে পড়েছেন এবং ভারতীয় ছাত্রদের স্নায়ু-শক্তির উপর তার ফলে বিশেষ চাপ পড়েছে ও আমরা অনুকরণ-প্রিয় হয়ে পড়েছি। মাতৃভাষাকে স্থানচ্যুত করার পদ্ধতিকে ইংরেজদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের ইতিহাসের একটি দুঃখজনক অধ্যায় বলে বর্ণনা করা যেতে পারে। প্রথমেই যদি ইংরেজীতে চিন্তা করার এবং মুখ্যতঃ চিন্তাধারাকে ইংরেজীতে প্রকাশ করার বিপত্তির সম্মুখীন তাঁদের না হতে হ'ত তবে রাম-মোহন রায় আরও বড় সমাজ-সংস্কারক হতেন এবং লোকমান্য তিলকও হতেন আরও বড় পণ্ডিত। জনসাধারণের উপর তাঁদের প্রভাব অবশ্য বিস্ময়কর। তবে আর একটু কম অস্বাভাবিক অবস্থায় যদি তাঁরা মানুষ হতেন, তবে সে প্রভাব হত আরও বেশী। ইংরেজী সাহিত্যের সুসমৃদ্ধ রত্নভাণ্ডারের জ্ঞান দ্বারা নিঃসন্দেহেই তাঁরা উপকৃত হয়েছিলেন; কিন্তু নিজেদের মাতৃভাষা মারফৎ সে জ্ঞান তাঁদের আয়ত্তাধীন হতে পারত। একদল অনুবাদকের সৃষ্টি করে কোন জাতি গড়ে উঠতে পারে না। ভেবে দেখুন, বাইবেলের প্রামাণ্য অনুবাদ না থাকলে ইংরেজদের কি হত? আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে চৈতন্য কবীর নানক গুরুগোবিন্দ সিং শিবাজী এবং প্রতাপ ইত্যাদি রামমোহন রায় বা তিলকের

চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। আমি জানি যে কারও সঙ্গে কারও তুলনা করা অবাঞ্ছনীয়, নিজ নিজ ক্ষেত্রে সবাই মহান। তবে জনসাধারণের উপর রামমোহন বা তিলকের প্রভাবের কথা নিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে, সে যুগের ভাগ্যবানদের মত তাঁদের প্রভাব তত স্থায়ী বা সুদূরপ্রসারী নয়। অবশ্য তাঁদের যে সব বাধাবিপত্তি কাটিয়ে উঠতে হয়েছিল, তা নিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে তাঁরা প্রায় অসুরের মত ছিলেন এবং তাঁদের শিক্ষা গ্রহণ করার প্রথার দোষে তাঁদের যদি শতবিধ বাধার মধ্যে জড়িয়ে না পড়তে হত, তবে তাঁরা উভয়েই আরও সাফল্য অর্জন করতেন। ইংরেজী ভাষা জানা না থাকলে যে রাজা রামমোহন বা লোকমান্যের চিন্তাধারা ঐ রকম হত না, এ কথা মানতে আমি রাজী নই। স্বাধীনতার ভাবধারা মনের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করানোর জন্য এবং চিন্তাধারার যথার্থতার জন্য যে ইংরেজীর জ্ঞান অপরিহার্য, এই কুসংস্কার ভারতে প্রচলিত যাবতীয় কুসংস্কারের অন্যতম। এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে দেশে একটি মাত্র শিক্ষাপ্রথা ছিল এবং একটি মাত্র ভাবের অভিব্যক্তির মাধ্যমকে জোর করে দেশের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাই আজকালকার বিদ্যালয় বা কলেজের শিক্ষা না পেলে আমরা যে কি হতাম, তা প্রমাণ করার মত তথ্য আমাদের কাছে নেই। তবে এ কথাও আমরা জানি যে পঞ্চাশ বছর আগেকার তুলনায় ভারতবর্ষ আজ দরিদ্র, আত্মরক্ষার শক্তি আজ তার কম এবং তার সন্তানসন্ততির জীবনীশক্তিও আগের চেয়ে কমে গেছে। শাসনব্যবস্থার গলদের জন্যই যে এই অবস্থা হয়েছে, এ কথা আমাকে বলা নিষ্প্রয়োজন। শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটিই এর প্রধানতম কারণ। ভুলের মধ্যেই এর সূত্রপাত এবং সৃষ্টি, কারণ ইংরেজ শাসকেরা ভারতীয় শিক্ষাপদ্ধতিকে সত্য সত্যই অকার্যকরী ভাবতেন। পাপের মধ্যেই একে লালন পালন করা হয়েছে, কারণ এর উদ্দেশ্যই ছিল ভারতের দেহ মন এবং আত্মাকে খর্ব করা।

ব্যবসায়িক এবং তথাকথিত রাজনৈতিক প্রয়োজনের খাতিরে আজ ইংরেজী পড়া হয়। ছেলেরা ভাবে (অবশ্য এর সঙ্গত কারণ আছে) যে ইংরেজী ছাড়া তারা সরকারী চাকরী পাবে না। মেয়েদের ইংরেজী শেখান হয় বিয়ের ছাড়পত্র পাবার জন্য। এমন কয়েকটি উদাহরণ আমি জানি যেখানে ইংরেজদের সঙ্গে ইংরেজীতে কথা বলতে পারবে বলে মেয়েরা ইংরেজী শিখতে

অভিলাষী। নিজের এবং স্বীয় বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে স্ত্রী ইংরেজীতে কথা বলতে পারে না বলে মনঃক্ষুণ্ণ অনেক স্বামীকে আমি জানি। এমন অনেক পরিবারের কথা আমি জানি যেখানে ইংরেজীকে মাতৃভাষা করার প্রচেষ্টা চলেছে। শত শত যুবকের বিশ্বাস যে ইংরেজীর জ্ঞান ছাড়া ভারতের মুক্তি এক রকম অসম্ভব। সমাজে এমনভাবে ঘুণ ধরেছে যে বহুস্থলে ইংরেজীতে জ্ঞান থাকাই হচ্ছে শিক্ষার একমাত্র অর্থ। আমার কাছে এ সবই হীনতা এবং দাসত্বের লক্ষণ। প্রাদেশিক ভাষাগুলিকে যে ভাবে ধ্বংস করা হচ্ছে এবং শুকিয়ে মেরে ফেলা হচ্ছে তা আমার কাছে অসহ্য। নিজের মাতৃভাষায় নয়, ইংরেজীতে পিতা পুত্রকে এবং স্বামী তার স্ত্রীকে চিঠি লিখবেন, একথা আমি বরদাস্ত করতে পারি না।…নিজের ঘরের চতুর্দিকে দেওয়াল তুলে দিয়ে আমি জানলাগুলি বন্ধ করে দিতে চাই না। সমস্ত দেশের সংস্কৃতি যতদূর সম্ভব বিনা বাধায় আমার ঘরের চারিদিকে সঞ্চালিত হোক তাই আমি চাই। তবে কেউ যে নিজের পায়ের নীচের মাটি থেকে আমায় উৎখাত করবে, তাতে আমি রাজী নই। অবাঞ্ছিত অতিথি, ভিক্ষুক বা কৃতদাস হয়ে আমি অন্যের ঘরে থাকতে রাজী নই। বৃথা গর্ব করার জন্য বা অনিশ্চিত সামাজিক সুবিধা পাবার জন্য আমার ভগ্নীদের উপর ইংরেজী শেখবার জন্য অহেতুক চাপ দিতে আমি গররাজী। সাহিত্যিক রুচিসম্পন্ন আমাদের যুবক যুবতীরা যত খুশী ইংরেজী বা বিশ্বের অন্যান্য ভাষা শিখতে পারেন এবং তার পর একজন বসু, রায় বা ঠাকুরের মত তাঁদের জ্ঞানের দ্বারা ভারতকে সমৃদ্ধিশালী করতে পারেন। তবে একজন ভারতবাসীকেও আমি তার মাতৃভাষাকে ভুলতে অবহেলা করতে বা তার জন্য লজ্জা অনুভব করতে দেব না। আর কেউ যে তার নিজের মাতৃভাষায় শ্রেষ্ঠ চিন্তাধারাসমূহ প্রকাশ করতে অসমর্থ—এ কথাও আমি তাদের অনুভব করতে দেব না। কারাগারের ধর্ম আমার আদর্শ নয়। ঈশ্বরের ক্ষুদ্রতম সৃষ্টিটিরও স্থান এখানে আছে। তবে এ হচ্ছে রূঢ়তা এবং জাতিগত ধর্মগত ও বর্ণগত গর্বের বিরুদ্ধে দুর্ভেদ্য বর্মস্বরূপ।

দেশের যুবসম্প্রদায়ের উপর এই সর্বনাশা বিদেশী মাধ্যম চাপিয়ে দেওয়া বিদেশী শাসনের বহুবিধ অন্যায়ের মধ্যে অন্যতম প্রধান অন্যায় বলে ইতিহাসে পরিগণিত হবে। জাতির উদ্যম এতে ধ্বংস হয়েছে এবং ছাত্রদের আয়ু হয়েছে এর ফলে সংক্ষিপ্ত। এর ফলে তারা হয়ে পড়েছে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন

এবং শিক্ষা হয়েছে অহেতুক ব্যয়বহুল। এই পদ্ধতির উপর এখনও যদি জোর দেওয়া হয় তবে আশঙ্কা হয় যে জাতির আত্মাকে এ ধ্বংস করবে। তাই যতশীঘ্র শিক্ষিত ভারত বিদেশী মাধ্যমরূপ এই মায়াজাল থেকে মুক্ত হয়, জনসাধারণ এবং তাঁদের নিজেদেরও ততই মঙ্গল।

॥ একত্রিশ ॥

নয়ীতালিম

এই বুভুক্ষু জনসাধারণের দেশে আমার মতে বুদ্ধির সঙ্গে খাটতে শেখানই হচ্ছে একমাত্র প্রাথমিক এবং প্রাপ্তবয়স্কের শিক্ষা।...দৃশ্যতঃ যে প্রকৃতিদত্ত জিনিসটির জন্য মানুষ এবং পশুর পার্থক্য বোঝা যায়, সে হচ্ছে মানুষের হাত এবং কেতাবী শিক্ষার উচিত হচ্ছে এই হাতের শিক্ষারই পদাঙ্ক অনুসরণ করা। লিখতে পড়তে না জানলে যে মানুষের পূর্ণতম বিকাশ সম্ভব নয়, এ এক কুসংস্কার মাত্র। সে জ্ঞান অবশ্যই জীবনের সম্পদের বৃদ্ধি করে, তবে মানুষের নৈতিক শারীরিক বা আধিভৌতিক উন্নতির জন্য একে কোনমতেই অপরিহার্য বলা যেতে পারে না।

বনিয়াদী শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে হাতের কাজ দ্বারা শিশুর শারীরিক মানসিক এবং নৈতিক উন্নতি সাধন করা। তবে আমার ধারণা হচ্ছে এই যে, যে কোন পরিকল্পনা যদি শিক্ষার দিক থেকে সুষ্ঠু এবং সুনিয়ন্ত্রিত হয় তবে তার আর্থিক বনিয়াদও পোক্ত হতে বাধ্য। একটি উদাহরণ দিই। আমরা শিশুদের ক্ষণভঙ্গুর মাটির খেলনা তৈরী করতে শেখাতে পারি। এতেও তাদের মানসিক বৃত্তির উৎকর্ষ সাধিত হবে।• তবে মানুষের শ্রম বা কাঁচামালের যে অপচয় করা উচিত নয় বা এগুলিকে যে বিফলে যেতে দেওয়া সঙ্গত নয়, এই গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক তথ্যকে এতে অবহেলা করা হবে। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত যে প্রত্যেকের প্রয়োজনে লাগানো উচিত, এই নীতির প্রতি জোর দেওয়াই হচ্ছে নাগরিকতার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা এবং এর ফলে স্বভাবতই বনিয়াদী শিক্ষা স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে ওঠে।

বুদ্ধিবৃত্তির খাঁটি বিকাশ যে হাত পা চোখ কান নাক ইত্যাদি দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহের শিক্ষা এবং সঞ্চালন দ্বারাই হতে পারে—এই আমার ধারণা।

অর্থাৎ শিশুর বুদ্ধিবৃত্তির শ্রেষ্ঠ এবং দ্রুততম বিকাশের উপায় হচ্ছে তার দৈহিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহকে বুদ্ধি খাটিয়ে কাজে লাগানো। চিত্তবৃত্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যদি শরীর ও মনের যুগপৎ উন্নতি সাধিত না হয়, তবে শুধু মনের বিকাশ এক অকিঞ্চিৎকর একতরফা ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। আমার কাছে অন্তরের বিকাশই আধ্যাত্মিক শিক্ষা। সুতরাং শিশুর দৈহিক এবং আধ্যাত্মিক প্রতিভার সঙ্গে যখন যুগপৎ তার মনেরও শিক্ষা হয়, তখনই তার মনের সর্বাঙ্গীণ এবং সুষ্ঠু বিকাশ সম্ভব। সম্মিলিতভাবে এগুলি এক অদৃশ্য অথচ অবিচ্ছেদ্য সত্তা। এগুলি যে এককভাবে বা পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক না রেখেই বিকশিত হতে পারে, এ ধারণা পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিতান্ত ভ্রমাত্মক।

শরীর মন এবং আত্মার বিভিন্ন বৃত্তিগুলির সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সমন্বয় না থাকার বিষময় ফল আজ সুস্পষ্ট। এর সব কয়টিই আমাদের মধ্যে আছে, শুধু আমাদের উন্মার্গগামী পরিবেশের জন্য এদের অস্তিত্বের কথা আমরা বিস্মৃত হয়েছি।

শুধু বুদ্ধিবৃত্তি বা বিরাট দেহটি কিংবা হৃদয় বা আত্মাই মানুষের একমাত্র পরিচয় নয়। গোটা মানুষটি সৃষ্টি করতে হলে এই তিনটি বৃত্তির যথোপযুক্ত ও সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন করা প্রয়োজন এবং এইভাবেই শিক্ষার খাঁটি অর্থনীতি রচনা করা সম্ভব।

শারীরিক শ্রমই হবে সমগ্র বিষয়টির মূল কেন্দ্র। শারীরিক শ্রমের শিক্ষা দ্বারা বিদ্যালয়ের সংগ্রহশালা সাজানর উপযোগী দ্রব্যরাজী বা অপ্রয়োজনীয় খেলনা ইত্যাদি বানানো হবে না। এমন জিনিস তৈরী করতে হবে, বাজারে যা চলে। পুরাতন কালের কারখানার চাবুকের ভয়ে ভীত শিশুদের মত তারা এ কাজ করবে না। এতে আনন্দ পাবে এবং বুদ্ধিবৃত্তি প্রোৎসাহিত হবে বলেই এ কাজ তারা করবে।

ভারতে অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া উচিত, এই নীতিতে আমি দৃঢ় বিশ্বাসী। সঙ্গে সঙ্গে আমার এও বিশ্বাস যে শিশুদের কোন প্রয়োজনীয় কাজ শিখিয়ে সেইটিকে তাদের মানসিক শারীরিক এবং আধ্যাত্মিক প্রতিভার বিকাশের জন্য প্রয়োগ করে আমরা এই নীতিকে বাস্তবে রূপায়িত করতে পারি। এতে আমাদের গ্রামগুলির ক্রমবর্ধমান ক্ষয়ের গতি রুদ্ধ হবে। এর ফলে অধিকতর ন্যায়সঙ্গত এমন এক সমাজব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপিত হবে, যেখানে "স্বত্ববান" এবং "নিঃস্বদের"

ভিতর বর্তমানের মত কোন কৃত্রিম পার্থক্য থাকবে না এবং প্রত্যেকেরই জীবনধারণোপযোগী জীবিকা এবং স্বাধীনতা পাবার অধিকার থাকবে।

গ্রাম্য কুটিরশিল্প যথা সূতা কাটা তূলা ধুনাই করা ইত্যাদি মারফৎ প্রাথমিক শিক্ষা দেবার আমি যে পরিকল্পনা করেছি, তাকে সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ এক নিঃশব্দ সামাজিক বিপ্লবের অগ্রদূত বলে মনে করা যেতে পারে। এর ফলে গ্রাম ও নগরের মধ্যে এক সাবলীল নৈতিক সম্বন্ধ স্থাপিত হবে আর আধুনিক সমাজের বিপৎসঙ্কুল অবস্থা এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিরাজিত বিষাক্ত সম্পর্ক দূর করার পথে বহুল পরিমাণে এ সাফল্য অর্জন করবে।

এবার আমরা বনিয়াদী শিক্ষার মূল নীতিগুলির প্রতি এক নজরে দেখব :

১। যথার্থ শিক্ষা হতে হলে সব রকমের শিক্ষা স্বাবলম্বী হবে। অর্থাৎ শেষ পর্যায়ে পুঁজি ছাড়া শিক্ষাবাবদ ব্যয়িত অন্যান্য অর্থ উপার্জন করতে হবে।

২। বনিয়াদী শিক্ষায় শেষ অবধি হাতের কলা-কুশলতাকে কাজে লাগাতে হবে। অর্থাৎ দিনের একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ছাত্র নিজের হাতে কোন না কোন কাজ দক্ষতা সহকারে করবে।

৩। সকল পর্যায়ে প্রাদেশিক ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হবে।

৪। এখানে সম্প্রদায়গত ধর্মশিক্ষার কোন স্থান নেই। মৌল বিশ্বজনীন নীতিশাস্ত্রকে প্রোৎসাহিত করা হবে।

৫। শিশু বা বয়স্ক, পুরুষ বা নারী—যাদেরই এই শিক্ষা দেওয়া হক না কেন তাদের সঙ্গে সঙ্গে তাদের বাড়ীতেও এর অনুপ্রবেশ ঘটবে।

৬। এই শিক্ষা গ্রহণকারী লক্ষ লক্ষ ছাত্র নিজেদের সমগ্র ভারতের মনে করবে বলে তারা একটি আন্তর্প্রাদেশিক ভাষাও শিখবে। আর এই সর্বসামান্য ভাষা নাগরী অথবা উর্দু লিপিতে লিখিত হিন্দুস্থানী হতে পারে। সুতরাং ছাত্রদের দুটি লিপিই শিক্ষা করতে হবে।

॥ বত্রিশ ॥

ভাষা সমস্যা সম্বন্ধে

আমাদের একটি সাধারণ ভাষারও প্রয়োজন। এ ভাষা কিন্তু বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষাকে চেপে মারবে না। প্রাদেশিক ভাষাগুলি থাকবেই, তা

ছাড়া একটি সাধারণ ভাষাও থাকবে। মোটামুটি সবাই মেনে নিয়েছেন যে হিন্দুস্থানী হবে সেই ভাষা। হিন্দুস্থানী হল হিন্দি ও উর্দু-এর সম্মিলিত রূপ। এ ভাষা খুব সংস্কৃত ঘেঁষা অথবা ফার্সী আরবী ঘেঁষা হবে না। এ পথের সব চেয়ে বড় বাধা হল আমাদের প্রাদেশিক ভাষাসমূহের বিভিন্ন লিপি।

বহুসংখ্যক লিপি একাধিক কারণে বাধক স্বরূপ। জ্ঞানার্জনের পথে এ এক প্রচণ্ড বাধা। আর্য ভাষাগোষ্ঠীর ভিতর পারস্পরিক মিল এত বেশী যে বিভিন্ন লিপি শেখার জন্য যদি এতটা সময় নষ্ট করতে না হত তাহলে বিশেষ পরিশ্রম ছাড়াই আমরা একাধিক ভাষা শিখতে পারতাম। উদাহরণ স্বরূপ সংস্কৃত সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞানসম্পন্ন অধিকাংশ ব্যক্তির পক্ষেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অতুলনীয় সাহিত্যকীর্তির রসাস্বাদন করতে অসুবিধা হত না যদি অবশ্য দেবনাগরী লিপিতে তা ছাপা হত। কিন্তু অবাঙালীদের কাছে বাঙলা হরফ "তফাত যাও"—এর বিজ্ঞপ্তি। অনুরূপভাবে দেবনাগরী লিপির সঙ্গে পরিচয় থাকলে বাঙালীদের পক্ষে তুলসীদাস ও অন্যান্য হিন্দুস্থানী সাহিত্যিক-দের আধ্যাত্মিক রসে ওতপ্রোত সাহিত্যের সৌন্দর্য উপভোগ করা সম্ভব হত। ···সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য একটি সাধারণ লিপি অবশ্য এখনও বহু দূরের কথা। তবে আমরা যদি শুধু আমাদের প্রাদেশিকতার মনোভাব বর্জন করি তাহলে দক্ষিণী রূপ সহ ইন্দো-সংস্কৃত ভাষাগোষ্ঠীর জন্য একটি সাধারণ লিপি প্রবর্তন করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলব যে কোন গুজরাতীর পক্ষে গুজরাতী লিপি আঁকড়ে থাকার কোন অর্থ নেই। অখিল ভারতীয় স্বাদেশীকতার স্রোতকে পুষ্ট করলে প্রাদেশিক স্বাদেশীকতা ভাল, যেমন অখিল ভারতীয় স্বাদেশীকতা ততটা ভাল যতটা এ আরও বৃহত্তর লক্ষ্য অর্থাৎ বিশ্বপ্রেমের পরিপুষ্টি সাধন করে। কিন্তু যে প্রাদেশিক স্বাদেশীকতা বলে যে, "ভারতবর্ষ কিছু নয়, গুজরাতই সব" তা পাপাচার ছাড়া আর কিছু নয়।···দেবনাগরীই যে এই সাধারণ লিপি হবে সে সম্বন্ধে বিস্তারিত যুক্তিজাল বিস্তার করার প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয় না। ভারতবর্ষের অধিকাংশ এলাকায় এটা চলে—এই এর সপক্ষে সবচেয়ে বড় কথা।··আমার বিনম্র অভিমত হল এই যে যাবতীয় অবিকশিত ও অলিখিত মৌখিক ভাষাকে হিন্দুস্থানীর স্রোতে আত্মবিসর্জন করা উচিত। এ আত্মবিসর্জন আত্মহত্যা নয়, এক মহত্তর অস্তিত্বের নিদর্শন।

এবার দেখা যাক ইংরেজী আমাদের রাষ্ট্রভাষা হতে পারে কি না।

ভারতের অনেক পণ্ডিত ও স্বদেশপ্রেমী ব্যক্তি মনে করেন যে এ প্রশ্ন উত্থাপন করা অজ্ঞতার পরিচায়ক। তাঁদের মতে পূর্ব থেকেই ইংরেজী এ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত।

উপর উপর দেখলে এই অভিমতকে সত্য বলে মনে হবে। আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দিকে তাকালে মনে হতে পারে যে ইংরেজী না থাকলে দেশের সব কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যাবে। তবে গভীরভাবে বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে ইংরেজী আমাদের রাষ্ট্রভাষা হতে পারে না, হওয়া উচিত্ও নয়।

রাষ্ট্রভাষার কি কি যোগ্যতা থাকা উচিত এবার তা বিবেচনা করা যাক :

১। সরকারী কর্মচারীরা সহজে এ ভাষা শিখতে পারবেন।

২। ভারতবর্ষের সর্বত্র ধর্মীয় আর্থিক এবং রাজনৈতিক আদান প্রদানের মাধ্যম হবার ক্ষমতা থাকবে এই ভাষার।

৩। ভারতবর্ষের অধিকাংশ মানুষ এ ভাষায় কথা বলবেন।

৪। সমগ্র দেশের পক্ষে এটা সহজ হবে।

৫। রাষ্ট্রভাষা নির্বাচনের সময় সাময়িক স্বার্থ বা সুবিধার কথা ভাবলে চলবে না।

ইংরেজী এর কোন শর্তই পূর্ণ করতে সক্ষম নয়।

প্রথম বক্তব্যটি শেষকালে বলা উচিত ছিল ; কিন্তু ইচ্ছা করেই আমি এটিকে প্রথম স্থান দিয়েছি। কারণ আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে ইংরেজী বুঝি এই শর্তটি পূর্ণ করে। অবশ্য খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যাবে যে এমন কি আজকের অবস্থাতেও সরকারী কর্মচারীদের এই ভাষা শেখা বা এতে কাজ-কর্ম চালান সহজসাধ্য নয়।…আজও অধিকাংশ সরকারী চাকুরীয়া ভারতীয় এবং ক্রমশঃ এদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকবে।…তাদের পক্ষে অপর যে কোন ভাষার চেয়ে ইংরেজী কঠিন।

দ্বিতীয় প্রয়োজনীয়তা অর্থাৎ ইংরেজীর মাধ্যমে ধর্মীয় আদান প্রদান ততদিন পর্যন্ত অসম্ভব থেকে যাবে যত দিন না দেশের সমস্ত লোক ইংরেজীতে কথাবার্তা বলা শুরু করে। জনসাধারণের ভিতর এই পরিমাণ ইংরেজীর প্রসারের কথা চিন্তা করা এক অসম্ভব ব্যাপার।

তৃতীয় শর্তটিও ইংরেজী পূর্ণ করতে অপারগ, কারণ ভারতবর্ষের অধিকাংশ মানুষ এ ভাষায় কথা বলেন না।

ভারতবর্ষের সমস্ত জনসাধারণের পক্ষে এ ভাষা শেখা সহজ নয় বলে চতুর্থ শর্তটিও খাটে না।

পঞ্চম শর্তটি বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে ইংরেজীর বর্তমানে যে মর্যাদা তা সাময়িক। আসল কথা হল এই যে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপে ইংরেজীর স্থান যদি বা থাকে, তা হবে একান্ত অকিঞ্চিৎকর। রাজকার্যে এর প্রয়োজন পড়বে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্য এ ভাষার প্রয়োজন পড়বে। তবে সে এক ভিন্ন বিষয়। অতটুকু ইংরেজী রাখা প্রয়োজন হতে পারে। আমরা ইংরেজীকে ঘৃণা করি না। আমরা কেবল এইটুকু চাই যে ইংরেজীকে তার সীমার বাইরে যেতে দেওয়া চলবে না।...কিন্তু তাই বলে ইংরেজী ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষা হতে পারে না।

তাহলে কোন্ ভাষা পূর্বোক্ত পঞ্চবিধ শর্ত পরিপূরণে সক্ষম? আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে এ যোগ্যতা আছে হিন্দির।

আর কোন ভাষাই ঐ পাঁচটি শর্ত পূর্ণ করার ব্যাপারে হিন্দির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে না। হিন্দির পর বাঙলার স্থান। তবে বাঙলার বাইরে বাঙালীরা নিজেরাই হিন্দি ব্যবহার করেন। কিন্তু হিন্দিভাষী যেখানেই যান না কেন তিনি হিন্দিতেই কথা বলেন এবং এতে কেউ আশ্চর্যও হন না। হিন্দিভাষী হিন্দু ধর্মপ্রচারক ও উর্দুভাষী মৌলভীরা ভারতবর্ষের সর্বত্র হিন্দি ও উর্দুতে ধর্মসম্বন্ধীয় বক্তৃতা দেন এবং এমন কি নিরক্ষর জনসাধারণও তাঁদের সেই সব বক্তৃতা বুঝতে পারেন। একেবারে নিরক্ষর কোন গুজরাতী উত্তর ভারতে গেলে কাজ চালাবার মত দুই একটি হিন্দি শব্দ বলার চেষ্টা করেন। কিন্তু বোম্বের কোন গুজরাতী শেঠের "ভাইয়া" (বিহার ও উত্তরপ্রদেশের লোক—অনুঃ) দরোয়ান শেঠের সঙ্গে গুজরাতীতে কথা বলে না। তার মালিক শেঠই বরং ভাঙ্গাচোরা হিন্দিতে তার সঙ্গে কথা বলেন। আমি এমন কি দাক্ষিণাত্যের সুদূর এলাকাতেও হিন্দি বলতে শুনেছি। এ কথা সত্য নয় যে মাদ্রাজে ইংরেজী না জানলে চলে না। আমার সব কাজকর্মে আমি ঐ সব এলাকায় সাফল্য সহকারে হিন্দি ব্যবহার করেছি। রেলগাড়ীতে দেখেছি যে মাদ্রাজী যাত্রী অন্যের সঙ্গে হিন্দিতে কথাবার্তা বলেন। এ ছাড়া মাদ্রাজের মুসলমানেরা কাজ চালাবার মত যথেষ্ট হিন্দি জানেন। এর উপর আমাদের স্মরণ রাখতে হবে

যে ভারতবর্ষের সর্বত্র মুসলমানেরা উর্দুতে কথাবার্তা বলেন এবং প্রত্যেক প্রদেশেই যথেষ্ট সংখ্যক মুসলমান রয়েছেন।

সুতরাং হিন্দি ইতিপূর্বেই নিজেকে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। বহুদিন যাবৎ হিন্দিকে আমরা এই ভাবে ব্যবহার করে আসছি। উর্দুর সৃষ্টিও এই কারণে।

মুসলমান সম্রাটগণ ফার্সী অথবা আরবীকে রাষ্ট্রভাষা করতে পারেন নি। তাঁরা হিন্দি ব্যাকরণকে স্বীকার করে নিয়ে কথা বলার সময় কেবল অধিকতর সংখ্যক ফার্সী শব্দ এবং লেখার সময় উর্দু লিপি ব্যবহার করতেন। কিন্তু কোন বিদেশী ভাষার মাধ্যমে জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা তাঁদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। ইংরেজ শাসকগণের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটল। সেনাবাহিনীর সিপাহীদের সঙ্গে ইংরেজরা কিভাবে কাজকর্ম চালান এ সম্বন্ধে যাঁদের ধারণা আছে তাঁরা জানেন যে এর জন্য তাঁরা নূতন নূতন হিন্দি ও উর্দু শব্দ সৃষ্টি করেছেন।

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একমাত্র হিন্দিই রাষ্ট্রভাষা হতে পারে। একথা অবশ্য সত্য যে এতে মাদ্রাজের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কিছুটা অসুবিধা হবে। কিন্তু মারাঠী গুজরাতী সিন্ধী ও বাঙালীদের কাছে হিন্দি খুবই সহজ হবার কথা। রাষ্ট্রীয় কাজকর্মে ব্যবহারের জন্য যথেষ্ট হিন্দির জ্ঞান তাঁরা কয়েক মাসের ভিতরই অর্জন করে নিতে পারেন। তামিলদের পক্ষে অবশ্য হিন্দি শেখা এত সহজ হবে না।

তবে এ অসুবিধা কেবল আজকালকার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাঁদের দেশপ্রেমিকতা বৃত্তির কাছে আবেদন করার অধিকার আমাদের আছে এবং আমরা আশা করব যে হিন্দি শেখার জন্য তাঁরা বিশেষ চেষ্টা করেন।

॥ তেত্রিশ ॥

প্রাদেশিক ভাষাসমূহ

মাতৃভাষার পরিবর্তে ইংরাজীর প্রতি অনুরাগ আমাদের দেশের শিক্ষিত ও রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন শ্রেণীর সঙ্গে দেশের সাধারণ লোকের একটা

বিরাট পার্থক্য সৃষ্টি করেছে। ভারতবর্ষের ভাষাগুলি দরিদ্র হয়ে পড়েছে। গভীর ভাবসমূহ মাতৃভাষায় ব্যক্ত করার ব্যর্থ প্রয়াস করার ফলে আমরা হাঁকপাঁক করি। বৈজ্ঞানিক শব্দসমূহের পরিভাষা নেই। এর পরিণাম মারাত্মক হয়েছে। আধুনিক মানসিকতার সঙ্গে জনসাধারণের সংযোগ নেই। ভারতবর্ষের মহান ভাষাসমূহের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করার জন্য দেশের যে অকল্যাণ হল তা আমরা যথাযথ ভাবে পরিমাপ করতে অক্ষম। কারণ আমরা বড় বেশী আমাদের কালের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। একথা বোঝা খুবই সহজ যে এই দুষ্কৃতির অবসান না ঘটান পর্যন্ত জনসাধারণের মানস বন্দীই থেকে যাবে।

শত দোষত্রুটি থাকলেও আমি যেমন আমার মায়ের বক্ষলগ্ন হয়ে থাকতে চাই তেমনি আমি আমার মাতৃভাষাকেও আঁকড়ে থাকব। মাতৃভাষাই একমাত্র আমাকে জীবনদায়ী সুধা পান করাতে পারে। ইংরাজী ভাষা নিজের স্থানে থাকলে তাকে আমি ভালবাসি। তবে নিজের গণ্ডি অতিক্রম করে মাতৃভাষার এলাকায় অনধিকার প্রবেশ করলে আমি এর তীব্র বিরোধী। নিঃসন্দেহে ইংরাজী আজ বিশ্বভাষা। সুতরাং স্কুলে নয়, কলেজ পর্যায়ে আমি একে দ্বিতীয় ঐচ্ছিক ভাষার স্থান দেব। এ ভাষা পড়বে বাছাই করা কিছু সংখ্যক ছাত্র—সমগ্র ছাত্রসমাজ নয়। আজ যখন আমাদের দেশে অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের সঙ্গতি নেই তখন ইংরাজী শেখাবার ব্যবস্থা করার কথা বলা নিরর্থক। ইংরাজীর সাহায্য না নিয়েই রাশিয়ার বৈজ্ঞানিক প্রগতি হয়েছে। আমাদের মানসিক দাসত্বের কারণই কেবল আমরা মনে করি যে ইংরাজী ছাড়া আমাদের চলবে না। এজাতীয় পরাজিতের মনোবৃত্তির সঙ্গে আমি কখনও সহমত হতে পারি না।

সরকার এবং তাঁদের সচিবালয়গুলি যত্নবান না হলে ইংরাজী অন্যায় ভাবে হিন্দুস্থানীর স্থান জবর দখল করে নিতে পারে। ভারতবর্ষের কোটি কোটি জনসাধারণের কাছে এ হবে পরম অকল্যাণকর। তারা কোন দিনই ইংরাজী বুঝতে পারবে না। প্রাদেশিক সরকার অবশ্যই খুব সহজে এমন কর্মচারী রাখতে পারেন যাঁরা প্রাদেশীক ভাষায় সেই প্রদেশের সরকারী কাজ কর্ম চালাবেন এবং ভিন্ন প্রদেশের সঙ্গে কাজ কর্ম চালাবেন আন্তঃপ্রাদেশিক ভাষায়। আমার মতে নাগরী অথবা উর্দু লিপিতে লিখিত হিন্দুস্থানীই কেবল এই আন্তঃপ্রাদেশিক ভাষা হতে পারে।

এই বাঞ্ছনীয় পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিতে একটি দিন দেরী করার অর্থ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে জাতির সেই পরিমাণ ক্ষতি সাধন করা। এর জন্য সর্বাগ্রে ভারতবর্ষের সম্পন্ন প্রাদেশিক ভাষাগুলির পুনরুজ্জীবন করতে হবে। আমাদের আদালত বিদ্যালয় এবং এমন কি সচিবালয় সমূহে এই পরিবর্তন সাধন করতে কয়েক বছর লেগে যাবে—এই কথা বলা মানসিক জড়তা ছাড়া আর কিছু নয়।…প্রথম পদক্ষেপ্ অর্থাৎ সরকারী কাজকর্মের সর্বস্তরে যদি অবিলম্বে প্রাদেশিক ভাষা প্রবর্তন করা যায় তাহলে আন্তঃপ্রাদেশিক ভাষা প্রচলনও ত্বরান্বিত হয়ে যাবে। প্রাদেশিক সরকারগুলিকে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কাজ কর্ম করতে হবে। যে ভাষা কোন দল বা গোষ্ঠীকে অসন্তুষ্ট না করে সমগ্র ভারতের সাধারণ ভাষা হতে পারে, নেহাত আলস্যের জন্য মুষ্টিমেয় ভারতবাসী সেই ভাষা শিখছেন না বলে জাতির সাংস্কৃতিক ক্ষতি হচ্ছে—এই কথা কেন্দ্রীয় সরকার সহজে উপলব্ধি করলে প্রাদেশিক সরকারগুলি আর ইংরাজীর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন না। আমার বক্তব্য হল যেমন ইংরেজ জবরদখলকারীদের রাজনৈতিক শাসন আমরা অপসারিত করেছি ইংরাজীর সাংস্কৃতিক জবরদখলকেও তেমনি নির্বাসন দিতে হবে। তবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও কূটনীতির ভাষা হিসাবে সুসমৃদ্ধ ইংরাজী ভাষার স্বাভাবিক স্থান চিরকাল বজায় থাকবে।

সংস্কৃতের স্থান

আমার মতে ধর্মীয় ব্যাপারে সংস্কৃতকে কখনও বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। অনুবাদ যতই ভাল হক না কেন মূল মন্ত্রের স্থান তা নিতে পারে না। কারণ মূলের একটা নিজস্ব মূল্য আছে।…সুতরাং মোটামুটি সংস্কৃত না জানলে কোন হিন্দুর শিক্ষা পূর্ণ হয়েছে বলা চলবে না। সংস্কৃত শেখার ব্যবস্থা না থাকলে এবং যথেষ্ট পরিমাণে সংস্কৃত চর্চা না হলে হিন্দুধর্ম লোপ পাবে। বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির জন্য সংস্কৃতকে কঠিন বলে মনে হয়। আসলে কিন্তু সংস্কৃত এত কঠিন নয়।
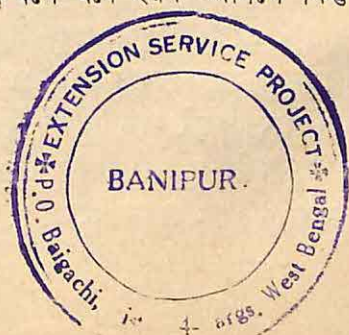
॥ চৌত্রিশ ॥

রোমান লিপি

বর্তমান অবস্থায় মুসলমানেরা যে দেবনাগরীর উপর জোর দেবেন একথা মনে আনা যায় না। বিপুলসংখ্যক হিন্দুরা যে আরবী লিপি গ্রহণ করানোর জন্য পীড়াপীড়ি করবেন একথা আরও অভাবনীয়। "দেবনাগরী বা পার্শিয়ান যে কোন লিপিতে লিখিত হক না কেন, উত্তরের হিন্দু ও মুসলমানেরা সাধারণত যে ভাষা ব্যবহার করে থাকেন", তাকেই আমি তাই হিন্দি বা হিন্দুস্থানীর সংজ্ঞা হিসাবে গ্রহণ করার প্রস্তাব করছি। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হলেও আমি সেই সংজ্ঞাই মেনে চলি। তবে নিঃসন্দেহেই একটি দেবনাগরী আন্দোলনের সঙ্গে আমি সর্বান্তঃকরণে জড়িত। বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত ভাষাসমূহ বিশেষতঃ শব্দভাণ্ডারে যাদের বহুল পরিমাণ সংস্কৃত শব্দ আছে, সেগুলির সাধারণ লিপি হিসাবে দেবনাগরীর প্রবর্তন করাই সে আন্দালনের উদ্দেশ্য। যাই হোক দেবনাগরী লিপিতে ভারতের যাবতীয় ভাষার মহামূল্য সম্পদরাজি আহরণের একটা প্রচেষ্টা চলেছে।

সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত বা এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ভাষাগুলির জন্য একটি সাধারণ লিপি থাকা উচিত আর দেবনাগরী হওয়া উচিত সে লিপি। কোন এক প্রদেশবাসীর অন্য প্রদেশের ভাষা শেখার পক্ষে বিভিন্ন লিপিগুলি এক অহেতুক বাধাস্বরূপ। এমন কি ইউরোপ এক-জাতি-অধ্যুষিত না হওয়া সত্ত্বেও মোটামুটি একটি লিপিকেই গ্রহণ করেছে। ভারত এক-জাতিত্বের দাবী করা সত্ত্বেও এবং বস্তুত ভারতবাসী এক জাতি হওয়া সত্ত্বেও ভারতে কেন একটি মাত্র লিপি প্রবর্তিত হবে না? একই ভাষার জন্য আমি দেবনাগরী এবং উর্দু দুটি লিপিকেই প্রশ্রয় দেওয়ায় আমার এই কথা সামঞ্জস্যবিহীন মনে হতে পারে আমি জানি। তবে আমার এ সামঞ্জস্য-বিহীন আচরণ একেবারে মূর্খতাপ্রসূত না। বর্তমানে হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্ব রয়েছে। যতদূর সম্ভব পরমতসহিষ্ণু হওয়া এবং পরস্পরের প্রতি যথোপযুক্ত সম্মানভাব পোষণ করাই হচ্ছে শিক্ষিত হিন্দু এবং মুসলমানদের বিজ্ঞজনোচিত এবং আবশ্যক কর্তব্য। তাই দেবনাগরী বা উর্দু লিপির যে কোন একটিকে বেছে নেবার অধিকার দেওয়া হয়েছে। সৌভাগ্যবশত প্রদেশগুলির মধ্যে

কোন ঝগড়া নেই। সুতরাং একাধিক উপায়ে যাতে প্রদেশসমূহের মধ্যে অধিকতর ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপিত হতে পারে সে রকম সংস্কার সাধিত হওয়া প্রয়োজন। একথা মনে রাখতে হবে যে দেশের জনসাধারণের অধিকাংশই নিরক্ষর। শুধু বাজে ভাবপ্রবণতার জন্য বা চিন্তাশক্তির দুর্বলতা বশতঃ তাদের উপর নানারকম লিপি চাপিয়ে দিলে সে হবে আত্মঘাতী নীতি।

আমি শুনেছি যে আসামের কোন কোন উপজাতিদের দেবনাগরীর বদলে রোমান লিপিতে লিখতে পড়তে শেখান হচ্ছে। আগেই আমি বলেছি কিঞ্চিৎ সংস্কৃত হয়েই হোক বা বর্তমান রূপেই হোক দেবনাগরীই একমাত্র লিপি যা ভারতে সর্বজনগ্রাহ্য হওয়া সম্ভব। স্বেচ্ছায় মুসলমানরা শুধু বৈজ্ঞানিক কারণে বা জাতীর প্রয়োজনের খাতিরে দেবনাগরীর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার না করা পর্যন্ত উর্দু বা পার্শিয়ান যুগপৎ এর সঙ্গে চলতে থাকবে। তবে বর্তমান সমস্যার সঙ্গে এর সম্বন্ধ নেই। রোমান লিপি অন্য দুটির সঙ্গে একযোগে চলতে পারে না। রোমান লিপির উৎসাহী সমর্থকেরা দুটিকেই স্থানচ্যুত করবে। কিন্তু জনসাধারণের হৃদয়াবেগ বা বিজ্ঞান দুই-ই এর প্রতিকূল। ছাপা এবং যন্ত্রলিখনের কাজে এর সুবিধাই হচ্ছে এর একমাত্র যোগ্যতা। তবে এ শিখতে জনসাধারণের উপর যে চাপ পড়বে, তার তুলনায় এ সুবিধা কিছুই নয়। নিজের প্রাদেশিক লিপি বা দেবনাগরীতে যে লক্ষ লক্ষ জনসাধারণ নিজ ভাষা অধ্যয়ন করে, এ লিপি তাদের কাজেই লাগবে না। প্রাদেশিক লিপিগুলি দেবনাগরী থেকে উদ্ভূত বলে দেশের লক্ষ লক্ষ হিন্দু এমন কি মুসলমানদের পক্ষেও দেবনাগরী শেখা অপেক্ষাকৃত সহজ। জেনে-শুনেই আমি মুসলমানদের এর অন্তর্ভুক্ত করেছি। উদাহরণস্বরূপ বাঙালী মুসলমানদের মাতৃভাষা হচ্ছে বাঙলা। আবার তামিল মুসলমানদের মাতৃভাষাও তামিল। আজকালকার উর্দু প্রচারের আন্দোলনের ফল স্বভাবতই এই হবে যে, সমগ্র ভারতের মুসলমানেরা নিজেদের মাতৃভাষা ছাড়াও উর্দু শিখবে। পবিত্র কোরাণ অধ্যয়ন করার জন্য অবশ্য তাদের আরবী শিখতে হবে। কিন্তু একমাত্র ইংরাজী শিখতে ইচ্ছুক না হওয়া পর্যন্ত হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে লক্ষ লক্ষ জনসাধারণের কখনই রোমান লিপি জানার প্রয়োজন ঘটবে না। স্বীয় ধর্মের মূল গ্রন্থ পঠনেচ্ছুক হিন্দুদেরও তেমনি দেবনাগরী লিপি শিখতে হয় এবং তাঁরা শেখেনও। এই জন্য দেবনাগরীকে সর্বজনগ্রাহ্য করার আন্দোলনের যথার্থ কারণ রয়েছে। রোমান

লিপি প্রবর্তন করার অর্থ জোর করে কিছু একটা চাপিয়ে দেবার প্রচেষ্টা এবং সে প্রচেষ্টা কখনও জনপ্রিয় হবে না। জনসাধারণের মধ্যে সত্যকার চেতনার অভ্যুত্থান এইসব জোর করে একটা কিছু চাপিয়ে দেবার যাবতীয় প্রচেষ্টার অস্তিত্ব মুছে ফেলবে। আর সেই গণচেতনার অভ্যুত্থান আসছে। আমাদের যে কোন কারও কাছে বিদিত কারণের চেয়েও দ্রুততিতে তা আসছে। জনজাগৃতির জন্য সময় অবশ্য যথেষ্ট লাগে। তাকে নিজেরা সৃষ্টি করা যায় না। রহস্যজনক ভাবে তা আসে বা আসছে বলে মনে হয়। গণচিত্তকে পূর্বগামী করে জাতীয় কর্মীরা শুধু তাকে ত্বরান্বিত করতে পারেন।

॥ পঁয়ত্রিশ ॥

ছাত্রদের প্রতি

(১) ছাত্ররা দলীয় রাজনীতিতে ভাগ নেবেন না। তাঁরা ছাত্র—সত্যান্বেষী, রাজনীতিবিদ্ নন।

(২) রাজনৈতিক কারণে ধর্মঘট করা তাঁদের উচিত হবে না। তাঁদের নেতা অবশ্যই থাকবে। তবে নেতার প্রতি তাঁরা আনুগত্য দেখাবেন তাঁর সদ্‌গুণাবলীর অনুকরণ করে, তাঁদের নেতাকে গ্রেপ্তার করলে বা এমন কি ফাঁসী দিলেও ধর্মঘট করে তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশের প্রয়োজন নেই। তবে দুঃখ যদি অসহ্য হয় এবং সকল ছাত্রের মনেই সমানভাবে বেজে থাকে তাহলে সেই সব ক্ষেত্রে অধ্যক্ষের অনুমতি নিয়ে বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয় বন্ধ করা যেতে পারে। অধ্যক্ষ ছাত্রদের অনুরোধে কর্ণপাত না করলে ছাত্ররা ইচ্ছা করলে মর্যাদা সহকারে শিক্ষালয় ছেড়ে চলে যেতে পারেন এবং কর্তৃপক্ষ অনুতপ্ত হয়ে ফিরে আসতে অনুরোধ না করা পর্যন্ত তাঁরা আর সেখানে আসবেন না। অনিচ্ছুক ছাত্র বা কর্তৃপক্ষের উপর চাপ দেওয়া কদাচ সমীচীন হবে না। তাঁদের এই বিশ্বাস থাকা উচিত যে তাঁরা যদি ঐক্যবদ্ধ থাকেন এবং তাঁদের আচরণ যদি মর্যাদাপূর্ণ হয় তাহলে তাঁদের বিজয় অবধারিত।

(৩) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তাঁদের সূত্রযজ্ঞ করতে হবে। তাঁদের

সাজ-সরঞ্জাম সর্বদাই হবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও দুরস্ত করা। সম্ভব হলে এগুলি তাঁরা স্বয়ং তৈরী করে নেবেন। স্বভাবতই তাঁদের সুতা সব চেয়ে ভাল হবে। সুতা কাটার আর্থিক, সামাজিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক দিক সম্বন্ধে যে সব সাহিত্য আছে তা তাঁরা অধ্যয়ন করবেন।

(৪) তাঁরা সম্পূর্ণভাবে খাদিধারী হবেন এবং বিদেশী বা যন্ত্রে প্রস্তুত জিনিসের বদলে গ্রাম্য শিল্পজাত পণ্য ব্যবহার করবেন।

(৫) বন্দেমাতরম্ অথবা জাতীয় পতাকা তাঁরা কারও উপর চাপিয়ে দেবেন না। তাঁরা অবশ্য জাতীয় পতাকার অনুরূপ ব্যাজ বা বোতাম ধারণ করতে পারেন। তবে আর কাউকে জোর করে তা ধারণ করতে বলবেন না।

(৬) ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকার মর্মবাণী তাঁদের জীবনে মূর্ত হয়ে উঠতে পারে এবং তাঁদের হৃদয়ে সাম্প্রদায়িকতা ও ছুঁৎমার্গের স্থান থাকবে না। অন্যান্য ধর্মে বিশ্বাসী ও হরিজন ছাত্রদের সঙ্গে তাঁদের পরমাত্মীয়ের মতই সখ্য হবে।

(৭) আহত প্রতিবেশীদের প্রাথমিক পরিচর্যা করা তাঁদের অবশ্য কর্তব্য হবে। নিকটস্থ গ্রামগুলিতে সাফাই-এর কাজ করা ও সেখানকার শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করাও তাঁদের দায়িত্বের মধ্যে পড়বে।

(৮) বর্তমানের দ্বৈত রূপে জাতীয় ভাষা হিন্দুস্থানী তাঁরা শিখবেন। এর দ্বিবিধ বাচনভঙ্গী ও দুই রকমের লিপি তাঁরা শিখে নেবেন যাতে হিন্দি বা উর্দু যাই বলা হক না কেন এবং নাগরী বা উর্দু যে লিপিতেই লেখা হক না কেন, তা বুঝতে তাঁদের কোন অসুবিধা না হয়।

(৯) নূতন যা কিছু তাঁরা শিখবেন তাকে নিজ মাতৃভাষায় অনুবাদ করবেন এবং সপ্তাহ শেষে যখন নিকটস্থ গ্রামে যাবেন তখন সেখানে তার প্রচার করবেন।

(১০) তাঁরা গোপনে কোন কিছু করবেন না। সর্ববিধ আচরণে তাঁরা সন্দেহের উর্ধ্বে থাকবেন। তাঁরা আত্মসংযমমূলক পবিত্র জীবন যাপন করবেন এবং সর্ববিধ ভয় বর্জন করে নিজ দুর্বল সহপাঠীদের রক্ষা করার জন্য প্রস্তুত থাকবেন। প্রাণ বিপন্ন করে তাঁরা অহিংস পন্থায় দাঙ্গা বন্ধ করার প্রয়াস করবেন। আর চূড়ান্ত আহ্বান এলে দেশের স্বাধীনতার জন্য তাঁরা

বিদ্যানিকেতন ছেড়ে আন্দোলনের ঘূর্ণাবর্তে ঝাঁপিয়ে পড়বেন এবং দরকার হলে নিজের জীবন উৎসর্গ করবেন।

(১১) সহপাঠিনীদের প্রতি তাঁদের ব্যবহার হবে একান্ত ন্যায়সঙ্গত ও সৌজন্যতামণ্ডিত।

আমি যে কর্মসূচী ছকে দিলাম তা কার্যান্বিত করা সময় সাপেক্ষ। তবে আমি জানি যে ছাত্ররা আলসেমী করে অনেক সময় নষ্ট করেন। এদিকে মিতব্যয়ী হলে তাঁরা বহু সময় বাঁচাতে পারেন। সুতরাং স্বদেশপ্রেমী ছাত্রদের এই কাজ করার জন্য আমি এক বছর সময় দিতে বলব। তবে একটানা এক বছর সময় দিতে হবে না, সমগ্র অধ্যয়নকাল মিলিয়ে এই সময় দিলেই চলবে। তাঁরা দেখবেন যে এইভাবে যে এক বছর সময় দিলেন তা বৃথা যায়নি। এতে তাঁদের মানসিক নৈতিক এবং দৈহিক সমৃদ্ধি ঘটবে এবং অধ্যয়নকালেই তাঁরা স্বাধীনতা আন্দোলনে যথেষ্ট অবদান রেখে যেতে পারবেন।

পশ্চিমের মেকী অনুকরণ এবং শুদ্ধ ও সুললিত ইংরাজী বলা ও লেখার ক্ষমতা মুক্তি-মন্দির নির্মাণ কার্যে বিন্দুমাত্র সহায়ক হবে না। বুভুক্ষু ভারতের পক্ষে অতীব ব্যয়বহুল এক শিক্ষাপদ্ধতির সুযোগ ছাত্ররা পাচ্ছে এবং এ শিক্ষা পাওয়ার আশা পোষণ করতে পারে অতীব স্বল্পসংখ্যক কয়েকজন মাত্র। জাতির বেদীমূলে নিজের হৃৎপিণ্ড ডালি দিয়ে ছাত্রদের এই শিক্ষার মূল্য পরিশোধ করতে হবে। প্রাচীনপন্থী প্রথার সংস্কার সাধন কার্যে ছাত্রদের অগ্রদূতের ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে এবং জাতির জীবনযাত্রায় যা কিছু শুভ তা বজায় রেখে সমাজে যে বহুবিধ কদাচার অনুপ্রবেশ করেছে তার থেকে সমাজকে মুক্ত করতে হবে।

মূল জনগণের মনে ছাত্রদেরকে প্রভাব সৃষ্টি করতে হবে। ছাত্রদের কোন প্রদেশ শহর জাতি বা বর্গের দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করলে চলবে না। আমাদেরই জন্য এই বিশাল মহাদেশের প্রতিটি অধিবাসী অস্পৃশ্য মদ্যপ গুণ্ডা এবং এমন কি বেশ্যাআদির অস্তিত্ব সমাজে সম্ভবপর হয়েছে। ছাত্রসমাজকে তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করা শিখতে হবে। প্রাচীন কালে ছাত্রদের বলা হত ব্রহ্মচারী অর্থাৎ ঈশ্বরের সংসর্গে পরিভ্রমণকারী। রাজন্যবর্গ এবং বয়োজ্যেষ্ঠেরা তাঁদের সম্মান করতেন। জাতি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তাঁদের ভার নিত এবং এর পরিবর্তে তাঁরা জাতিকে দিতেন শত শত বজ্রকঠিন আত্মা

তীক্ষ্ণ মেধা ও বলশালী ভুজসমূহ। বর্তমান বিশ্বে দুর্দশাগ্রস্ত জাতিসমূহের মাঝে ছাত্রদের সর্বত্র ভবিষ্যৎ আশাস্থল বলে বিবেচনা করা হয় এবং সমাজ-জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁরা সংস্কারের জন্য আত্মোৎসর্গকারী নেতার পদাভিষিক্ত হন। ভারতে যে এর নিদর্শন নেই এমন কথা নয়। তবে তাঁদের সংখ্যা অতীব নগণ্য। আমার মূল বক্তব্য হচ্ছে এই যে ব্রহ্মচারীর উপযুক্ত এই সব কাজ করাই হবে ছাত্রসম্মেলনের আদর্শ।

ছাত্ররা তাঁদের সমগ্র অবকাশকাল গ্রামসেবায় নিয়োগ করবেন। এরজন্য তাঁরা চিরাচরিত পথে না চলে নিকটবর্তী গ্রামসমূহে যাবেন এবং গ্রামবাসীদের অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করে তাঁদের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করবেন। এই অভ্যাসের ফলে গ্রামবাসীদের সঙ্গে তাঁদের যোগসূত্র গড়ে উঠবে এবং তারপর ছাত্ররা যখন সত্য সত্যই তাঁদের মধ্যে বাস করতে যাবেন তখন পূর্ব পরিচয়ের জন্য তাঁদের নবীনাগন্তুক মনে করে সন্দেহ করার বদলে গ্রামবাসীরা তাঁদের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করবেন। দীর্ঘ অবকাশকালে ছাত্ররা গ্রামে থাকবেন এবং তখন তাঁরা বয়স্কদের শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করবেন এবং গ্রামবাসীদের সাফাই-এর নিয়মগুলি শেখাবেন ও অসুখের মোটামুটি কারণ-সমূহের প্রতিকার ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁদের ওয়াকিবহাল করবেন। তাঁরা তাঁদের ভিতর চরখার প্রবর্তন করে প্রতিটি কর্মহীন মুহূর্তের সদুপযোগ শেখাবেন। একাজ করার জন্য শিক্ষক ও ছাত্রদের নিজ অবকাশের সদুপযোগ সম্বন্ধীয় ধারণার পরিবর্তন করতে হবে। সময় সময় অবিমৃষ্যকারী শিক্ষকেরা ছুটির পড়া দিয়ে থাকেন। আমার মতে সর্বাবস্থাতেই এ একটা অন্যায় প্রথা। অবকাশ হচ্ছে এমন একটা কাল যখন ছাত্রের মন বাঁধাধরা কাজ থেকে মুক্ত থাকবে এবং তাকে এ সময় স্বাবলম্বন ও মৌলিক আত্মবিকাশের জন্য ছেড়ে দিতে হবে। আমি যে ধরনের গ্রামসেবার কথা উল্লেখ করেছি, নিঃসন্দেহেই তা শিক্ষার লঘু কার্যক্রমযুক্ত শ্রেষ্ঠ প্রমোদ ব্যবস্থা।

আপনাদের প্রতিভার বিনিময়ে টাকা রোজগার করার পরিবর্তে তাকে দেশের সেবায় বিনিয়োগ করুন। চিকিৎসক হলে ভারতবর্ষে রোগের কোন অভাব নেই। যদি আইনজীবি হন তাহলে মিটিয়ে ফেলার মত বহু ঝগড়া ও বিভেদ দেশে রয়েছে। আরও হাঙ্গামা বাড়াবার পরিবর্তে এই সব বাদ বিসম্বাদ ও মোকদ্দমা মিটিয়ে ফেলুন। বাস্তুকার হলে দেশের লোকের সঙ্গতি

ও প্রয়োজন অনুসারে এমন আদর্শ ঘরবাড়ী বানান যা তাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল। আপনারা যা-ই শিখে থাকুন না কেন, তা দেশবাসীর কাজে লাগান যায়।

ছাত্রসমাজ ও রাজনীতি

ছাত্রদের নিজ অভিমত ব্যক্ত করার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা উচিত। তাঁদের ইচ্ছা মত যে কোন রাজনৈতিক দলের প্রতি তাঁদের প্রকাশ্য সহানুভূতি থাকতে পারে। তবে আমার মতে অধ্যয়নকালে তাঁদের আচরণের স্বাধীনতা থাকা সমীচীন নয়। কোন ছাত্র সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে ভাগ নেবার সঙ্গে সঙ্গে পড়াশুনা করে উঠতে পারবেন না।

ছাত্রদের দলীয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়া উচিত নয়। যেমন তাঁরা সব রকমের বই পড়েন তেমনি সব দলের বক্তব্য শুনতে পারেন। কিন্তু তাঁদের কাজ হল প্রত্যেক দলের ভিতর যেটুকু সত্য আছে তাকে গ্রহণ করে বাদবাকী বর্জন করা।

ক্ষমতা দখলের রাজনীতি বিদ্যার্থী জগতের কাছে অজ্ঞাত হবে। কারণ যে মুহূর্তে তাঁরা এই জাতীয় ব্যাপারে জড়িয়ে পড়বেন সেই মুহূর্তে তাঁরা আর ছাত্র থাকবেন না এবং তাই দেশকে সঙ্কটকালে সেবা করতেও তাঁরা আর সক্ষম হবেন না।

॥ ছত্রিশ ॥

নারীদের প্রতি

নারী এমন প্রথা ও আইনের পীড়নে নিগৃহীত হয়েছে যা রচনায় তার কোন হাত ছিল না। এর জন্য দায়ী পুরুষ। অহিংসা আধারিত জীবন-যাত্রায় পুরুষের মতই নারীর নিজ ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করার অধিকার থাকবে। তবে অহিংস সমাজ-ব্যবস্থায় প্রতিটি অধিকার ভোগ করার পূর্বে তার সঙ্গে সম্বন্ধিত কর্তব্য সম্পাদন করতে হয়। সুতরাং সামাজিক আচরণবিধি রচনা করতে হবে পারস্পরিক সহযোগিতা ও পরামর্শের ভিত্তিতে। এগুলি কদাচ বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া যায় না। নারীর প্রতি আচরণের সময় পুরুষ এই

সত্য সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারেনি। নারীদের বন্ধু ও সহকর্মী বিবেচনা করার পরিবর্তে পুরুষরা নিজেদের তাঁদের প্রভু মনে করেছেন। নারীদের অবস্থা অনেকটা প্রাচীন কালের কৃতদাসদের মত যারা জানত না যে তারা কোন দিন স্বাধীন হতে পারে।···নারীদের নিজেদের পুরুষের কৃতদাস মনে করতে শেখান হয়েছে। কংগ্রেস কর্মিদের দেখতে হবে যে তাঁরা যেন নিজেদের পূর্ণ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন এবং পুরুষের সমান হিসাবে নিজ ভূমিকা গ্রহণ করেন।

মনকে তৈরী করতে পারলে এ বিপ্লব সংসাধন সহজ। কংগ্রেস কর্মিরা নিজেদের বাড়ী থেকে শুরু করুন। তাঁদের স্ত্রী যেন খেলার পুতুল অথবা ভোগের সামগ্রী না হয়। স্ত্রীকে সাধারণ সেবার লক্ষ্যের মাননীয় সহকর্মী বিবেচনা করতে হবে। এর জন্য যাঁরা শিক্ষিত নন তাঁদের স্বামীরা তাঁদের সাধারণ শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করবেন। বাড়ীর মা ও মেয়েদের পক্ষেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য।

আইন কানুন অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষের তৈরী এবং এই স্বতঃআরোপিত কর্তব্য সম্পাদনের সময় পুরুষ সর্বদা ন্যায়বিচার ও পক্ষপাতবিহীন আচরণ করেনি। নারীজাতির উত্থানের জন্য আমাদের প্রয়াসের অধিকাংশকে তাই আমাদের শাস্ত্রসমূহে উক্ত নারীদের স্বভাব সম্পর্কিত কলঙ্কিত ধারণাগুলির অপনোদনের জন্য নিয়োগ করতে হবে। কে এই কাজ করবেন এবং কেমন ভাবে? আমার বিনীত অভিমত এই যে এ কাজ করার জন্য আমাদের সীতা দময়ন্তী ও দ্রৌপদীর মত পবিত্র দৃঢ় ও আত্মসংযমের মূর্ত প্রতীক নারীর সৃষ্টি করতে হবে। এঁদের সৃষ্টি করতে পারলে এই সব আধুনিক ভগ্নীদের শাস্ত্রের সমানই কর্তৃত্ব হবে। আমাদের স্মৃতিসমূহে ইতঃস্তত প্রক্ষিপ্তভাবে নারীদের সম্বন্ধে অপমানজনক যে সব মন্তব্য রয়েছে আমরা তখন তার জন্য লজ্জিত হব এবং শীঘ্রই সেইগুলি ভুলে যাব। অতীতে হিন্দুধর্মে এরকম বিপ্লব ঘটেছে এবং ভবিষ্যতেও এ রকম হবে ও তার দ্বারা আমাদের ধর্মের স্থায়িত্ব বিধান হবে।

নরনারীর অধিকারসাম্য

নারীদের অধিকারের ব্যাপারে আমি আপোষবিহীন। আমার মতে নারীদের এমন কোন আইনগত অসুবিধা থাকা উচিত নয় যা পুরুষদের নেই। ছেলে ও মেয়েদের আমি পূর্ণ ঐক্যের ভূমিকায় দেখতে চাই।

নরনারীর ঐক্যের অর্থ উভয়ের একরকমের পেশা নয়। শিকার করা অথবা বর্শা ছোঁড়া সম্বন্ধে নারীর কোন আইনগত বাধা না থাকতে পারে। কিন্তু স্বভাবতই তিনি এ জাতীয় পুরুষালী কাজ করা থেকে বিরত থাকবেন। পুরুষ এবং নারীকে পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে প্রকৃতি সৃষ্টি করেছে। তাদের আকৃতির পার্থক্যের মত তাদের ক্রিয়া-কলাপের পার্থক্যও সুনির্দিষ্ট।

বিবাহ

বিবাহ জীবনের একটি স্বাভাবিক জিনিস। একে কোন রকমের অপমানজনক ব্যাপার মনে করা অনুচিত।...মানুষের আদর্শ হবে বিবাহকে এক পবিত্র বন্ধন স্বরূপ জ্ঞান করা এবং তাই বিবাহিত কালে আত্মসংযমমূলক জীবন যাপন করা।

পর্দাপ্রথা

নারীর পবিত্রতার জন্য এই সব অসুস্থ উদ্বেগ কেন? পুরুষের পবিত্রতা সম্বন্ধে নারীদের কি কোন বক্তব্য আছে? পুরুষের জিতেন্দ্রিয়তা সম্বন্ধে নারীদের কোন উৎকণ্ঠার কথা তো শোনা যায় না। তাহলে পুরুষ কেন নারীদের সতীত্ব নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব নিজের উপর নেবে? সতীত্ব বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া যায় না। ভিতর থেকে এটা গড়ে ওঠে এবং তাই এটা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার বিষয়।

পণপ্রথা

এ প্রথার অবসান প্রয়োজন। বিবাহ যেন টাকা পয়সার জন্য অভিভাবকদের করা একটি বন্দোবস্ত না হয়। এর সঙ্গে জাতিভেদ প্রথার অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ। এ প্রথার বিরুদ্ধে যত কথাই বলা হক না কেন পাত্র পাত্রী নির্বাচন যতদিন একটি বিশেষ জাতের মাত্র শ'কয়েক যুবক যুবতীর মধ্যে সীমিত থাকবে ততদিন এ প্রথা কায়েম থাকবে। এ পাপের অবসানকল্পে মেয়ে ছেলে অথবা তাদের অভিভাবকদের জাতের বেড়া ভেঙ্গে ফেলতে হবে। এ সবের অর্থ হল চরিত্র গঠনের জন্য এমন শিক্ষা দেওয়া যার ফলে জাতির যুবসম্প্রদায়ের চরিত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটবে।

যে যুবক পণ নিয়ে বিয়ে করেন তিনি নিজের শিক্ষা-দীক্ষা নিজ দেশ ও সমগ্র নারী সমাজের অপমান করেন। দেশে বহুরকমের যুব আন্দোলন

আছে। আমি চাই এই সব আন্দোলনে এ জাতীয় সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামান হক। প্রায়ই এ সব প্রতিষ্ঠান সমাজের ভিতর থেকে দৃঢ়মূল সংস্কার সাধনের মাধ্যম হবার পরিবর্তে আত্ম-প্রশংসার কেন্দ্র হয়ে ওঠে।...জঘন্য পণপ্রথার বিরুদ্ধে প্রবল জনমত গড়ে তোলা দরকার যাতে যে সব যুবক এই জাতীয় অন্যায়ভাবে লব্ধ সোনা দানা নিয়ে হাতকে কলঙ্কিত করেছেন তাঁদের সমাজে একঘরে করা যায়। মেয়েদের অভিভাবকরাও যেন ইংরাজী ডিগ্রীর চমকে অভিভূত না হন ও তাঁরা যেন তাঁদের হাতের ছোট্ট গণ্ডিটির বাইরে গিয়ে তাঁদের মেয়েদের জন্য যথার্থ সৎসাহসী পাত্র সংগ্রহে প্রস্তুত থাকেন।

বিধবা-বিবাহ

জীবনসঙ্গীর প্রেমের স্বাদ যে নারী পেয়েছে সজ্ঞানে তার স্বেচ্ছাবরিত বৈধব্য জীবনের মর্যাদা ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, এর পরিণামে গৃহ পবিত্র হয় এবং এমন কি ধর্মেরও উত্থান হয়। কিন্তু ধর্ম ও সামাজিক প্রথা দ্বারা চাপিয়ে দেওয়া বৈধব্য এক অসহনীয় বোঝা এবং এর ফলে গৃহ গোপন পাপে কলুষিত হয় ও ধর্ম হয় অধোগামী।

আমরা যদি পবিত্র হতে চাই, হিন্দুসমাজকে রক্ষা করা যদি আমাদের উদ্দেশ্য হয় তাহলে বাধ্যতামূলক বৈধব্যের এই বিষের প্রভাব থেকে আমাদের মুক্ত হতে হবে। এই সংস্কারের প্রথম চরণ হিসাবে সাহস করে বাল বিধবাদের সৎপাত্রে বিবাহ দিতে হবে। পুনর্বিবাহ আমি একে বলছি না; কারণ সত্যকার বিবাহ তাদের কোন দিনই হয়নি।

বিবাহ-বিচ্ছেদ

আমার কাছে বিবাহিত জীবন জীবনের অপর যে কোন পর্যায়েরই মত শৃঙ্খলা ও অনুশাসন নিয়ন্ত্রিত। জীবনের অর্থ কর্তব্য—শিক্ষানবিশী। বিবাহিত জীবনের উদ্দেশ্য হল পারস্পরিক কল্যাণ সাধন। এই কল্যাণের পরিধি এখানে এবং এর পরও। মানবতার সেবাও এর লক্ষ্য। একপক্ষ এই শৃঙ্খলার বিধান ভঙ্গ করলে অপর পক্ষের সেই বন্ধন ছিন্ন করার অধিকার জন্মায়। এই বিচ্ছেদ নৈতিক, দৈহিক নয়।

নারীর সম্ভ্রম

বরাবরই আমি এই অভিমত পোষণ করি যে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন নারীর সম্ভ্রম হানি করা একান্ত অসম্ভব। নারী যখন ভয়ের শিকার হয়

অথবা যদি তার নৈতিক শক্তি সম্বন্ধে অজ্ঞান থাকে তাহলেই কেবল তার ইজ্জত যাওয়া সম্ভব। আক্রমণকারীর দৈহিক শক্তির সঙ্গে পাল্লা দিতে অসমর্থ হলে তার পবিত্রতা তাকে ইজ্জত হারাবার পূর্বে মরার শক্তি দেবে। সীতার উদাহরণ নিন। দৈহিক শক্তির দিক থেকে রাবণের কাছে তিনি ছিলেন নগণ্য। কিন্তু তাঁর পবিত্রতার জন্য রাবণের মত দুর্ধর্ষ শক্তিশালী রাক্ষসও সীতার কিছু করতে পারেনি। রাবণ সীতাকে বহু প্রলোভন দিয়ে ভুলাতে চেয়েছিল কিন্তু সীতার অনুমোদন না পাওয়ায় কদাচ রাবণের বাসনাকলুষ স্পর্শ তাঁর সান্নিধ্য পায়নি। পক্ষান্তরে নারী যদি তার দৈহিক শক্তি অথবা কোন অস্ত্রের উপর নির্ভর করে তাহলে তার সেই শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেলে তার অপমান হতে বাধ্য।

আক্রান্ত হলে নারী হিংসা অহিংসার বিচার করবে না। তার প্রাথমিক কর্তব্য হল আত্মরক্ষা। নিজের সম্মান রক্ষার জন্য তখন পদ্ধতি বা উপায়ের কথা মনে পড়ুক না কেন, তার শরণ নেবার অধিকার তার আছে। ভগবান তাকে নখ ও দাঁত দিয়েছেন। প্রয়োজন পড়লে সর্বশক্তি প্রয়োগে তার ব্যবহার করার অধিকার নারীর আছে এবং তেমন বুঝলে এই প্রচেষ্টায় সে প্রাণ দেবে। যে পুরুষ বা নারী মৃত্যুভয় বর্জন করেছে জীবন দিয়ে সে কেবল নিজেকেই রক্ষা করতে পারবে না, আর সকলকেও রক্ষা করতে সমর্থ হবে।

গণিকাবৃত্তি

গণিকাবৃত্তি সৃষ্টির আদি থেকে আছে। তবে বর্তমানের মত কখনও এ প্রথা নগর-জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল কি না সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। যাই হক না কেন এবার এই অভিশাপের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে বেশ্যাবৃত্তিকে অতীতের বস্তুতে পরিণত করার সময় এসে গেছে। বহুকাল প্রচলিত হওয়া সত্ত্বেও মানুষ এ জাতীয় অনেক কুপ্রথা বর্জন করেছে।

নারী-শিক্ষা

পুরুষ ও নারীর মর্যাদা সমান কিন্তু তারা হুবহু এক রকমের নয়। তারা তুলনাহীন জুটি, একে অপরের পরিপূরক। তারা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে বলে একজন ছাড়া অপরের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। সুতরাং

স্বভাবতই এর থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় যে যা কিছু এদের মধ্যে যে কোন একজনের মর্যাদার পক্ষে হানিকর তা উভয়ের পক্ষেই সমানভাবে সর্বনাশা। নারী শিক্ষার কোন পরিকল্পনা রচনার পূর্বে এই মৌল সত্যটি সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে। বিবাহিত দম্পতির ক্ষেত্রে পুরুষ বাইরের বিষয়ে সর্বেসর্বা এবং সেই কারণে স্বভাবতই তার ঐ বিষয়ে অধিকতর জ্ঞান থাকা উচিত। পক্ষান্তরে ঘর গৃহস্থালী সম্পূর্ণরূপে নারীর এলাকাভুক্ত এবং সেই-জন্য ঘরকন্নার ব্যাপারে, সন্তানদের মানুষ করা ও তাদের শিক্ষা দীক্ষার বিষয়ে নারীর অধিকতর মাত্রায় জ্ঞান থাকবে। জ্ঞানকে অবশ্য পরস্পর সম্পর্ক বিরহিত জলনিরোধক প্রকোষ্ঠে ভাগ করার কথা বলা হচ্ছে না, এ কথাও বলা হচ্ছে না যে জ্ঞান রাজ্যের কোন কোন এলাকা কারও কারও কাছে নিষিদ্ধ এলাকায় পর্যবসিত হবে। কিন্তু পুরুষ ও নারীর এই মৌলিক পার্থক্যের আধারে উভয়ের শিক্ষাক্রম নির্ধারিত না হলে পুরুষ বা নারী কারও জীবনেরই সম্পূর্ণ বিকাশ হবে না।

…নারী উদরান্নের জন্য চাকরী বা ব্যবসায় করুক—এতে আমি বিশ্বাসী নই। মুষ্টিমেয় যে কয়টি নারীর ইংরাজী জানা দরকার বা শেখার শখ পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট বিদ্যালয়ে যোগ দিয়ে সহজেই তাঁরা তা শিখতে পারেন। নারীদের জন্য নির্দিষ্ট বিদ্যালয়ে ইংরাজী প্রবর্তন করার পরিণাম আমাদের অসহায় অবস্থার অবধিকে বাড়ান। অনেক সময় আমি লোকের এই অভিমত পড়েছি এবং অনেককে একথা বলতে শুনেছি যে ইংরাজী সাহিত্যের সম্পদ পুরুষের মত নারীর কাছেও সহজলভ্য করা উচিত। যথোচিত বিনয় সহকারে আমি নিবেদন করতে চাই যে এই জাতীয় মনোভাবের পিছনে একটি ভুল ধারণা ক্রিয়াশীল। কেউই এ সম্পদ পুরুষের পক্ষে সহজলভ্য করে নারীর কাছে দুর্লভ করতে চায় না।

নারীকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ায় আমি বিশ্বাসী। তবে আমি এও বিশ্বাস করি যে পুরুষের অন্ধ অনুকরণ করে বা তাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নারী পৃথিবীকে কোন কিছু দিতে পারবে না। প্রতিদ্বন্দ্বিতা অবশ্য করতে পারে। তবে পুরুষের অন্ধ অনুকরণ করলে তার যতটা উর্ধ্বে ওঠার যোগ্যতা আছে তা উঠতে পারবে না। নারীকে পুরুষের পরিপূরক হতে হবে।

॥ সাঁইত্রিশ ॥

জন্ম-নিয়ন্ত্রণ

জন্ম নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে দ্বিমত থাকতে পারে না। তবে এর জন্য যে একমেব পদ্ধতি যুগ যুগ ধরে চলে আসছে তার নাম আত্মসংযম বা ব্রহ্মচর্য। এ হল এক অভ্রান্ত ও শ্রেষ্ঠ প্রতিষেধক যা এর অনুশীলনকারীর হিতসাধন করে। আর চিকিৎসকরা গর্ভনিয়ন্ত্রণের কৃত্রিম সাজ-সরঞ্জাম আবিষ্কারের পরিবর্তে আত্মসংযমের উপায় অনুসন্ধান করলে মানবজাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন।

কৃত্রিম উপায়সমূহ পাপকে প্রোৎসাহিত করে। এর পরিণামে পুরুষ ও রমণী উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়ে। আর গর্ভনিয়ন্ত্রণের কৃত্রিম উপায়সমূহকে যে-ভাবে মর্যাদা-মণ্ডিত করা হচ্ছে তার ফলে জনমত সঞ্জাত সংযমের বন্ধন বিলুপ্তিকরণের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হবে। কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করার পরিণাম হল নির্বীর্য অবস্থা ও স্নায়ুতন্ত্রের ব্যাধি। রোগের চেয়ে তার প্রতিষেধক মারাত্মক হয়ে উঠবে।

নিজের কাজের দায়িত্ব এড়াবার চেষ্টা করা অন্যায় এবং অনৈতিক। অতিভোজনকারীর পেটে ব্যথা হওয়া ভাল এবং তার পরিণামে তার উপবাস করা উচিত। অসংযত হয়ে ভূরি ভোজনের পর ওষুধ খেয়ে তার পরিণামের হাত এড়ান খারাপ। আর এর চেয়েও খারাপ হল জৈব বৃত্তির উদ্দাম সম্ভোগের পর তার পরিণাম এড়ান। প্রকৃতি নিষ্ঠুর এবং তার বিধান উল্লঙ্ঘন করার প্রতিশোধ পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করবে।

কৃত্রিম উপায়ে গর্ভ নিরোধ কোন নূতন ব্যাপার নয়। অতীতে গোপনে এসব উপায়ের শরণ নেওয়া হত এবং এর পদ্ধতিও ছিল অবিকশিত। আধুনিক সমাজ একে মর্যাদার আসন দিয়েছে ও এর পদ্ধতির উন্নতি সাধন করেছে। মানবপ্রেমিকতার ছদ্মাবরণে এখন গর্ভনিয়ন্ত্রণের কৃত্রিম পদ্ধতিকে উপস্থাপিত করা হচ্ছে। কৃত্রিম সাজ-সরঞ্জামের সমর্থকরা বলে থাকেন যে যৌন সঙ্গমের ইচ্ছা মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তি—অনেকের মতে এ ইচ্ছা আশীর্বাদ স্বরূপ। এইজন্য তাঁদের বক্তব্য হল সম্ভব হলেও এ ইচ্ছাকে অবদমিত করা বাঞ্ছনীয় নয়। তাঁদের মতে আত্মসংযমের দ্বারা জন্মনিয়ন্ত্রণ

করা দুরূহ ব্যাপার। সুতরাং আত্মসংযমের বিকল্প পেশ করতে না পারলে ঘন ঘন গর্ভ সঞ্চারের ফলে বহু নারীর স্বাস্থ্য নষ্ট হতে বাধ্য। তাঁরা আরও বলেন যে সন্তানের জন্ম সীমিত করতে না পারলে জনসংখ্যা অত্যন্ত বেড়ে যাবে, পরিবারগুলি দরিদ্র হতে থাকবে এবং তাদের সন্তানদের খাওয়া পরা ও শিক্ষার যথোচিত ব্যবস্থা করা যাবে না। অতএব তাঁদের যুক্তি হল এই যে গর্ভ নিরোধের নির্দোষ ও কার্যকরী পদ্ধতি আবিষ্কার করা বৈজ্ঞানিকদের কর্তব্য।

এ সব যুক্তি আমাকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়নি। কৃত্রিম সাজ-সরঞ্জাম ব্যবহারের ফলে এমন ক্ষতি হওয়া সম্ভব, যে সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণা নেই। তবে সব চেয়ে বিপদ হল এই যে কৃত্রিম উপায়ের শরণ নেবার ফলে আত্মসংযমের ইচ্ছাই নষ্ট হয়ে যাবে। আমার মতে সম্ভাব্য কোন তাৎকালিক লাভের তুলনায় এ মূল্য অত্যধিক।···পুরুষকে বুঝতে হবে যে নারী তার সাথী এবং জীবনসঙ্গিনী, তার কামবৃত্তি চরিতার্থ করার যন্ত্র নয়। আমাদের স্পষ্ট করে বুঝতে হবে যে মানবসৃষ্টির উদ্দেশ্য পশুবৃত্তির সন্তুষ্টি থেকে সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন।

স্কুলের ছেলেমেয়েদের ভিতর এই গোপন পাপ কী বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে তা আমি জানি। বিজ্ঞানের নামে ও সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অনুমোদনক্রমে গর্ভনিরোধক সাজ-সরঞ্জামের প্রবর্তনের ফলে জটিলতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে ও সমাজ-জীবনকে কলুষতামুক্ত করার কাজে ব্রতী সংস্কারকদের কাজ এখনকার মত প্রায় অসম্ভব করে তুলেছে। এ কথা আজ আর গোপন নয় যে স্কুল-কলেজের ছাত্রী এমন সব অনেক বয়স্থা মেয়ে আছে যারা গর্ভনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কীয় পুস্তকাবলি ও পত্রপত্রিকা পাঠ করে এবং তাদের অনেকের কাছে গর্ভনিরোধক সাজ-সরঞ্জামও থাকে। শুধু বিবাহিতদের মধ্যে এসবের ব্যবহার সীমাবদ্ধ রাখা অসম্ভব। যখন স্বাভাবিক পরিণতি সম্বন্ধে নিরুদ্বিগ্ন হয়ে শুধু পাশবৃত্তির তৃপ্তি সাধন করাই বিবাহের লক্ষ্য ও পরমার্থ জ্ঞান করা হয়, তখন বিবাহ তার পবিত্রতা হারিয়ে ফেলে।

বন্ধ্যাত্ব আইন জোর করে লোকের উপর চাপিয়ে দেওয়াকে আমি অমানুষিক ব্যাপার বিবেচনা করি। তবে কেউ যদি পুরাতন ব্যাধিতে ভোগেন তবে তাঁর মত থাকলে তাঁর সন্তান উৎপাদন ক্ষমতা অস্ত্রোপচারের দ্বারা বন্ধ করে দেওয়া সমীচীন। নির্বীর্যকরণও এক ধরনের গর্ভনিরোধক

ব্যবস্থা। তবে নারীদের ক্ষেত্রে গর্ভনিরোধক সাজ-সরঞ্জাম ব্যবহারের পক্ষপাতী না হলেও পুরুষের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত নির্বীর্যকরণে আমার আপত্তি নেই। কারণ যৌন সঙ্গমের ব্যাপারে পুরুষই অগ্রণী।

মাত্রাতিরিক্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধি বন্ধ করার জন্য গর্ভনিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন বলে যদি মনে করা হয় তাহলে আমি বলব যে এ অভিমতে আমার বিশ্বাস নেই। এ তত্ত্ব এখনও কেউ সপ্রমাণ করতে পারেননি। আমার মতে যথোচিত ভূমি ব্যবস্থা প্রবর্তন করে এবং উন্নত ধরনের কৃষি, সহায়ক শিল্পের প্রবর্তন করে এই দেশ বর্তমানের দ্বিগুণ জনসংখ্যার ভরণ-পোষণে সক্ষম।

॥ আটত্রিশ ॥

সাম্প্রদায়িক ঐক্য

হিন্দু, মুসলমান, ক্রিশ্চিয়ান, শিখ বা পার্শিরা যেন তাঁদের বিভেদ মেটানোর জন্য হিংসার আশ্রয় গ্রহণ না করেন এবং স্বরাজ অর্জনের পন্থাও যেন অহিংস হয়। বৃথাই হিন্দু-মুসলমানেরা বলে থাকেন যে, ধর্মের ব্যাপারে কারও উপর জোরজবরদস্তি করা অন্যায়। একটি গরুকে বাঁচানোর জন্য হিন্দুরা যদি কোন মুসলমানকে হত্যা করেন, তবে তাকে জবরদস্তি ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে? এ হচ্ছে বলপ্রয়োগে একজন মুসলমানকে হিন্দুধর্মে দীক্ষিত করার মত। সেইরকম মুসলমানরা যখন বলপ্রয়োগ করে মসজিদের সামনে হিন্দুদের বাজনা বাজাতে দেন না, তাকে জবরদস্তি ছাড়া আর কি আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। গোলমালের মধ্যে প্রার্থনায় মগ্ন থাকাই তো পুণ্যবানের লক্ষণ। আমাদের ধর্মীয় অনুশাসনকে শ্রদ্ধা দেখাবার জন্য একে অপরকে বাধ্য করার ব্যর্থ চেষ্টা যদি আমরা করি তবে ভাবীকাল আমাদের অধার্মিক বর্বর বলে ঘৃণা করবে।

স্বীয় অন্তরের অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ কোন আর্যসমাজী বা মুসলমান প্রচারকের ধর্মবিশ্বাস প্রচারের ফলে যদি হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সঙ্কটাপন্ন হয়, তবে বুঝতে হবে, সে ঐক্য একেবারে অগভীর। এ সব আন্দোলনে আমরা কেন ব্যতিব্যস্ত হব? এই পরিবর্তন খাঁটি হওয়া দরকার। হিন্দুধর্মে ফিরে আসতে চাইলে যখন খুশী "মালকানাদের" সে অধিকার আছে। তবে অপর

ধর্মের অপযশকারী কোন্ রকম প্রচারকার্য চলতে দেওয়া যেতে পারে না। কারণ, এতে পরমতসহিষ্ণুতাকে অস্বীকার করা হবে। এই রকম সব প্রচারকার্যের সম্বন্ধে সেরা কর্মপন্থা হচ্ছে খোলাখুলিভাবে এসবের নিন্দা করা। প্রত্যেক আন্দোলন মাননীয়তার আচ্ছাদনে সজ্জিত হবার চেষ্টা করে। জনসাধারণ সেই আবরণকে ছিন্নভিন্ন করে দেওয়ামাত্র মাননীয়তার অভাবে আন্দোলন ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

বিরোধের দু'টি স্থায়ী কারণ সম্বন্ধে এখন আলোচনা করা যাক।

প্রথম হচ্ছে গো-হত্যা। হিন্দুধর্মের গোষ্ঠী-বিশেষ এবং সর্বসাধারণ, উভয়ের কাছে সমান প্রয়োজনীয় বিধায়, গোরক্ষণকে আমি হিন্দুত্বের মূলসূত্র বলে মানলেও এর জন্য মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষের কোন কারণ আমি খুঁজে পাই না। ইংরেজরা প্রতিদিন যে গোহত্যা করছে তার জন্য আমরা কিছু বলি না। একজন মুসলমান একটি গো-হত্যা করা মাত্র আমরা রেগে একেবারে অগ্নিশর্মা হয়ে যাই। গো-মাতার নামে যেসব দাঙ্গা সংঘটিত হয়ে গেছে, তার সবগুলিতেই উদ্যমের অহেতুক অপব্যবহার করা হয়েছে। এর দ্বারা একটিও গরু রক্ষা পায়নি, বরং উল্টে বহু মুসলমানের দেহে আঘাত পড়েছে এবং তার ফলে আরও গো-হত্যা সংঘটিত হয়েছে। নিজেদের ভিতর আগে গো-রক্ষা শুরু করা উচিত। ভারতের মত আর কোথাও বোধ হয় পশুর এত হতাদর করা হয় না। হিন্দু গাড়োয়ান কর্তৃক নিজের ক্লান্ত বলদকে নিষ্ঠুর অঙ্কুশের তাড়না করতে দেখে আমি অশ্রুমোচন করেছি। আমাদের অধিকাংশ পশুর অর্দ্ধাহারী অবস্থা আমাদের পক্ষে কলঙ্কের বিষয়। হিন্দুরা বিক্রী করে বলেই গরুর গর্দানে কসাই-এর ছুরি পড়ে। এর একমাত্র কার্যকরী এবং সম্মানজনক উপায় হচ্ছে মুসলমানদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা এবং তাদের উপর গো-রক্ষার ভার ছেড়ে দেওয়া। পশুর খাদ্যের ব্যবস্থা করা, তাদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ বন্ধ করা, যে সমস্ত গো-চারণভূমি অতি দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে তার পুনরুদ্ধার, পশু-বংশের উন্নতি সাধন, দরিদ্র পশুপালকদের কাছ থেকে পশু ক্রয় করা এবং পিঞ্জরাপোলগুলিকে আদর্শ ও স্বাবলম্বী দুগ্ধশালায় পরিণত করা ইত্যাদি গো-রক্ষা-সমিতিগুলির কাজ হওয়া উচিত। উপরে উল্লিখিত কাজগুলির মধ্যে যে কোন একটিকে অবহেলা করলে ঈশ্বর এবং মানবের কাছে হিন্দুর পাপাচরণ করা হয়। মুসলমান কর্তৃক গো-হত্যা নিবারিত না হলে তাদের কোনই পাপ হয় না। বরং তারা

যখন গো-রক্ষার জন্য মুসলমানদের সঙ্গে বিবাদ করে তখনই হয় ঘোরতর পাপ।

মসজিদের সামনে বাজনার সমস্যা এবং আজকাল আবার হিন্দুদের দেব-মন্দিরে আরতির সমস্যা, আমার পক্ষে এক বিশেষ চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে। হিন্দুদের তরফ থেকে যেমন গো-হত্যা, মুসলমানদের তরফ থেকেও এ তেমনি এক বেদনাজনক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। হিন্দুরা যেমন মুসলমানদের গো-হত্যা নিবারণে বাধ্য করতে পারে না, মুসলমানেরাও তেমনি বলপূর্বক হিন্দুদের বাজনা বাজানো বা আরতি করা বন্ধ রাখতে পারে না। হিন্দুদের শুভবুদ্ধির উপর তাদের আস্থা রাখতে হবে। হিন্দু হিসাবে আমি হিন্দুদের পরামর্শ দেব যে, তাঁরা যেন দর কষাকষির মনোবৃত্তি ছেড়ে দিয়ে তাঁদের মুসলমান প্রতিবেশীদের মনোভাবের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা দেখান এবং যখনই সম্ভব যেন তাদের স্থবিধা করে দেন। আমি অবশ্য খবর পেয়েছি যে, বহু জায়গায় ইচ্ছা করে মুসলমানদের রাগানোর জন্যই ঠিক তাদের প্রার্থনার সময় হিন্দুরা আরতি শুরু করে। এ হচ্ছে বন্ধুত্বের নীতি-বহির্ভূত এবং মূর্খতাপ্রসূত কাজ। বন্ধুর মনোভাবের প্রতি সর্বাপেক্ষা অধিক মনোযোগ দেওয়াই বন্ধুত্বের রীতি। এর জন্য বিবেচনা করার প্রয়োজন হয় না। তবে শক্তিপ্রয়োগে হিন্দুদের বাজনা বন্ধ করার কথা মুসলমানেরা যেন ভুলেও কল্পনা না করেন। হুমকির সামনে বা হিংসার সামনে নতি স্বীকার করে নেওয়ার অর্থ হচ্ছে নিজের আত্মসম্মান এবং ধর্মবিশ্বাসকে বর্জন করা। তবে হুমকির যে পরোয়া করে না, ক্রোধোদ্দীপনের স্থযোগ সে খুব কমই আসতে দেবে এবং এমন কি একে একেবারে এড়াতেও পারে।

আমার দৃঢ় প্রতীতি এই যে, নেতৃবৃন্দ না বললে জনসাধারণ কখনও ঝগড়া চায় না। সুতরাং নেতৃবৃন্দ যদি চান যে, ঝগড়াঝাটিকে বর্বরতাজনক এবং অধর্মীয় বিবেচনা করে অন্যান্য প্রগতিশীল দেশের মত আমাদের দৈনন্দিন জীবন থেকে একে মুছে ফেলা হক, তবে নিঃসন্দেহে আমি বলতে পারি যে, অনতিবিলম্বে জনসাধারণ তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে।

সরকারী চাকরীতে নিয়োগের ব্যাপারে যদি সাম্প্রদায়িক মনোভাব আমদানী করা যায়, তবে সে মারাত্মক হয়ে উঠবে। শাসনকার্য স্থচারুরূপে সম্পন্ন করতে হলে যোগ্যতমের উপরেই এর ভারার্পণ করা কর্তব্য। কিছুতেই এ ব্যাপারে পক্ষপাত দেখানো চলবে না। পাঁচজন ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগকালে

সকল সম্প্রদায় থেকে এক এক জন নিলে চলবে না। যোগ্যতম যে পাঁচজন, তারা সমস্তই মুসলমান বা পার্শি যাই হক না কেন, তাদেরই নিতে হবে। প্রয়োজন হলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত কোন নিরপেক্ষ বিচারকমণ্ডলীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিদেরই নিম্নতম পদগুলিতে নিয়োগ করা হবে। জনসংখ্যার সাম্প্রদায়িক হারে কোনক্রমেই চাকরীর বাঁটোয়ারা হওয়া উচিত নয়। জাতীয় সরকারের কাছে শিক্ষায় অনগ্রসর সম্প্রদায়সমূহের শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা পাবার দাবী অবশ্যই থাকবে। এ ব্যবস্থা সুচারু-রূপে হতে পারে। তবে যারা শাসনবিভাগে দায়িত্বশীল পদ গ্রহণে অভিলাষী, প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকলে তবেই তারা সে পদ পাবে।

ভারতের হিন্দু এবং মুসলমানদের মধ্যে স্থায়ী এবং আন্তরিক ঐক্য না এলে এই দুর্ভাগা দেশে কোন কিছু করার আমি উপায় দেখি না। অবিলম্বে এই ঐক্য স্থাপনা করা সম্ভব—এ কথা আমি বিশ্বাস করি। কারণ যেমন এ স্বাভাবিক আবার তেমনি উভয়ের প্রয়োজনীয়, আর মানব-প্রকৃতিতে আমার আস্থা আছে। মুসলমানদের হয়তো বহু কৈফিয়ৎ দিতে হবে। তথাকথিত "একেবারে খারাপ"দেরও আমি ঘনিষ্ঠ সংশ্রবে এসেছি। অনুতাপ করার মত একটি ঘটনাও আমার স্মরণে নেই। মুসলমানদের অবিশ্বাসের ভাব দূর হলেই দেখা যাবে যে তারা সাহসী, দয়ালু এবং বিশ্বাসযোগ্য। হিন্দুরা নিজেরাই কাঁচের বাড়ীর বাসিন্দা বলে মুসলমান প্রতিবেশীদের ঘরে ঢিল ছোঁড়ার অধিকার তাদের কোনমতেই নেই। চেয়ে দেখুন দলিতবর্গের প্রতি আমরা কি ব্যবহার করেছি আর এখনও করে চলছি।

প্রত্যক্ষভাবে ভগবান শাস্তি দেন না। তাঁর পন্থা দুর্বোধ্য। কে জানে যে আমাদের ঐ এক পাপের ফলেই আমাদের এইসব দুঃখ নয়? নৈতিকতার সুউচ্চ শিখর থেকে পদস্খলন হয়ে থাকলেও ইসলামের ইতিহাসে বহু গৌরবোজ্জল অধ্যায় বর্তমান। প্রাচীন গৌরবের দিনে ইসলাম পরমত-অসহিষ্ণু ছিল না। ইসলাম সমস্ত জগতের প্রশংসাভাজন হয়েছিল। পাশ্চাত্ত্য যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল, তখন পূর্বগগনে এক উজ্জ্বল তারকা দেখা দিয়ে আর্তনাদক্লিষ্ট জগৎকে বিলিয়েছিল আলো ও শান্তি। ইসলাম মিথ্যাধর্ম নয়। সশ্রদ্ধ চিত্তে হিন্দুরা এ সম্বন্ধে অধ্যয়ন করুন এবং তা হলে আমার মত তাঁরাও একে ভালবাসবেন। এ দেশে যদি এর ভিতর উন্মত্ততা বা ক্লেদ ঢুকে থাকে, তবে আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, এর জন্য আমাদের দায়িত্বও

কম নয়। হিন্দুরা যদি তাদের ঘর সামলায়, তবে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, মুসলমানরাও তাদের প্রাচীন উদার সংস্কৃতির যথাযোগ্য উত্তরাধিকারী হিসাবেই এ ডাকে সাড়া দেবে। এ ব্যাপারে চাবিকাঠি আছে হিন্দুদের হাতে। দুর্বলতা এবং ভীরুতাকে আমাদের বর্জন করতে হবে। আমাদের হয়ে উঠতে হবে বিশ্বাস করার উপযুক্ত সাহসী এবং তা হলেই সব শুধরে যাবে।

॥ উনচল্লিশ ॥

অস্পৃশ্যতার অভিশাপ

হিন্দুধর্মের ভিতর আজ এক দুরপনেয় কলঙ্ক কালিমা বিরাজমান। বহু পূর্ব হতে যে এই কলঙ্ক আমাদের উপর আরোপিত হয়েছে একথা বিশ্বাস করতে আমি অপারগ। যখন আমরা একেবারে নীচে পড়ে গিয়েছিলাম, আমার বোধ হয় যে তখনই আমাদের ভিতরে এই জঘন্য ও দুঃখপ্রদ 'অস্পৃশ্যতা'র মনোভাব এসেছিল। এ পাপ একেবারে আমাদের আষ্টেপৃষ্ঠে লেগে আছে। আমার মনে হয়, এ যেন আমাদের প্রতি এক অভিশাপ এবং আমাদের উপর যতদিন এ অভিশাপ থাকবে ততদিন পর্যন্ত যেসব দুঃখ এই পবিত্র দেশ ভোগ করবে, আমার মতে সে সমস্ত হবে আমাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত অমার্জনীয় অপরাধসমূহের উপযুক্ত সাজা।

হিন্দুধর্মে যে ভাবে আজকাল অস্পৃশ্যতাকে মানা হয়, আমার মতে তাকে মানুষ ও ঈশ্বরের প্রতি পাপাচরণ বলে অভিহিত করা উচিত। এইজন্য এ হচ্ছে ঠিক বিষের মত এবং ধীরে ধীরে এই বিষ হিন্দুধর্মের জীবনীশক্তিকে কোঁপরা করে ফেলছে। আমার মতে সমগ্রভাবে বিবেচনা করে দেখলে দেখা যাবে যে, হিন্দুশাস্ত্ররাজির সমর্থন এর পিছনে নেই। সুষ্ঠু ধরনের অস্পৃশ্যতা অবশ্য শাস্ত্রে আছে এবং প্রত্যেক ধর্মেই এরকম পাওয়া যায়। এ হচ্ছে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার নীতি। অনন্তকাল পর্যন্ত এ থাকবে। তবে ভারতে যে ভাবে আজকাল আমরা অস্পৃশ্যতা মানছি, সে এক বীভৎস ব্যাপার এবং বিভিন্ন প্রদেশ এমন কি বিভিন্ন জেলায় এর বিভিন্ন রকমের রূপ। অস্পৃশ্য এবং স্পৃশ্য উভয়েরই অধোগতি ঘটেছে এর জন্য। প্রায় চল্লিশ কোটি মানুষের আত্মবিকাশ এর ফলে রুদ্ধ হয়ে গেছে। জীবনের

প্রাথমিক সুখস্থবিধাটুকু থেকেও তারা বঞ্চিত। স্থতরাং যত শীঘ্র এই প্রথার অবসান ঘটে, ততই হিন্দুধর্মের মঙ্গল, ভারতের মঙ্গল এবং বোধ হয় সমগ্র মানবসমাজের পক্ষেই তা মঙ্গলজনক।

ভারতের এক-পঞ্চমাংশকে যদি আমরা চিরদাসত্বে আবদ্ধ রাখতে চাই এবং ইচ্ছা করে যদি তাদের জাতীয় সংস্কৃতির ফল ভোগ করতে না দিই, তবে স্বরাজ শব্দটির কোন অর্থ হয় না। এই বিরাট আত্মশুদ্ধির আন্দোলনে আমরা ঈশ্বরের সহায়তা কামনা করছি আর তাঁর সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে যার বেশী প্রয়োজন, তাকেই মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করছি। নিজেরা অমানুষ হয়ে আমরা ভগবানের সিংহাসনের সামনে দাঁড়িয়ে অপরের অমানুষিকতার হাত থেকে আমাদের বাঁচানোর জন্য তাঁকে অনুরোধ জানাতে পারি না।

অস্পৃশ্যতা যে অতি প্রাচীন প্রথা একথা কেউ অস্বীকার করে না। তবে এ যদি অন্যায় হয়, তবে প্রাচীনত্বের দোহাই দিয়ে একে সমর্থন করা চলতে পারে না। অস্পৃশ্যরা যদি আর্যদের সমাজ-বহির্ভূত হয়, তবে সেই সমাজের পক্ষে এ আরও অমঙ্গলজনক কথা। আর্যরা তাদের প্রগতির পথে কোন সম্প্রদায়বিশেষকে সাজা দেবার জন্য তাদের সমাজ-বহির্ভূত করে দিয়ে থাকলেও তাদের পূর্বপুরুষেরা যে কারণে দণ্ডিত হয়েছিলেন, সে সম্বন্ধে বিচার বিবেচনা না করেই কেন যে তাদের ঘাড়েও সেই শাস্তি আরোপিত হবে তার কোন কারণ নেই। অস্পৃশ্যদের মধ্যেও ছুঁৎমার্গের প্রচলন থাকায় শুধু এই সত্য প্রমাণিত হয় যে, কুপ্রথাকে সীমাবদ্ধ করে রাখা যায় না। এর সর্বনাশা ফল সর্বব্যাপী। কি জন্য যে সংস্কৃতিসম্পন্ন হিন্দুসমাজের ত্বরান্বিত হয়ে নিজেকে এর থেকে বিমুক্ত করা উচিত অস্পৃশ্যদের মধ্যে ছুঁৎমার্গ প্রচলিত থাকা হচ্ছে তার আর একটি কারণ। জীবহত্যা করা এবং রক্ত, মাংস, অস্থি বা মলমূত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করার জন্যই যদি তারা অস্পৃশ্য হয়ে থাকে, তবে প্রত্যেক চিকিৎসক এবং সেবিকারই অস্পৃশ্য হওয়া উচিত। এই অনুযায়ী প্রত্যেক খ্রীষ্টান, মুসলমান বা তথাকথিত উচ্চবর্ণের হিন্দু আহারের জন্য বা দেবালয়ে বলি দেবার জন্য যারা জীবহত্যা করে, তারা সবাই অস্পৃশ্য। কসাইখানা, তাড়ির দোকান বা বারবনিতালয়গুলি সাধারণত পৃথক থাকে বা এদের পৃথক রাখা উচিত। তা বলে অস্পৃশ্যদেরও এমনি আলাদা রাখার স্বপক্ষে যদি আমরা এই যুক্তি দেখাই তাহলে সে হবে চূড়ান্ত পক্ষপাতিত্বের

নমুনা। কসাইখানা বা তাড়ির দোকান পৃথক থাকে, থাকা উচিতও। তবে কসাই বা শুঁড়িকে পৃথক রাখা হয় না।

বহু বৎসর যাবৎ আমার একথা মনে হয়েছে যে যেদেশে ঝাড়ুদারদের সমাজের এক পৃথক শ্রেণী বিবেচনা করা হয় সেদেশে কোন বনিয়াদী গলদ আছে। এই অপরিহার্য সাফাই-এর কাজকে সর্ব প্রথম কে সর্বনিম্ন স্তর নির্ধারিত করেন তার কোন ঐতিহাসিক বিবরণ নেই। তিনি যে-ই হন না কেন আমাদের কোন কল্যাণ সাধন করেননি। ছেলেবেলা থেকেই আমাদের মনে এই স্থায়ী ছাপ লাগা দরকার যে আমরা সকলেই ঝাড়ুদার। একথার যথার্থতা যাঁরা উপলব্ধি করেন তাঁদের পক্ষে এ রকম মনে করার সহজতম পন্থা হল ঝাড়ুদার হিসাবে শরীর শ্রম আরম্ভ করা। এইভাবে বুদ্ধিমত্ত হয়ে সাফাই-এর কাজ শুরু করলে মানুষে মানুষে অভিন্নতার বোধ সৃষ্টিতে সাহায্য হবে।

প্রারম্ভে অস্পৃশ্যতা ছিল পরিচ্ছন্নতার নীতি এবং ভারত ছাড়া বিশ্বের আর সব জায়গাতেও এখনও তাই আছে। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি বা দ্রব্য অপরিষ্কার থাকলে তাকে অস্পৃশ্য বলা হয়; কিন্তু সেই ব্যক্তি বা দ্রব্য অপরিচ্ছন্নতামুক্ত হওয়া মাত্র আর অস্পৃশ্য থাকে না। সুতরাং বেতনভুক ভাঙ্গীই হোক বা অবৈতনিক মাতাই হোন তাঁরা তাদের অপরিষ্কার কাজের পর, নিজেদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না করা পর্যন্ত অপরিষ্কারই থেকে যান। ভাঙ্গীকে তাই চিরকালের জন্য অস্পৃশ্য বিবেচনা না করে, তাকে ভাইয়ের মত ভেবে, সমাজের জন্য অপরিষ্কার কাজ করার পর তাকে পরিষ্কার হবার সুযোগ দিলে বা তাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হতে বাধ্য করলে, সমাজের যে কোন অন্য সদস্যের মত তাকে গ্রহণ করা উচিত।

॥ চল্লিশ ॥

আর্থিক বনাম নৈতিক প্রগতি

আর্থিক উন্নতির সঙ্গে কি প্রকৃত উন্নতির সংঘাত বাধে? আমি ধরে নিচ্ছি যে, আর্থিক প্রগতির অর্থ হচ্ছে অপরিমিত আধিভৌতিক উন্নতি ও প্রকৃত উন্নতির অর্থ হচ্ছে আমাদের শাশ্বত বৃত্তিগুলির ক্রমোন্নতি। বিষয়টিকে তাই এইভাবে

বলা যেতে পারে যে, নৈতিক প্রগতি কি আধিভৌতিক প্রগতির সঙ্গে সমান তালে চলতে পারে না? আমি অবশ্য জানি যে, আমাদের বর্তমান সমস্যার তুলনায় ও বিষয়টি ব্যাপকতর। তবে সাহস করে আমি একথা বলতে পারি যে, ক্ষুদ্রতর কিছুর ভিত্তিস্থাপনাকালে আমাদের দৃষ্টিপথে বৃহত্তর একটা কিছুই বিরাজিত থাকে। কারণ, বিজ্ঞানের প্রগতির ফলে আমরা জানি যে, আমাদের এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে শাশ্বত শান্তি বা বিরাম বলে কিছুই নেই। তাই যদিও আধিভৌতিক প্রগতি এবং নৈতিক উন্নতির ভিতর সংঘাত না বাধে, তবুও নৈতিক উন্নতির তুলনায় আধিভৌতিক উন্নতিরই অধিক উৎকর্ষ সাধিত হবে। বৃহত্তর বিষয়বস্তুর পক্ষ সমর্থনে অক্ষম কেউ কেউ যেমন এলোমেলোভাবে সময় সময় নিজেদের কথা পেশ করেন, তেমনভাবে আমরা সন্তুষ্টি লাভ করতে পারি না। পরলোকগত স্যার উইলিয়ম উইলসন হাণ্টার-বর্ণিত অর্দ্ধাশনে জীবনযাপনকারী ত্রিশ কোটি ভারতবাসীর প্রত্যক্ষ উদাহরণ দেখে তাঁরা বোধ হয় বিচলিত হয়ে পড়েন। তাঁদের বক্তব্য হচ্ছে এই যে, এদের নৈতিক উন্নতির কথা চিন্তা করা বা বলার আগে, এদের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাতে হবে। তাঁরা বলেন যে, এইজন্য নৈতিক উন্নতির বদলে আধিভৌতিক প্রগতির উপর জোর দেওয়া হয়। আর তার পরই একটা মস্ত লাফ মারা হয় ও বলা হয় যে, ত্রিশ কোটির বেলায় যে কথা খাটে সমগ্র বিশ্বের বেলায়ও সে কথা খাটবে। তাঁরা ভুলে যান যে, মামলা ঘোরালো হলে আইনও জটিল হয়। এই অনুমান যে কতখানি অবাস্তব, তা বলা আমার পক্ষে বাহুল্য মাত্র। অসহনীয় দারিদ্র্যের চাপে নৈতিক অবনতি ছাড়া যে অন্য কিছু আর আসতে পারে না, এমন কথা কেউ কখনও বলেনি। প্রত্যেক মানুষেরই বাঁচার অধিকার আছে, আর তাই নিজের অন্নবস্ত্র এবং বাসস্থানের জোগাড় করারও তার অধিকার আছে। তবে এই সামান্য কাজটুকুর জন্য অর্থনীতিবিদ বা তাদের আইনকানুনের সাহায্য নেবার প্রয়োজন নেই।

বিশ্বের যাবতীয় ধর্মগ্রন্থেই এই উপদেশ প্রতিধ্বনিত হয়েছে যে, "আগামীকালের জন্য ভাবনা করো না।" জীবিকা অর্জন করা, যে কোন সুসংগঠিত সমাজে পৃথিবীর সবচেয়ে সহজ কাজ মনে হয় বা হওয়াই বিধেয়। বস্তুত কোটিপতিদের সংখ্যা দ্বারা নয়, জনসাধারণের মধ্যে অনশনের অপ্রতুলতা দ্বারা একটি দেশের সুসংবদ্ধতা নিরূপিত হয়। এখন বিচার্য বিষয় হচ্ছে এই

যে, আধিভৌতিক প্রগতির অর্থ হচ্ছে নৈতিক উন্নতি—এই কথাটি বিশ্বজনীন নীতি হিসাবে গ্রহণযোগ্য কি না।

কয়েকটি উদাহরণ নিয়ে দেখা যাক। ঐহজাগতিক বিভবে রোম যখন অতীব সমৃদ্ধিশালী তখনই তার নৈতিক অধঃপতন ঘটল। মিশর এবং বোধ হয় যে সমস্ত দেশের ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায়, তাদের বেশীর ভাগেরই অনুরূপ অবস্থা হয়। শ্রীকৃষ্ণের বংশধর এবং আত্মীয়রা যখন ধনকুবের তখনই তাঁদের পতন হয়। রক্‌ফেলার বা কার্ণেগী ইত্যাদির নৈতিকতা যে সাধারণ পর্যায়ের ছিল এ কথা আমরা অস্বীকার করি না, তবে সানন্দে আমরা তাঁদের একটু আলগাভাবেই বিচার করে থাকি। আমার এ কথার অর্থ হচ্ছে এই যে তাঁদের কাছে পরিপূর্ণ নৈতিক নিরিখ আমরা আশা করতে পারি না। তাঁদের কাছে আধিভৌতিক উন্নতির অর্থ সব সময় নৈতিক উন্নতি নয়। দক্ষিণ আফ্রিকায়, যেখানে খুব ঘনিষ্ঠভাবে আমার সহস্র সহস্র স্বদেশবাসীর সঙ্গে মেলামেশা করার সুযোগ আমি পেয়েছিলাম, আমি লক্ষ্য করেছি যে, যেখানে যত প্রাচুর্য্য সেখানে তত নৈতিক ভ্রষ্টাচার। বেশী কথা কি, আমাদের ধনিকবর্গ দরিদ্রদের মত নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধরূপ নৈতিক সংগ্রামে অংশগ্রহণ করার জন্য এগিয়ে আসেননি। ধনীদের আত্মসম্মানে গরীবদের মত অত আঘাত লাগেনি। বিপদের আশঙ্কা না থাকলে আমাদের আশেপাশের লোকদের মধ্যে থেকে আমি দেখাতে পারতাম যে, কেমনভাবে ধনসম্পদ থাকায় সত্যকার উন্নতির ব্যাঘাত হয়। সাহস করে আমি একথা বলতে পারি যে, অর্থনীতির নিয়মকানুনের ব্যাপারে এ বিষয়ে অনেক আধুনিক পাঠ্যপুস্তকের চেয়ে দুনিয়ার ধর্মগ্রন্থসমূহ অধিকতর নিরাপদ এবং প্রামাণ্য। আজ যে প্রশ্ন আমরা নিজেদের করছি তা মোটেই নূতন নয়। দুই সহস্র বৎসর পূর্বে একথা যিশুকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। সেণ্ট মার্ক দৃশ্যটির পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা দিয়েছেন। গম্ভীর হয়ে যিশু উপবিষ্ট। চোখে তাঁর স্থির-সঙ্কল্পের ছবি। পরকাল সম্বন্ধে তিনি আলোচনা করছেন। চারিধারের দুনিয়া সম্বন্ধে তিনি সচেতন। সে সময়কার শ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ তিনি। সময় ও ব্যবধানের মিতব্যয়িতায় তিনি সাফল্য অর্জন করেছিলেন এবং তিনি উঠেছিলেন এ সবের উর্দ্ধে। এই অনুকূল পরিস্থিতিতে একজন তাঁর কাছে দৌড়ে এসে নতজানু হয়ে বসে পড়ল এবং জিজ্ঞাসা করল, 'দয়ালু প্রভু, কি করলে আমি শাশ্বত সুখ পেতে পারি?' যিশু তাকে বলছেন, 'আমাকে

দয়ালু বলছ কেন তুমি ? সেই এক ঈশ্বর ছাড়া দয়ালু আর কেউ নেই। তাঁর আজ্ঞা তুমি জান। অধর্মাচার কোরো না। জীবহত্যা কোরো না, চুরি কোরো না এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না। কাউকে প্রতারিত কোরো না এবং নিজের মাতাপিতাকে সম্মান দিও।' এর জবাবে লোকটি তাঁকে বলল, 'প্রভু, আমার যৌবনকাল থেকেই আমি এসব মেনে চলছি।' তখন যিশু তার দিকে সপ্রেম দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, 'একটি জিনিসের অপ্রতুলতা তোমার মধ্যে আছে। তুমি ঘরে ফিরে গিয়ে তোমার যা কিছু আছে সব বিক্রী করে বিক্রয়লব্ধ অর্থ দরিদ্রদের দান কর এবং তাহলে স্বর্গে গিয়ে তুমি সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে। ফিরে এসে দুঃখ সহন কর আর আমাকে অনুসরণ কর।' এই কথায় বিষণ্ণ হয়ে লোকটি চলে গেল, কারণ সে ছিল প্রভূত ধনসম্পদের অধিকারী। চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করে যিশু তাঁর শিষ্যদের লক্ষ্য করে বললেন : 'ঈশ্বরের রাজ্যে ধনীরা কদাচিৎ প্রবেশ করতে পারে।' তাঁর শিষ্যবৃন্দ এ কথায় আশ্চর্যান্বিত হল, কিন্তু যিশু এর জবাব প্রসঙ্গে পুনরায় বললেন : 'বৎসগণ, আর্থিক সম্পদের শ্রেষ্ঠতায় যারা আস্থাবান তাদের ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা কঠিন। ঈশ্বরের রাজ্যে ধনীর প্রবেশ করার চেয়ে উটের পক্ষে বরং সুঁচের ফুটো দিয়ে গলে যাওয়া সহজ।' ইংরেজী সাহিত্যে অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণিত জীবনের শাশ্বত নীতির বর্ণনার এ এক অভিনব দৃষ্টান্ত। আজ আমরা যেমন অবিশ্বাস ভরে মাথা নাড়ি, তাঁর শিষ্যরাও সেইরকম করেছিল। আমাদেরই মত তাঁকে তারা বলেছিল : 'কিন্তু দেখুন, বাস্তব জীবনে এ নীতি কেমন অকার্যকরী। আমরা যদি সব বিক্রী করে দি, আর যদি কিছুই আমাদের না থাকে, তবে ক্ষুন্নিবৃত্তি করার মতও কিছু আমাদের থাকবে না। অর্থ না থাকলে আমরা পরিমিত পরিমাণেও ধর্মাচারী হতে পারি না।' সুতরাং ব্যাপারটা দাঁড়াল এইরকম : খুব আশ্চর্যান্বিত হয়ে তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল : 'তাহলে ত্রাণ পেতে পারে কে?' তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করে যিশু বললেন : 'মানুষের পক্ষে এ অসম্ভব ; কিন্তু ভগবানের কাছে নয়, কারণ তাঁর পক্ষে সবই সম্ভব।' তার পর পিটার তাঁকে বলতে লাগলেন : 'দেখুন আমরা সর্বস্ব ত্যাগ করে আপনার অনুসরণ করছি।' উত্তরে যিশু বললেন : 'প্রকৃতই আমি তোমাদের বলছি যে, এমন কেউ নেই যে আমার জন্য বা ধর্মের খাতিরে স্ত্রী, পুত্র, পরিজন, পিতা, মাতা, ভগ্নী বা জমিজমা এবং ঘর

ইত্যাদি পরিত্যাগ করেছে। পরলোকে তারা শাশ্বত সুখ পাবে বা এখনকার চেয়ে শতগুণে গৃহ, আত্মীয়, ভগ্নী, পিতা, মাতা, সন্তান-সন্ততি এবং জমিজমার সুখ ভোগ করতে পারবে এই আকাঙ্ক্ষায় তারা এসেছে। আজ যারা সবচেয়ে আগে আছে তারা হয়ত পিছনে পড়ে যাবে, আর যারা একেবারে পিছনে পড়ে আছে তারাই হয়ত থাকবে সর্বাগ্রে।' এ বিধান অনুসরণ করার ফল বা পুরস্কার (কথাটি যদি আপনার মনোমত বোধ হয়) হচ্ছে এই। অন্যান্য অহিন্দু ধর্মগ্রন্থ থেকে অনুরূপ অংশ উদ্ধৃত করার প্রয়োজন আমি বোধ করি না। যিশুবর্ণিত নীতির সমর্থনে আমাদের নিজেদের মুনি-ঋষিদের লেখা বাণী উদ্ধৃত করে, বা এমন কি বাইবেলের যে অংশটির প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি, তার চেয়েও কড়া তাঁদের কোন বাণী বা লেখা উদ্ধৃত করে, আমি আপনাদের অপমানিত করতে চাই না। আমাদের সামনে যে প্রশ্ন এসে দাঁড়িয়েছে সে বিষয়ে জগতের মহান উপদেশকবৃন্দের জীবনই বোধ হয় এই নীতি সমর্থনকারী সবচেয়ে প্রামাণ্য সাক্ষ্য। যিশু, মহম্মদ, বুদ্ধ, নানক, কবীর, চৈতন্য, শঙ্কর, দয়ানন্দ, রামকৃষ্ণ ইত্যাদির সহস্র সহস্র লোকের উপর অতুলনীয় প্রভাব ছিল এবং তাঁরা তাঁদের চরিত্র গঠন করেছিলেন। তাঁরা এ দুনিয়ায় এসেছিলেন বলে জগৎ ধন্য। আর স্বেচ্ছায় তাঁরা সবাই দারিদ্র্যকে বরণ করে নিয়েছিলেন।

আধুনিক বস্তুতান্ত্রিক উন্মত্ততাকে যতই আমরা আমাদের আদর্শ বলে মনে করছি, অবনতির পথে ততটাই আমরা নেমে যাচ্ছি, এই যদি আমার স্থির বিশ্বাস না হত তবে যে বিষয়টিকে বোঝানোর জন্য আমি এত চেষ্টা করছি, তা করতাম না। আমার ধারণা এই যে, যে ধরনের অর্থনৈতিক উন্নতির কথা আমি বলেছি, সত্যকার উন্নতির পথে তা পরিপন্থীস্বরূপ। তাই পুরাকালের আদর্শ ছিল সম্পদ বৃদ্ধির প্রচেষ্টাকে সংযত করা। এর ফলে যাবতীয় আধিভৌতিক কামনা-বাসনার পরিসমাপ্তি হয়ে যায় না। বরাবরের মত আমাদের মধ্যে এমন অনেকে থাকবেন, ধনার্জনের প্রচেষ্টাকেই যাঁরা জীবনের লক্ষ্য করে তুলবেন। কিন্তু চিরকালই আমরা দেখে আসছি যে, এতে অদর্শচ্যুতি হয়। একটি মজার ব্যাপার এই যে, আমাদের মধ্যে প্রভূত বিত্তশালীরাও সময় সময় মনে করেন যে, স্বেচ্ছায় দরিদ্র্যকে বরণ করে নিলে তাঁরা ভাল করতেন। কেউ যে একই সঙ্গে ঈশ্বর এবং কুবেরের সেবা করতে পারে না, এ এক মূল্যবান অর্থনৈতিক তথ্য। আমাদের পথ বেছে নিতে

হবে। বস্তুতান্ত্রিকতার দানবের পদতলে পড়ে পাশ্চাত্য জাতিসমূহ আজ আর্তনাদ করছে। তাদের নৈতিক উন্নতি বন্ধ হয়ে গেছে। টাকা, আনা, পয়সা দিয়ে তারা তাদের উন্নতির পরিমাপ করে। আমেরিকার সম্পদ তাদের মাপকাঠি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমেরিকা অন্যান্য দেশের হিংসার পাত্র হয়ে উঠেছে। আমার বহু স্বদেশবাসীকে আমি বলতে শুনেছি যে, আমরা আমেরিকার মত সম্পদ অর্জন করব বটে, তবে তাদের সম্পদ অর্জনের পন্থাকে বর্জন করব। আমার মতে এ রকম প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। একসঙ্গে আমরা 'জ্ঞানী, শান্ত এবং ক্রোধোন্মত্ত' হতে পারি না। নৈতিক বলে দুনিয়ায় সর্বশ্রেষ্ঠ হতে নেতৃবৃন্দ আমাদের শিক্ষা দিন, এই আমি চাই। কথিত আছে যে, এক সময় আমাদের দেশ ঈশ্বরের বাসস্থান ছিল। যে দেশ কলকারখানার বিকট আওয়াজে এবং চিমনির ধোঁয়ায় ভরে গেছে এবং যে দেশের রাস্তাগুলিতে চলাচলে বাধা সৃষ্টিকারী এমন সব দ্রুতগতি যান্ত্রিক শকট চলে, যার অন্যমনস্ক যাত্রীসমূহ জানে না যে তারা কি চায় এবং পাথরের মত বাক্স-বন্দী করলে বা একেবারে অপরিচিত আগন্তুকদের মধ্যে পড়লেও যাদের মানসিক অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় না এবং যে দেশের এবং আগন্তুকবর্গ সম্ভব হলে পরস্পর পরস্পরকে স্থানচ্যুত করতে উদ্গ্রীব, সে দেশে ঈশ্বরের কথা ধারণাও করা যায় না। আধিভৌতিক প্রগতির প্রতীক বলেই এসবের আমি উল্লেখ করলাম। কিন্তু এতে এক কণাও সুখ আসে না। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ওয়ালেশ নিম্নলিখিত ভাষায় তাঁর সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

"অতীতের যে সমস্ত প্রাচীনতম তথ্যরাজি আমরা পেয়েছি, তাতে এই কথার যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় যে, নৈতিকতা সম্বন্ধে তৎকালীন সাধারণ ধারণা ও চিন্তাধারা, নৈতিকতার মান এবং এর ফলে উদ্ভূত আচার ব্যবহার, এখনকার চেয়ে কোন অংশে নিকৃষ্ট ছিল না।"

আর্থিক সমৃদ্ধির ফলে ইংরেজ জাতি যে অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে, এর পরে কয়েকটি অধ্যায়ে তিনি তা বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলেছেন: "সম্পদের এইরূপ অভাবনীয় সমৃদ্ধি হওয়ায় ও প্রকৃতিকে জয় করার ক্ষমতা বেড়ে যাওয়ার ফলে, আমাদের নতুন সভ্যতা ও অগভীর খ্রীষ্টীয় ধর্মবিশ্বাসের উপর মারাত্মক চাপ পড়েছে। এর ফলে বহুবিধ সামাজিক ব্যভিচার অভূতপূর্ব বিস্ময়কর গতিতে আমাদের মধ্যে এসে পড়েছে।" কেমনভাবে

নরনারী এবং শিশুর মৃতদেহের উপর কলকারখানাসমূহ গড়ে উঠেছে এবং কেমনভাবে দেশের অর্থসম্পদের সমৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক অবনতি ঘটেছে, এই তিনি এর পর দেখিয়েছেন। অপরিচ্ছন্নতা, আয়ুক্ষয়কারী বৃত্তি, ভেজাল দেওয়া, ঘুষ নেওয়া, জুয়া খেলা ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করে তিনি একথা প্রমাণ করেছেন। আর্থিক সমৃদ্ধির ফলে ন্যায় কি ভাবে পদদলিত হচ্ছে, পানাসক্তি এবং আত্মহত্যার ফলে মৃত্যুহার কেমনভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, কেমনভাবে অপরিণত অবস্থায় জন্মদোষসম্পন্ন শিশুর সংখ্যা বাড়ছে এবং বেশ্যাবৃত্তি একটি বিধিসম্মত প্রথা হয়ে দাঁড়াচ্ছে, এ সবই তিনি দেখিয়েছেন। নিম্নলিখিত অর্থব্যঞ্জক মন্তব্য সহকারে তিনি তাঁর বিশ্লেষণের পরিসমাপ্তি করেছেন ঃ

"সম্পদ এবং অবকাশের পরিণামের অপর দিকটি যে কি তা জানা যায় বিবাহ বিচ্ছেদের আদালতের কার্যবিবরণী থেকে। এ ছাড়া আমার একটি বন্ধু, লণ্ডনের বিলাসী সমাজে যাঁর যথেষ্ট যাতায়াত আছে, আমাকে বলেছিলেন যে লণ্ডন এবং মফঃস্বলে সময় সময় এমন সব বহু প্রকারের নৈশকালীন প্রমোদের ব্যবস্থা দেখা যায় যে, চরমতম ইন্দ্রিয়পরায়ণ সম্রাটদের রাজত্বকালীন ব্যবস্থাসমূহকেও সেগুলি ছাড়িয়ে যায়। যুদ্ধ সম্বন্ধেও আমার বলার কিছুই নেই। রোমান সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থানের পর থেকে কমবেশী এ অবশ্য চলেই আসছে, তবে বর্তমানে যাবতীয় সভ্যজাতিসমূহের নিঃসন্দেহেই যুদ্ধবিমুখতা দেখা দিয়েছে। কিন্তু যখন অস্ত্রশস্ত্রের বিরাট বোঝা এবং শান্তির স্বপক্ষের সদিচ্ছা-প্রণোদিত ঘোষণাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায়, তখন এই কথাই স্পস্ট প্রতীয়মান হয় যে, আদর্শ হিসাবে শাসক-সম্প্রদায়ের ভিতর নৈতিকতার লেশমাত্র নেই।"

ইংরেজদের আওতায় আমরা অনেক কিছু শিখেছি, তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে যথার্থ নৈতিকতার ব্যাপারে ব্রিটেনের কাছ থেকে আমাদের শেখার মত বিশেষ কিছু নেই। বস্তুতান্ত্রিকতার ব্যারামের ফলে ব্রিটেন যে সমস্ত পাপাচারের আকর হয়ে উঠেছে, সতর্ক না হলে আমরা সে সমস্তই আমাদের দেশে আমদানী করব। আমাদের সভ্যতা এবং নৈতিকতাকে আমরা যদি বজায় রাখি, অর্থাৎ গৌরবোজ্জ্বল অতীত নিয়ে গর্ব না করে, আমাদের নিজেদের জীবনে সেই প্রাচীন নৈতিক গৌরবকে ফুটিয়ে তুলি, তবেই আমরা ইংলণ্ড এবং ভারত উভয়েরই উপকার করব। শাসনকর্তা

যোগাড় করে দেয় বলে যদি আমরা তার অনুকরণ করি, তবে তারা এবং আমরা উভয়েই অপমান ভোগ করব। আদর্শের সম্বন্ধে বা সে আদর্শকে চূড়ান্তরূপে বাস্তবে পরিণত করা সম্বন্ধে আমাদের শঙ্কিত হবার প্রয়োজন নেই। খাঁটি আধ্যাত্মিক জাতি আমরা তখনই হব, যখন সোনার চেয়ে সত্য অধিক পরিমাণে আমাদের দেশে দৃষ্ট হবে, ক্ষমতা এবং সম্পদের জাঁকজমকের চেয়ে নির্ভীকতা বেশী হবে, এবং নিজের স্বার্থের চেয়ে বদান্যতার স্থান উর্ধ্বে হবে। আমাদের গৃহ, প্রাসাদ এবং মন্দিরগুলিকে আমরা বিভবের আওতা থেকে মুক্ত করে সেগুলিতে নৈতিকতার নৈসর্গিক ধর্মের প্রবর্তন করতে পারলে ব্যয়বহুল এক সেনাদলের ভার না বহন করেও আমরা যে কোন বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করতে পারব। আমরা প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্য এবং তাঁর পবিত্রতার অন্বেষণ করা শুরু করলে দেখব যে, সব কিছুই নিঃসন্দেহে তারপর পেয়ে যাব। এই হচ্ছে খাঁটি অর্থনীতি। আমরা সবাই যেন এ সঞ্চয় করতে পারি এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনে একে প্রয়োগ করতে পারি।

॥ একচল্লিশ ॥

প্রশাসনের সমস্যা সম্বন্ধে

পুঁজিপতি জমিদার তথাকথিত উচ্চবর্ণ এবং সর্বশেষে ইংরেজ শাসকগণ কর্তৃক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শোষণের কারণ দেশের দীন দরিদ্র ও অনগ্রসর অংশ যে পঙ্ককুণ্ডে পতিত হয়েছে তার থেকে তাদের উদ্ধার করার জন্য আগামী কয়েক বৎসর ভারতবর্ষকে বহুবিধ আইন কানুন পাশ করতে হবে বলে আমার মনে হয়। এই সব লোকেদের বর্তমানের দুঃখ দুর্দশা থেকে মুক্ত করতে হলে ভারতবর্ষের জাতীয় সরকারের ঐকান্তিক কর্তব্য হবে এদের অপেক্ষাকৃত অধিক মাত্রায় সুযোগ সুবিধা দিয়ে যে বোঝার চাপে তারা আজ পিষে মরছে তার হাত থেকে তাদের মুক্ত করা। আর ইংরেজ বা ভারতীয় নির্বিশেষে জমিদার ভূস্বামী ধনী বা অন্যান্য সুবিধাভোগী শ্রেণী যদি দেখেন যে তাঁদের প্রতি পক্ষপাত করা হচ্ছে তাহলে তাঁদের প্রতি আমার সহানুভূতি অবশ্য থাকবে কিন্তু সম্ভব হলেও তাঁদের কোন সাহায্য আমি বোধহয় করতে

পারব না। কারণ শোষিতদের উত্থানের জন্য জাতীয় সরকারের ঐ জাতীয় কর্মসূচিতে আমি তাঁদের সাহায্য চাইব। তাঁদের সহায়তা বিনা এই লোকগুলিকে পঙ্ককুণ্ড থেকে উদ্ধার করা যাবে না।

স্থতরাং এ হবে বিত্তবান ও সর্বহারাদের ভিতর সংগ্রাম। এতে ভয় পেলে জাতীয় সরকারের অস্তিত্ব সাকার হবে না। কারণ স্থবিধাভোগী সকল শ্রেণী যদি মূক জনসাধারণের বুকে পিস্তল উঁচিয়ে বলে যে, "আমাদের সম্পত্তি ও অধিকার রক্ষার নিশ্চয়তা না দিলে তোমাদের মনের মত সরকার হবে না," তাহলে জাতীয় সরকারের অস্তিত্ব নিরর্থক হয়ে পড়বে।

মন্ত্রীবর্গ

কংগ্রেস যদি জনসাধারণের প্রতিষ্ঠানরূপে তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে চায় তাহলে মন্ত্রীদের সাহেবস্থবোর মত জীবন যাপন করলে চলবে না এবং সরকারী কাজের জন্য যেসব সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায় ব্যক্তিগত প্রয়োজনে তা ব্যবহার করা উচিত হবে না।

স্বজনপোষণ

কোন উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হওয়ার অর্থ অধিকতর মর্যাদা বৃদ্ধির ভূমিকা অথবা সম্পূর্ণ মর্যাদাহানি—দুই-ই হতে পারে। সম্পূর্ণ মর্যাদাহানি যদি কাম্য না হয় তাহলে মন্ত্রীবর্গ ও পরিষদ সদস্যদের নিজ ব্যক্তিগত ও সার্বজনীক আচরণের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। তাঁদের হতে হবে সীজারের স্ত্রীর মত সকল সন্দেহের অতীত। নিজের বা নিজ আত্মীয় বন্ধুর জন্য কোন ব্যক্তিগত লাভ তাঁরা করবেন না। আত্মীয় বন্ধুরা যদি যোগ্যতম প্রার্থী হন এবং সরকারের কাছে তাঁরা যা পাবেন, তাঁদের বাজার দর যদি তার থেকে বেশী হয় একমাত্র তাহলেই তাঁরা কোন সরকারী চাকরী পেতে পারেন। কংগ্রেসী মন্ত্রী ও পরিষদ সদস্যদের নিজ কর্তব্য সম্পাদনে নির্ভীক হতে হবে। নিজের পদ বা আসন ছেড়ে দেবার জন্য তাঁরা সর্বদা প্রস্তুত থাকবেন। কংগ্রেসের মর্যাদা ও শক্তি বৃদ্ধির যোগ্যতা ছাড়া এইসব পদ বা আসনের অপর কোন মূল্য নেই। আর এর উভয়ই সম্পূর্ণভাবে নৈতিক—সার্বজনীন ও ব্যক্তিগত—নির্ভর বলে যে কোন নৈতিক ত্রুটি বিচ্যুতির অর্থ কংগ্রেসের ভিত্তিমূলে আঘাত।

অপরাধ ও শাস্তি

অহিংস-স্বাধীন ভারতে অপরাধ থাকলেও অপরাধী থাকবে না। তাদের শাস্তি দেওয়া হবে না। অপর যে কোন পীড়ার মত অপরাধও একটি ব্যাধি এবং এ হল প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার পরিণাম। সুতরাং খুন সহ যাবতীয় অপরাধকে ব্যাধি বিবেচনা করা হবে। তবে এরকম ভারতবর্ষ আদৌ কোন দিন মূর্ত হবে কি না, সে এক পৃথক প্রশ্ন।

স্বাধীন ভারতবর্ষে আমাদের কারাগারগুলি কেমন হবে? সব অপরাধীকেই রোগী বলে মনে করা হবে এবং কারাগারগুলি হবে হাসপাতাল যেখানে এই জাতীয় রোগীর চিকিৎসা ও নিরাময়-ব্যবস্থা থাকবে। অপরাধ করার আনন্দে কেউ অপরাধ করে না। এ হল ব্যাধিগ্রস্থ মনের লক্ষণ। এক একটি রোগের কারণ অনুসন্ধান করে তার নিরাকরণ করতে হবে। কারাগারগুলি হাসপাতালে পরিণত হলে এর জন্য বিরাট বিরাট হর্ম্যের প্রয়োজন পড়বে না। কোন দেশের পক্ষেই তার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। ভারতবর্ষের মত দরিদ্র দেশের পক্ষে তো নয়-ই। কিন্তু কারাগারের কর্মচারীদের দৃষ্টিভঙ্গী হাসপাতালের চিকিৎসক ও সেবিকাদের মত হওয়া উচিত। কয়েদীরা যেন বুঝতে পারেন যে কারাগারের কর্মচারীরা তাঁদের মিত্র। কর্মচারীরা তাঁদের মানসিক স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের সহায়তা করতে সেখানে আছেন, কয়েদীদের কোন রকমে উত্যক্ত করা তাঁদের উদ্দেশ্য নয়। জনপ্রিয় সরকারকে অবশ্য এই পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় আদেশ জারী করতে হবে তবে ইতঃমধ্যে কারাগারের কর্মচারীরাও সেখানকার বিধিব্যবস্থাকে মানবতার গুণমণ্ডিত করতে অনেক কিছু করতে পারেন। কয়েদীদের কর্তব্য কি?…তাঁদের আচরণ হবে আদর্শ। কারাগারের বিধান ভঙ্গ করা থেকে তাঁরা বিরত থাকবেন। তাঁদের যে কাজ করতে দেওয়া হয় মন প্রাণ দিয়ে তা করবেন। উদাহরণ স্বরূপ কয়েদীদের আহার্য তাঁরা নিজেরাই রান্না করে থাকেন। চাল ডাল ও অন্যান্য তরিতরকারী তাঁরা ভালভাবে ধুয়ে রাঁধবেন যাতে তাতে কোন রকম ধূলা বালি বা কাঁকর ময়লা না থাকে। কয়েদীদের কোন অভিযোগ থাকলে কর্তৃপক্ষের কাছে ভদ্রভাবে তা পেশ করবেন। নিজেদের ছোট্ট সমাজের গণ্ডির ভিতর তাঁরা এমনভাবে আচরণ করবেন যাতে কারাগারে প্রবেশ করার সময় তাঁরা যেমন ছিলেন তার চেয়ে ভাল হয়ে কারাগার ছেড়ে যেতে পারেন।

আইনের দ্বারা সংস্কার

লোকে মনে করে থাকেন যে কোন পাপের বিরুদ্ধে কোন আইন পাশ হলেই বুঝি আর কোন প্রয়াস বিনা সে পাপের মৃত্যু হবে। এর চেয়ে বড় আত্মপ্রতারণা আর হয় না। অজ্ঞ কিংবা মুষ্টিমেয় পাপমনা ব্যক্তিকে নিরস্ত করতে আইন কার্যকরী, কিন্তু বুদ্ধিমান ও সংগঠিত জনমত অথবা ধর্মের মুখোসধারী গোঁড়া সংখ্যাগুরুদের ইচ্ছার বিরোধী কোন আইন কখনও কার্যকরী হতে পারে না।

সর্বপ্রথমে দেখতে হবে যে জোর জবরদস্তি বা অসত্যের ছায়া মাত্র যেন না থাকে। আমার বিনম্র অভিমত এই যে এ যাবৎ জোর করে কোন যথার্থ সংস্কার সাধন করা যায়নি। কারণ জবরদস্তি আপাতদৃষ্টিতে সফল হচ্ছে বলে মনে হলেও এর ফলে বহুবিধ নূতন পাপের সৃষ্টি হয় এবং সেগুলি মূল সমস্যার চেয়েও অধিকতর সর্বনাশা।

আদালত

আইনজীবি ও আদালতের পাল্লায় যদি আমরা না পড়তাম এবং কোর্ট কাছারির চোরাবালির দিকে আমাদের আকর্ষণ ও আমাদের অসদ্বৃত্তি-সমূহকে প্রোৎসাহিত করার জন্য আড়কাঠির দল যদি না থাকত তাহলে আমরা আজকের চেয়ে অনেক সুখে জীবন কাটাতে পারতাম। ঘন ঘন যাঁরা আদালতে যাতায়াত করেন তাঁরা (তাঁদের মধ্যে যাঁরা খুব ভাল লোক তাঁরাও) জেনে রাখুন যে তাঁদের চতুর্দিকের পরিবেশ পুতিগন্ধময়। দুই পক্ষেই মিথ্যা সাক্ষ্যের জাল বিছান হয় এবং সাক্ষীরা অর্থের লোভে বা বন্ধুত্বের খাতিরে নিজেদের বিবেক পর্যন্ত বিক্রি করতে প্রস্তুত থাকেন।

আইনজীবির পেশার অধ্যাত্মকরণ করতে হলে যে কথা সর্বাগ্রে আপনাদের স্মরণ রাখতে হবে তা হল এই যে, যেকোন ভাবে আরও বেশী অর্থোপার্জন আপনাদের পেশার উদ্দেশ্য হবে না। দুর্ভাগ্যক্রমে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আজ এই চলেছে। আপনাদের পেশার লক্ষ্য হবে দেশের সেবা। পৃথিবীর সর্বদেশে এমন বহু প্রতিভাশালী ব্যবহারজীবির দৃষ্টান্ত আছে যাঁদের জীবন আত্মোৎসর্গের জলন্ত উদাহরণ। তাঁরা তাঁদের আইনের অদ্বিতীয় প্রতিভা সম্পূর্ণভাবে দেশের সেবাতেই উৎসর্গ করেছেন যদিও এর জন্য তাঁদের অসীম দারিদ্র্য বরণ করতে হয়েছে।…রাস্কিন তাঁর "আনটু দিস লাস্ট"

গ্রন্থে যে উপদেশ দিয়েছেন ব্যবহারজীবিরা তা পালন করতে পারেন। তিনি বলেছেন, "একজন ছুতার মিস্ত্রি যখন তার কাজের জন্য পনের শিলিং পায় কি না সন্দেহ তখন আইনজীবি কেন পনের পাউণ্ড চাইবেন?" সর্বত্র আইনজীবিরা অযৌক্তিক হারে পারিশ্রমিক দাবী করেন। ইংলণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ইত্যাদি সর্বত্র আমি দেখেছি যে আইনজীবিরা তাঁদের মক্কেলদের জন্য জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতে অসত্যের পোষকতা করেন। জনৈক প্রমুখ আইনজীবি এমন কি একথাও বলেছেন যে দোষী জানা সত্ত্বেও মক্কেলের সমর্থন করা আইনজীবির কর্তব্য। আমার মত ভিন্ন। আইনজীবির কর্তব্য সর্বদা বিচারকের সামনে সত্য তুলে ধরা, সত্যে উপনীত হতে তাঁকে সাহায্য করা। দোষীকে নির্দোষ প্রমাণ করার চেষ্টা করা আইনজীবির কর্তব্য নয়।

সামরিক ব্যয়

গত দুই পুরুষ কাল যাবৎ আমাদের রাষ্ট্রনায়কেরা ইংরেজের অধীনে যে বিপুল সামরিক ব্যয় হত তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করে এসেছেন। কিন্তু আজ রাজনৈতিক ক্রীতদাসের অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়া মাত্র আমাদের সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে ও প্রতিদিনই এ ব্যয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এর জন্য আমরা গর্বিত! আমাদের আইনসভাগুলিতে এর বিরুদ্ধে কেউ একটি কথাও বলেন না। যাই হক এই উন্মত্ততা ও পশ্চিমের এই জেল্লাদার অকিঞ্চিৎকর বস্তুর ব্যর্থ অনুকরণ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আমার এবং আরও অনেকের মনে কেন যেন এই আশা আছে যে ভারতবর্ষ এই মৃত্যু বিভীষিকার ঊর্ধ্বে উঠে নৈতিকতার সেই উত্তুঙ্গ শিখরে উপনীত হবে। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে আজ পর্যন্ত এই বত্রিশ বৎসর যাবৎ যতই অপূর্ণ হক না কেন একটানা অহিংসায় প্রশিক্ষণ নেবার জন্য যেখানে তার আসল স্থান।

নৌবাহিনী

নৌবাহিনী সম্বন্ধে আমি জানি না। তবে একথা আমি ভালভাবেই জানি যে ভবিষ্যতে ভারতের সেনাবাহিনী ভারতবর্ষকে পরাধীন রাখার জন্য ও অন্যান্য জাতির স্বাধীনতা হরণের জন্য নিয়োজিত ভাড়াটে সৈনিকদের দ্বারা গঠিত হবে না। ভবিষ্যতে ভারতে সেনাবাহিনীর সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস করা হবে এবং বাদবাকি যাঁরা থাকবেন তাঁরা মূলতঃ হবেন স্বেচ্ছাসেবক ও তাঁদের ভারতবর্ষের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কাজে লাগান হবে।
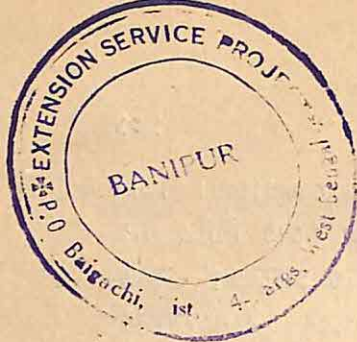
॥ বিয়াল্লিশ ॥

সংখ্যালঘু সমস্যা

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য যদি হিন্দুদের কাম্য হয় তাহলে সংখ্যালঘুদের বিশ্বাস করার সাহস দেখাতে হবে। অপর যে ব্যবস্থাই করা হক না কেন তার পরিণাম মধুর হবে না। লক্ষ লক্ষ জনসাধারণ নিশ্চয় বিধানসভা অথবা মিউনিসিপ্যালিটি ইত্যাদির সদস্য হতে চায় না। আর সত্যাগ্রহের যথোপযুক্ত ব্যবহার যদি আমরা শিখে থাকি তাহলে আমাদের জানা উচিত যে হিন্দু-মুসলমান অথবা আর যে কোন জাতি বা ধর্মেরই হন না কেন অযোগ্য শাসনকর্তার বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ প্রয়োগ করা যায় এবং প্রয়োগ করা উচিতও। পক্ষান্তরে হিন্দু বা মুসলমান যাই হক না কেন ন্যায়পরায়ণ শাসক ও জনপ্রতিনিধি সর্বদাই সমভাবে ভাল। সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির নিরাকরণ আমাদের কাম্য। সুতরাং সংখ্যাগুরুদের এর সূত্রপাত করতে হবে এবং নিজেদের সততা সম্বন্ধে সংখ্যালঘুদের মনে আস্থা সৃষ্টি করতে হবে। দুর্বলের কাছ থেকে কতটুকু সাড়া পাওয়া যাচ্ছে তার জন্য অপেক্ষা না করে অপেক্ষাকৃত বলশালী যখন এ বিষয়ে উদ্যোগী হয় তখনই কেবল একটা বিলি ব্যবস্থা সম্ভবপর হয়।

আমার মতে সরকারী বিভাগসমূহে নিয়োগের ব্যাপারে সাম্প্রদায়িক মনোভাবের প্রশ্রয় দেওয়া সুশাসনের দিক থেকে মারাত্মক হবে। কারণ প্রশাসনকে দক্ষ হতে হলে যোগ্যতম ব্যক্তির হাতে সর্বদা তা থাকা চাই। এখানে কখনও পক্ষপাত করা উচিত নয়। পাঁচজন ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ করার দরকার হলে কদাচ প্রতি সম্প্রদায় থেকে একজন করে নেওয়া সমীচীন নয়। যোগ্যতম পাঁচজনকে নিয়োগ করা উচিত তা তাঁদের সবাই মুসলমানই হন বা পার্শী। নিম্নতর পদগুলিতে লোক নেবার সময় প্রয়োজন বুঝলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সদস্যদের দ্বারা গঠিত কোন নিরপেক্ষ উপদেষ্টা মণ্ডল কর্তৃক তাদের নির্বাচন করা চলতে পারে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সংখ্যার অনুপাতে কখনই চাকরীর বাঁটোয়ারা হওয়া উচিত নয়। জাতীয় সরকারের হাতে শিক্ষায় অনগ্রসর সম্প্রদায়ের শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা

পাওয়ার অধিকার থাকবে। কিন্তু যারা দায়িত্বশীল সরকারী পদে অধিষ্ঠিত হতে ইচ্ছুক, তাদের অবশ্যই যথোপযুক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

স্বাধীন ভারতে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা রাখলে চলবে না, তবে সংখ্যালঘুদের উপর চাপ না দেওয়া যদি স্বাধীন শাসন-ব্যবস্থার অর্থ হয়, তবে সকল সম্প্রদায়ের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করতে হবে।

এ দেশে যারা জন্মগ্রহণ করে এবং লালিত পালিত হয় এবং অন্য কোন দেশের উপর যারা নির্ভর করে না—হিন্দুস্থান তাদের সকলের। সুতরাং যতখানি এ দেশ হিন্দুদের, ঠিক ততখানি আবার পার্শি, বেনে-ইস্রাইল, ভারতীয় খ্রীষ্টান, মুসলমান এবং অন্যান্য হিন্দুদের। স্বাধীন ভারত হিন্দুরাজ হবে না, এ হবে ভারতীয় রাজ, আর এর ভিত্তি কোনরকম ধর্মগত দল বা সম্প্রদায়ের সংখ্যাগরিষ্ঠতার উপর রচিত হবে না। জাতিধর্মনির্বিচারে সমস্ত জনসাধারণের প্রতিনিধি নিয়ে এ গঠিত হবে। অন্যান্য সম্প্রদায়গুলি মিলে হিন্দুদের সংখ্যালঘিষ্ঠে পর্যবসিত করতে পারে। তাঁরা নির্বাচিত হবেন তাঁদের প্রতিভা এবং সেবার দ্বারা। ধর্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং রাজনীতিতে এর স্থান হওয়া অনুচিত। বিদেশী শাসনের কৃত্রিম ফলস্বরূপ আজ আমরা ধর্মের ভিত্তিতে রচিত নানারকম অস্বাভাবিক বিভেদ দেখছি। বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত হলে বাজে আদর্শ এবং ধুয়ো আঁকড়ে থাকার জন্য আমাদের নিজেদেরই হাসি পাবে।

আমার ধর্মের প্রতি আমি একান্ত অনুগত। এরজন্য আমি প্রাণ দিতে প্রস্তুত। তবে এ আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। এ সম্বন্ধে রাষ্ট্রের কিছুই করণীয় নেই। রাষ্ট্র আপনাদের ধর্মনিরপেক্ষ কল্যাণ যথা স্বাস্থ্য যোগাযোগ বৈদেশিক সম্বন্ধ মুদ্রাব্যবস্থা ইত্যাদির দায়িত্ব নেবে। আপনার বা আমার ধর্ম সম্বন্ধে রাষ্ট্র কিছুই করবে না। এটা হল প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ব্যাপার।

ইউরোপীয় এবং ঈঙ্গ-ভারতীয়দের ভবিষ্যৎ

জনসাধারণের সঙ্গে নিজেদের একাত্মা করে ফেললে যে-কোন বিদেশী সানন্দে এখানে বসবাস করতে পারে। নিজেদের স্বার্থের রক্ষাকবচ নিয়ে যে সব বিদেশী এ দেশে থাকতে চায়, ভারত তাদের বরদাস্ত করতে পারে না। তার অর্থ হবে এই যে, তারা এখানে উঁচুদরের লোক হয়ে থাকতে চায় এবং সে অবস্থায় দ্বন্দ্ব অনিবার্য।

ইউরোপীয়দের সম্বন্ধে যদি একথা সত্য হয়, তবে ঈঙ্গ-ভারতীয় ইত্যাদি যাঁরা ইউরোপীয়-শ্রেণীভুক্ত হয়ে বিশেষ অধিকার পাওয়ার জন্য ইউরোপীয় চালচলন এবং আদব-কায়দা গ্রহণ করেছেন, তাঁদের পক্ষে এ আরও কত সত্য! এঁরা সকলে আজ পর্যন্ত যে-সমস্ত পক্ষপাতমূলক আচরণ পেয়ে এসেছেন তা বজায় থাকবে যদি আশা করেন, তবে ভবিষ্যতে তাঁরা নিজেদের এক অস্বস্তিকর অবস্থায় নিমজ্জিত দেখতে পাবেন। যে পক্ষপাতমূলক ব্যবহার পাওয়ার স্বপক্ষে কোন যুক্তি নেই এবং যা তাদের আত্মমর্যাদার পক্ষে অপমানজনক, তার ভার থেকে তাঁদের মুক্ত করলে তাঁদের বরং কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

তাঁদের রাজনীতিক অধিকার নষ্ট হবার আশঙ্কা নেই। তাঁদের বর্তমান সামাজিক অবস্থাই শুধু পরিবর্তিত হবে। ভারতীয় বংশমর্যাদা তাঁরা অস্বীকার করেন এবং ইউরোপীয়দের দ্বারাও অনাদৃত হন। তাঁদের অবস্থা দু' নৌকোয় পা দেবার মত। কখনও কখনও তাঁদের সঙ্গে আমার দেখা হয়। সামর্থ্যের অতিরিক্ত ব্যয় করতে গিয়ে এবং ইউরোপীয়দের মত বেশভূষা করে তাদের মত থাকতে গিয়ে তাঁরা একেবারে ফতুর হয়ে পড়েন। পথ বেছে নেবার জন্য আমি তাঁদের অনুরোধ জানিয়েছি এবং বিপুলসংখ্যক জনসাধারণের সঙ্গে তাঁদের ভাগ্যকে সখ্যসূত্রে গ্রথিত করতে বলেছি। অতীব সরল এবং এই অবস্থাকে হৃদয়ঙ্গম করার সৎসাহস এবং দূরদৃষ্টি যদি এই সমস্ত নরনারীর থাকে তবে তাঁরা নিজেদের উপকার করবেন, ভারতের মঙ্গল করবেন এবং যে নৈরাশ্যজনক অবস্থায় তাঁরা আছেন তার থেকে মুক্তি পাবেন। মূক ঈঙ্গ-ভারতীয়দের সামনে সবচেয়ে জরুরী সমস্যা হচ্ছে তাঁদের সামাজিক অবস্থা নির্দ্ধারিত করা। নিজেদের ভারতীয় মনে করা মাত্র এবং সেই রকমভাবে জীবনযাত্রা পরিচালনা করা মাত্র, তাঁরা বেঁচে যাবেন।

॥ তেতাল্লিশ ॥

সংবাদপত্র

সাংবাদিকতার একমেব লক্ষ্য হবে সেবা। সংবাদপত্র ও মুদ্রাযন্ত্রের অসীম শক্তি। তবে অনিয়ন্ত্রিত জলস্রোত যেমন মাঠ ঘাট প্লাবিত করে দেয় ও শস্যের ক্ষতিসাধন করে অনিয়ন্ত্রিত লেখনীও তেমনি ধ্বংস ছাড়া আর কিছু

করতে সক্ষম হয় না। অবশ্য সংবাদপত্রের উপর যদি বাহ্য নিয়ন্ত্রণ চাপিয়ে দেওয়া হয় তাহলে তা নিয়ন্ত্রণের অভাবের চেয়েও মারাত্মক প্রতীয়মান হতে পারে। নিয়ন্ত্রণ তখনই মঙ্গলজনক হয় যখন তা স্বতঃআরোপিত হয়। এ যুক্তিশৈলী যদি ঠিক হয় তবে পৃথিবীর কয়টি সংবাদপত্র এই মানদণ্ডের বিচারে উত্তীর্ণ হতে পারে? কিন্তু অপদার্থ সংবাদপত্রকে কে বাধা দেবে? আর কোন সংবাদপত্র সমাজের ক্ষতি করছে কিনা, তার বিচারই বা করবে কে? সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে মঙ্গলজনক ও অপদার্থ, ভাল এবং মন্দের মতই পাশাপাশি থাকবে এবং মানুষকে এর মধ্যে থেকে বেছে নিতে হবে।

আধুনিক সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে যে পল্লবগ্রাহীতা, একদেশদর্শীতা, ভ্রমসঙ্কুলতা এবং এমন কি অসাধুতার সৃষ্টি হয়েছে তার ফলে সৎ লোক, যাঁরা ন্যায়বিচার ছাড়া আর কোন কিছুর প্রতিষ্ঠা চান না, তাঁরা ক্রমাগত প্রতারিত হচ্ছেন।

আমার সম্মুখে কয়েকটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত ভীষণ ভীষণ সংবাদের বিবরণ রয়েছে। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের প্ররোচনা, প্রচণ্ড ভ্রমাত্মক সংবাদ এবং রাজনৈতিক হিংসার এমন উস্কানী যাতে মানুষ খুন করতে প্ররোচিত হয় ইত্যাদি এর মধ্যে পড়ে। সরকারের পক্ষে অবশ্য এই সব সংবাদপত্রের প্রতি দণ্ডবিধান করা বা দমনমূলক অর্ডিনান্স জারী করা সহজ। তবে এসবের দ্বারা সাময়িকভাবে কিছুটা সুরাহা হলেও সমস্যার সমাধান হয় না। পূর্বোক্ত পন্থায় এই সব রচনার লেখকদের হৃদয় পরিবর্তন তো সুদূরপরাহত ব্যাপার। সংবাদপত্রের প্রকাশ্য মাধ্যম তাঁদের নাগালের বাইরে চলে গেলে তাঁরা প্রায়ই গোপন প্রচারের আশ্রয় নেন।

এর আসল সমাধান হল সুস্থ জনমত সৃষ্টি করা যার পরিণামে জনসাধারণ বিষাক্ত সংবাদপত্রের পৃষ্ঠপোষকতা করা অস্বীকার করবে। আমাদের সংবাদপত্রসেবী সঙ্ঘও রয়েছে। এই সঙ্ঘ কেন এমন একটি বিভাগের সৃষ্টি করবে না যার কর্তব্য হবে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা অধ্যয়ন করে আপত্তিজনক রচনাবলী খুঁজে বার করা ও সংশ্লিষ্ট সম্পাদকদের দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করা। এই বিভাগের কাজ হবে দোষী সংবাদপত্রের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা এবং এই যোগাযোগের দ্বারা যদি বাঞ্ছিত সংস্কার প্রবর্তন করা না যায় তাহলে আপত্তিকর রচনাসমূহের প্রকাশ্য সমালোচনা করা। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা একটি মূল্যবান সম্পদ এবং কোন দেশই এ স্বাধীনতা বিসর্জন

দিতে পারে না। তবে খুব মৃদু ধরনের ছাড়া আর কোন রকম আইনগত বিধিনিষেধ যদি না থাকে (এবং থাকা উচিতও নয়) তাহলে আমি যে রকম বললাম সেই জাতীয় কোন আভ্যন্তরীণ বিধিনিষেধ আরোপের ব্যবস্থা অসম্ভব হওয়া উচিত নয় এবং এরকম ব্যবস্থা হলে তার প্রতিরোধ করাও বাঞ্ছনীয় নয়।

আমার মতে অনৈতিক বিজ্ঞাপনের সহায়তায়···সংবাদপত্র পরিচালনা অন্যায়। আমি বিশ্বাস করি যে আদৌ বিজ্ঞাপন নিতে হয় তাহলে সংবাদ-পত্রের মালিক ও সম্পাদকেরা স্বয়ং সেগুলিকে কঠোরভাবে পরীক্ষা (Censor) করার পর কেবল কল্যাণজনক বিজ্ঞাপনসমূহকে গ্রহণ করবেন। ···অনৈতিক বিজ্ঞাপনের কুপ্রভাব এমন কি সম্ভ্রান্ত অভিধায় পরিচিত সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকাকে গ্রাস করছে। সংবাদপত্রের মালিক ও সম্পাদকদের বিবেক-বুদ্ধিকে সুসংস্কৃত করে এই পাপের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। আমার মত অপেশাদার সম্পাদকের প্রভাবে তাঁদের বিবেক জাগ্রত হবে না। ক্রমবর্ধমান এই পাপ সম্বন্ধে তাঁরা স্বয়ং যখন সচেতন হবেন অথবা জনসাধারণের প্রতিনিধি স্বরূপ কোন সরকার যখন জনগণের নৈতিক স্বাস্থ্যের খাতিরে এই জাতীয় নিয়ন্ত্রণ তাঁদের উপর চাপিয়ে দেবে তখন তাঁদের বিবেক-বোধ উদ্রিক্ত হবে।

আমার বক্তব্য হল বিজ্ঞাপনের সত্যতা যাচাই করা। জনসাধারণের অভ্যাস হল···বই বা সংবাদপত্রে ছাপা সব কিছুকে বেদবাক্য জ্ঞান করা। সুতরাং বিজ্ঞাপন গ্রহণ করার পূর্বে অত্যন্ত সতর্ক হওয়া উচিত। অসত্য অতীব বিপজ্জনক।

॥ চুয়াল্লিশ ॥

শান্তিসেনা

এর সদস্যরা (শান্তি সৈনিক) বিশেষতঃ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিবারণের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করবেন। আমার মনে এই পরিকল্পনা ছিল যে এই ধরনের শান্তিসেনা গঠিত হলে পুলিশ এমন কি সৈন্যবাহিনীরও আর প্রয়োজন থাকবে না। একথা খুব উচ্চাশার পরিচায়ক মনে হতে পারে।

এর পরিপূর্তি সম্ভব নাও হতে পারে। তবে কংগ্রেসকে যদি তার অহিংস সংগ্রামে জয়ী হতে হয় তবে এই জাতীয় পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ উপায়ে সামলাবার ক্ষমতা তাকে গড়ে তুলতে হবে।

তাহলে এবার দেখা যাক যে প্রস্তাবিত শান্তিসেনার সদস্যদের কি কি গুণ থাকা দরকার।

(১) অহিংসায় তাঁর জীবন্ত বিশ্বাস থাকা চাই। ঈশ্বরের উপর পরিপূর্ণ আস্থা ছাড়া এ সম্ভব নয়। ভগবানের কৃপা এবং শক্তি ছাড়া কোন অহিংস ব্যক্তি কিছুই করতে পারেন না। ঈশ্বরানুগ্রহ ব্যতিরেকে তিনি ক্রোধ ভয় এবং প্রতিহিংসা বৃত্তিশূন্য হয়ে মরতে পারবেন না। ঈশ্বর সকলের হৃদয়ে বিরাজমান এবং তাই তাঁর উপস্থিতিতে ভয়ের কোন কারণ নেই—এই বিশ্বাস থেকে পূর্বোক্ত সাহসের জন্ম হয়। ঈশ্বরের সর্বব্যাপী অস্তিত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানের অর্থ হচ্ছে তথাকথিত বিরোধী পক্ষ বা গুণ্ডাদের জীবনকেও সম্মান করা। মানুষের ভিতরকার পশু স্বভাব যখন প্রবল হয়ে ওঠে তখন তার ক্রোধের উপশম করার জন্য পূর্বোক্ত পদ্ধতি খুবই সহায়ক হয়।

(২) শান্তিদূত পৃথিবীর সকল ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধাশীল হবেন। অর্থাৎ তিনি যদি হিন্দু হন তাহলে ভারতের অন্যান্য ধর্মমতকেও তিনি শ্রদ্ধা করবেন। সুতরাং তাঁকে এদেশের বিভিন্ন ধর্মের মূলসূত্রগুলি জানতে হবে।

(৩) সাধারণতঃ শান্তি স্থাপনা করার এই কাজ স্থানীয় লোকদের পক্ষে নিজ নিজ এলাকাতেই করা সহজ।

(৪) এককভাবে বা দলবদ্ধ হয়ে একাজ করা যায়। সুতরাং কেউ যেন সঙ্গী সাথীদের জন্য অপেক্ষা না করেন। তবে নিজেদের পাড়ায় সঙ্গী সাথী জুটাতে চাওয়া স্বাভাবিক এবং এইভাবে সঙ্গী সাথী জুটিয়ে শান্তিসৈনিকের একটি দল খাড়া করার চেষ্টা অবশ্য করতে হবে।

(৫) শান্তিদূত নিজের পাড়া বা কর্মক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সেবাকার্য দ্বারা জনসংযোগ করতে থাকবেন। এতে লাভ হবে এই যে কোন বিসদৃশ পরিস্থিতির উদ্ভব হলে দাঙ্গাকারী জনতা তাঁকে একেবারে অপরিচিত আগন্তুক সন্দেহভাজন বা অবাঞ্ছিত ব্যক্তি বলে মনে করবে না।

(৬) একথা বলাই বাহুল্য যে শান্তিসৈনিকের চরিত্র সন্দেহাতীত হবে এবং পক্ষপাতহীন আচরণের জন্য তাঁর খ্যাতি থাকা চাই।

(৭) সাধারণতঃ বিপদ আসার পূর্বে তার আভাস পাওয়া যায়। এই

রকম খবর পাওয়া গেলে শান্তিসৈনিক আগুন লাগা পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন না। পূর্ব থেকেই তিনি অবস্থা আয়ত্তে আনার জন্য লেগে পড়বেন।

(৮) শান্তিসেনার আন্দোলনের প্রসার ঘটলে এর জন্য কয়েকজন সর্বক্ষণের কর্মী থাকা ভাল, তবে এ একেবারে অপরিহার্য নয়। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে যথাসম্ভব অধিক সংখ্যক সৎ নরনারীর সমাবেশ করা। এটা তখনই সম্ভব হতে পারে যখন জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে এ কাজের জন্য স্বেচ্ছাসেবক পাওয়া যাবে। নিজেদের কাজ নিয়মিতভাবে করার সঙ্গে সঙ্গে এঁরা অবসর সময়ে নিজ নিজ এলাকার নরনারীদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করবেন। অথবা অন্যভাবেও এঁরা শান্তিসৈনিকের পক্ষে প্রয়োজনীয় যোগ্যতাবলী অর্জন করতে পারেন।

(৯) প্রস্তাবিত শান্তিসেনার একটা নির্দিষ্ট পোশাক থাকা দরকার; তাহলে প্রয়োজনের সময় কোন অসুবিধা ছাড়াই এঁদের চিনে বার করা যাবে।

এগুলি হচ্ছে সাধারণ ধরনের সুপারিশ। এর ভিত্তিতে প্রত্যেকটি কেন্দ্র নিজেদের গঠনতন্ত্র তৈরী করে নিতে পারেন।

অহিংস স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে……চরিত্র বা আত্মার শক্তিই সবচেয়ে বড় কথা এবং শারীরিক শক্তির স্থান হবে গৌণ। এ রকম লোক অধিক সংখ্যায় পাওয়া মুশকিল। এইজন্য অহিংস বাহিনীকে কার্যকুশল হতে হলে সংখ্যায় অল্প হতে হবে। এর সদস্যরা সর্বত্র ছড়িয়ে থাকতে পারেন। প্রতিটি গ্রাম বা পাড়ায় এক এক জন শান্তিসৈনিক থাকতে পারেন। তবে তাঁরা একে অপরকে ভাল করে চিনবেন। প্রত্যেকটি দল নিজের নায়ক বেছে নেবেন। শান্তিসৈনিকের দলে অবশ্য প্রতিটি সদস্যই সমান মর্যাদাসম্পন্ন। তবে সকলেই যেখানে একরকম কাজে নিযুক্ত সেখানে কোন একজনের নেতৃত্বে বাকী সকলে কাজ না করলে কাজের ক্ষতি হয়। কোন এলাকায় দুই বা তার চেয়ে বেশী শান্তিদল থাকলে তার নেতারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সাধারণ কর্মসূচী গ্রহণ করবেন।

আখড়া ইত্যাদিতে যত রকমের শরীর চর্চা হয়, তার সবটুকু এদের প্রয়োজনে না লাগলেও কিছু কিছু কাজে লাগবে।

তবে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের ভিতর একটি বিষয়ে ঐক্য থাকা

চাই—ঈশ্বরের উপর তাঁদের যেন অবিচল আস্থা থাকে। তিনিই একমাত্র সঙ্গী ও কর্মকর্তা। তাঁর উপর বিশ্বাস না থাকলে এই সব শান্তিসৈনিকের দল নিষ্প্রাণ হয়ে পড়বেন। ঈশ্বরকে যে নামেই ডাকা হক না কেন, আমাদের বুঝতে হবে যে আমরা কেবল তাঁর শক্তির প্রসাদেই কাজ করতে পারি। এই জাতীয় বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ ব্যক্তি কারও প্রাণনাশ করতে পারেন না। প্রয়োজন হলে তিনি নিজ প্রাণ উৎসর্গ করবেন এবং এইভাবে মৃত্যুকে জয় করে অমর হবেন।

যাঁর জীবনে এই সত্য জীবন্ত রূপ পরিগ্রহ করেছে বিপদের সম্মুখীন হলেও তিনি কখনও বিভ্রান্ত হতে পারবেন না। তাঁর সংজ্ঞা তাঁকে সঠিক পথের নির্দেশ দেবে। এতৎসত্ত্বেও আমি আমার অভিজ্ঞতালব্ধ কয়েকটি বিধি বিধানের উল্লেখ করছি ঃ

(১) অহিংস স্বেচ্ছাসেবক সঙ্গে কোন অস্ত্র রাখবেন না।

(২) তাঁদের সহজেই চেনা যাবে।

(৩) প্রাথমিক পরিচর্যা করার জন্য প্রত্যেকটি স্বেচ্ছাসেবকের কাছে ব্যাণ্ডেজ কাঁচি সূঁচ সুতা ও অস্ত্রোপচার করার ছুরী ইত্যাদি থাকবে।

(৪) আহতকে বহন ও স্থানান্তরিত করার প্রক্রিয়া তিনি জানবেন।

(৫) অগ্নি নির্বাপণ, স্বয়ং আহত না হয়ে অগ্নিবেষ্টিত এলাকার মধ্যে প্রবেশ, বিপন্ন ব্যক্তিকে উদ্ধার করার জন্য উচ্চ জায়গায় চড়া ও সেখান থেকে নিরাপদে নামা ইত্যাদি প্রক্রিয়া তাঁকে জানতে হবে।

(৬) নিজের এলাকার সকলের সঙ্গে তাঁর ভাল রকম জানাশোনা থাকা চাই। এইটুকুই একধরনের সেবা।

(৭) তিনি নিরন্তর মনে মনে রামনাম জপ করবেন এবং অপর যাঁরা এতে বিশ্বাস করেন তাঁদের অনুরূপ করতে উদ্বুদ্ধ করবেন।

মানুষ কখনও কখনও তোতা পাখির মত ভগবানের নামোচ্চারণ করে এবং আশা করে যে তাতেই ফল হবে। খাঁটি ভক্তের বিশ্বাস এতটা জীবন্ত হওয়া চাই যার ফলে তাঁর নিজের তোতার মত নামোচ্চারণ করার বৃত্তিই কেবল বিদূরিত হবে না, অপরের হৃদয় থেকেও এই দুর্বলতা দূর করার শক্তি তাঁর হবে।

গুণ্ডা সমস্যা

গুণ্ডাদের উপর দোষরোপ করা ভুল। আমরা তাদের জন্য অনুকূল

পরিবেশ সৃষ্টি না করলে তারা কখনও বদমায়েশী করতে পারে না। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বেতে যুবরাজের আগমনের দিন যা ঘটে আমি তার প্রত্যক্ষদর্শী। আমরা যে বীজ বপন করি গুণ্ডারা তার ফসল রোজগার করে। আমাদের লোকেরা তাদের পিছনে ছিল।…সমাজের মান্যগণ্য সম্প্রদায়কে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেবার অভ্যাস আমাদের দৃঢ়ভাবে বর্জন করতে হবে।…বানিয়া ও ব্রাহ্মণেরা গুণ্ডাদের হাতে তাঁদের নারীদের সম্ভ্রম ও ধনসম্পত্তি তুলে দেবার পরিবর্তে সম্ভব হলে অহিংস পদ্ধতিতে আর তা না পারলে এমন কি হিংসা প্রয়োগে নিজেদের রক্ষা করতে শিখবেন। শিখ বা মুসলমান যাই হক না কেন গুণ্ডারা একটি পৃথক সম্প্রদায়।

শান্তিসৈনিক নিজ এলাকার তথাকথিত গুণ্ডাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসবেন এবং তাদের সঙ্গে মেলামেশা করবেন। তিনি সকলের সঙ্গে পরিচয় করবেন, সকলে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করবে এবং স্বার্থলেশশূন্য জীবনযাত্রা নির্বাহ দ্বারা তিনি সবার হৃদয় জয় করবেন। সমাজের কোন অংশকেই তিনি এমন হীন তুচ্ছ মনে করবেন না যে তার সঙ্গে মেলামেশা করা যায় না। গুণ্ডারা আকাশ থেকে পড়ে না অথবা ভূত প্রেতের মত মাটি ফুঁড়ে বেরোয় না। এরা সমাজের অসংলগ্নতার পরিণাম এবং তাই এদের অস্তিত্বের জন্য সমাজ দায়ী। অর্থাৎ গুণ্ডারা আমাদের সমাজ-দেহে যে দুর্নীতি রয়েছে তারই বাহ্য উপসর্গ। এ ব্যাধি দূরীকরণের জন্য আমাদের তাই এর অন্তর্নিহিত কারণ আবিষ্কার করতে হবে। তারপর রোগের প্রতিকার খুঁজে বার করা অপেক্ষাকৃত সহজ ব্যপার হবে।

॥ পঁয়তাল্লিশ ॥

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস দেশের প্রাচীনতম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং বহু লড়াই লড়ে অহিংস পন্থায় এ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। সুতরাং এ প্রতিষ্ঠানকে মরতে দেওয়া যায় না। এর মৃত্যুর অর্থ জাতির মৃত্যু। তবে যে কোন জীবন্ত প্রতিষ্ঠান প্রতি নিয়ত বিকশিত হয়, নচেৎ তার মৃত্যু অবধারিত। রাজনৈতিক স্বাধীনতা কংগ্রেস অর্জন করলেও আর্থিক সামাজিক

ও নৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করা এখনও বাকী। এসব স্বাধীনতা রাজনৈতিক স্বাধীনতার চেয়েও দুর্লভ। এর অন্যতম কারণ হল এই যে এগুলি গঠনমূলক উত্তেজনার খোরাক এতে অপেক্ষাকৃত কম এবং এক্ষেত্রে চমক ও চটকেরও স্বল্পতা রয়েছে। সর্বব্যাপী গঠনমূলক কাজ কোটি কোটি লোকের সবটুকু কর্মশক্তি জাগ্রত করে।

কংগ্রেস তার স্বাধীনতার প্রাথমিক প্রয়োজনীয় অংশ পেয়েছে। তবে দুরূহতম পর্যায় আসা এখনও বাকী। গণতন্ত্রের কঠিন আদর্শে উত্তরণের প্রক্রিয়ায় কংগ্রেস নিঃসন্দেহে গলিত দূষিত প্রতিনিধি ব্যবস্থা সৃষ্টি করেছে। এর পরিণামে দুর্নীতি বেড়েছে এবং এমন প্রথা প্রবর্তিত হয়েছে যা কেবল নামেই জনপ্রিয় ও গণতান্ত্রিক। এই ব্যাপক আগাছার মঙ্গল থেকে বার হবার পথ কি?

কংগ্রেসের সদস্যদের বিশেষ তালিকা রাখার আর প্রয়োজন নেই। কোন সময়েই এই সদস্যদের সংখ্যা এক কোটির বেশী ছিল না এবং তাও অন্যদের থেকে সদস্যদের তেমন কোন পার্থক্যও থাকে না। বরাবরই কংগ্রেসের কোটি কোটি অজানা অচেনা সদস্য রয়েছে এবং এদের সংখ্যায় কখনও ঘাটতি পড়েনি। তাই এখন কংগ্রেসের সদস্য তালিকা ও দেশের ভোটারদের তালিকা একই হওয়া উচিত। কংগ্রেসের কাজ হবে ভোটার তালিকায় যাতে কোন জাল নাম স্থান না পায় ও কোন যোগ্য লোকের নাম বাদ না যায় তাই দেখা। কংগ্রেসের বিশেষ তালিকায় এমন এক দল স্বদেশ সেবকের নাম থাকবে। তাঁরা তাঁদের উপর ন্যস্ত কর্তব্য সব সময়ে করতে থাকবেন।

দেশের দুর্ভাগ্য এখনকার মত এই সব কর্মীরা প্রধানত শহর থেকেই আসবেন। এঁদের অধিকাংশকেই অবশ্য গ্রামে থেকে গ্রামবাসীদের জন্য কাজ করতে হবে। ক্রমশঃ অধিকাধিক মাত্রায় গ্রামীণ কর্মীদের দ্বারা এই সেবক বাহিনীর পরিপুষ্টি সাধন করতে হবে।

এই সব সেবকেরা নিজ নিজ এলাকার ভোটারদের মধ্যে কাজ করবেন এবং তাঁদের সেবা করবেন। অনেক ব্যক্তি ও দল তাঁদের হয়রান ও বিব্রত করবেন। সেরা সেবকরাই কেবল জয়লাভ করবেন, এইভাবেই কেবল কংগ্রেস দ্রুত ক্ষীয়মাণ মর্যাদা পুনরুদ্ধার করতে পারবে, অন্য কোন উপায়ে নয়। কাল পর্যন্ত কংগ্রেস জাতির সেবক ছিল, ছিল খুদ-ই-খিদমৎগার বা ঈশ্বরের সেবক। এখনও যেন কংগ্রেস নিজেকে এবং বিশ্বকে একথা বলতে

পারে যে কংগ্রেস কেবল ঈশ্বরের সেবক—এর বেশীও নয় কমও নয়। অলাভজনক ক্ষমতার দ্বন্দ্বে কংগ্রেস যদি মেতে ওঠে তাহলে হঠাৎ এক দিন দেখা যাবে যে কংগ্রেসের অস্তিত্বই নেই। ঈশ্বর কৃপায় অবশ্য এখন কংগ্রেসই একমাত্র প্রতিষ্ঠান নয়।

॥ ছেচল্লিশ ॥

শেষ ইচ্ছা

দুই ভাগে বিভক্ত হওয়া সত্ত্বেও ভারতবর্ষ জাতীয় কংগ্রেস নির্দেশিত পথে স্বাধীনতা অর্জন করেছে। তাই বর্তমান স্বরূপে ও আকারে অর্থাৎ প্রচার-যন্ত্র রূপে কংগ্রেসের অস্তিত্বের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। ভারতবর্ষের সামাজিক নৈতিক ও আর্থিক স্বাধীনতা অর্জন পর্ব এখনও বাকী। এই স্বাধীনতা হবে দেশের সাত লক্ষ গ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে, শহর ও নগরের পটভূমিকায় নয়। গণতান্ত্রিক লক্ষ্যাভিমুখে ভারতবর্ষের প্রগতির পথে সামরিক শক্তির উপর বেসামরিক শক্তির বিজয়ী হবার সংগ্রাম সংঘটিত হবেই। ভারতবর্ষকে রাজনৈতিক দলসমূহ ও সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানাবলীর অস্বাস্থ্যকর প্রতিদ্বন্দ্বিতার হাত থেকে মুক্ত রাখতে হবে। এই সব কারণ এবং অনুরূপ আরও অনেক কারণের জন্য অখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি বর্তমানের কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে ভেঙ্গে ফেলে লোকসেবক সঙ্ঘ রূপে বিকশিত হয়ে ওঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে। সঙ্ঘ নিম্নলিখিত নিয়মাবলী দ্বারা চালিত হবে এবং প্রয়োজন হলে এ নিয়মের পরিবর্তন করার অধিকারও তার থাকবে।

পাঁচ জন প্রাপ্তবয়স্ক গ্রামবাসী বা গ্রামীণ মনোবৃত্তিসম্পন্ন পুরুষ বা নারী নিয়ে একটি প্রাথমিক একম্ বা পঞ্চায়েৎ গঠিত হবে।

পাশাপাশি এরকম দুটি পঞ্চায়েৎ মিলে একটি কর্মীচক্র (working party) গঠন করবে এবং নিজেদের মধ্যে থেকে তাঁরা একজন নেতা নির্বাচন করবেন।

এই রকম একশতটি পঞ্চায়েতের পঞ্চাশ জন প্রথম পর্যায়ের নেতা তাঁদের মধ্যে থেকে এক জন নেতা নির্বাচন করবেন ও এইভাবে ধাপে ধাপে সর্বোচ্চ পর্যায়ের নেতা নির্বচিত হবেন। সর্বত্র প্রথম পর্যায়ের নেতারা দ্বিতীয় পর্যায়ের নেতার অধীনে কাজ করবেনা।...

…স্মরণ রাখতে হবে যে সেবকদের এই প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার উৎস হবে তাদের প্রভু সমগ্র ভারতবর্ষের স্বতঃপ্রণোদিত ও বিবেকপূর্ণ সেবা।

(১) প্রত্যেকটি কর্মী নিজের হাতে কাটা অথবা অখিল ভারত চরখা সঙ্ঘ দ্বারা প্রমাণিত খদ্দর নিয়মিতভাবে পরবেন এবং তাঁরা কোন রকম নেশা করবেন না। হিন্দু হলে তাঁকে স্বয়ং ও তাঁর পরিবারে সর্বপ্রকারে অস্পৃশ্যতা বর্জন করতে হবে। তাঁকে সাম্প্রদায়িক ঐক্যের আদর্শে বিশ্বাসী হতে হবে এবং সকল ধর্মমতের প্রতি তাঁর সমান শ্রদ্ধা থাকবে। জাতি বিশ্বাস বা নরনারী নির্বিশেষে সকলকে সমান সুযোগ ও সমমর্যাদা দেবার আদর্শে তিনি বিশ্বাসী হবেন।

(২) নিজের এলাকার প্রতিটি গ্রামবাসীর সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকবে।

(৩) গ্রামবাসীদের ভিতর থেকে তিনি কর্মী সংগ্রহ করে তাঁদের প্রশিক্ষণ দেবেন এবং এই সব কর্মীর নামের একটি তালিকা রাখবেন।

(৪) তিনি দৈনন্দিন কাজের বিবরণ লিখবেন।

(৫) কৃষি ও হস্তশিল্পের দ্বারা গ্রামবাসীদের স্বাবলম্বী ও স্বাশ্রয়ী করার জন্য তিনি তাঁদের সংগঠিত করবেন।

(৬) সাফাই ও স্বাস্থ্যবিধি সম্বন্ধে তিনি গ্রামবাসীদের সচেতন করে তুলবেন এবং তাঁদের ভিতর যাতে রোগজ্বালা ইত্যাদি না হয় তার জন্য প্রতিরোধ ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।

(৭) হিন্দুস্থানী তালিমী সঙ্ঘ কর্তৃক নির্ধারিত নীতি অনুযায়ী তিনি গ্রামবাসীদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা সংগঠিত করবেন।

(৮) সরকারী ভোটারের তালিকায় কারও নাম বাদ পড়ে গেলে যাতে তাঁর নাম লেখান হয় কর্মী তার ব্যবস্থা করবেন।

(৯) যাঁদের ভোট দেবার আইনসঙ্গত অধিকার নেই তাঁদের সেটা অর্জন করতে তিনি সাহায্য করবেন।

(১০) পূর্বোক্ত এবং ভবিষ্যতে সময় সময় আর যেসব কর্মসূচি গৃহীত হবে সেসবকে কার্যান্বিত করার জন্য সঙ্ঘের নিয়মানুসারে তিনি নিজে প্রশিক্ষণ নেবেন।

সঙ্ঘ নিম্নোক্ত স্বয়ং-শাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে শাখাস্বরূপ পরিগ্রহণ করবে

(ক) অখিল ভারত চরখা সঙ্ঘ
(খ) অখিল ভারত গ্রামোদ্যোগ সঙ্ঘ
(গ) হিন্দুস্থানী তালিমী সঙ্ঘ
(ঘ) হরিজন সেবক সঙ্ঘ
(ঙ) গোসেবা সঙ্ঘ

নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সঙ্ঘ গ্রামবাসী ও অন্যান্যদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করবে, তবে গরীবদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহের উপর বিশেষ নজর রাখতে হবে। *

॥ সাতচল্লিশ ॥

ভারত ও পাকিস্তান

দেশ দ্বিখণ্ডিত হয়েছে, এ আমাদের দুরদৃষ্ট। স্পষ্টতই এ বিভাজন ধর্মীয় বিরোধের কারণ। এর পিছনে হয়ত আর্থিক ও অন্যবিধ কারণও থাকতে পারে। তবে কেবল সেই সব কারণের জন্য ভেদ সৃষ্টি হত না। আজকের আকাশে বাতাসে এত যে বিষ তারও উৎস এই একই সাম্প্রদায়িক কারণ। অধর্ম আজ ধর্মের ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সাম্প্রদায়িক সমস্যা না থাকলে ভাল হত—একথা বলতে ভাল শোনায়। কিন্তু বাস্তব তথ্যকে তো আর অস্বীকার করা যায় না।

বার বার প্রশ্ন করা হয় যে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ বাধলে ভারতের মুসলমানরা কি পাকিস্তানের মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবেন আর পাকিস্তানের হিন্দুরাই কি ভারতের হিন্দুদের বিরুদ্ধে লড়বেন? আজকে এ প্রশ্ন যতই অসম্ভব মনে হক না কেন এ ধারণার মধ্যে মূলতঃ অবাস্তব কোন কিছু নেই। মানুষের আনুগত্যের প্রতি বিশ্বাস করে সাহসিকতা সহকারে বিশ্বাসের বিপদের সম্মুখীন হবার চেয়ে তাকে না বিশ্বাস করা বেশী বিপজ্জনক ব্যাপার। পূর্বোক্ত প্রশ্নটি আরও বিশ্বাসযোগ্য করার

* গান্ধীজীকৃত ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নূতন একটি গঠনতন্ত্রের খসড়া। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জানুয়ারী গান্ধীজী এটি রচনা করেন। এটিই গান্ধীজীর শেষ রচনা।

জন্য এই ভাবে উপস্থাপিত করা যায়ঃ সত্য ও ন্যায় বিচারের খাতিরে হিন্দুরা কি কখনও হিন্দুদের সঙ্গে এবং মুসলমানরা মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন ? এ প্রশ্নের উত্তর অপর একটি প্রশ্নের দ্বারা দেওয়া যায়ঃ ইতিহাসে কি এর একাধিক নিদর্শন নেই ?

ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক কারণের জন্য দেশবিভাগের দাবী তোলা হয়েছিল। সুতরাং নিজের যাবতীয় আচার আচরণে শুদ্ধ থাকা পাকিস্তানের কর্তব্য। পাকিস্তান নামটির তাৎপর্যও এই। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই বহু নিষ্ঠুর কার্য ও বহু মারাত্মক ভুল করেছেন। তবে তার মানে এই নয় এই উন্মত্ততা প্রবাহ চলতে থাকবে ও শেষ অবধি তা যুদ্ধে পর্যবসিত হবে। যুদ্ধের ফলে উভয় দেশই কোন তৃতীয় শক্তির অধীন হবে এবং তার চেয়ে খারাপ আর আর কিছুই হতে পারে না।

(ভারত ও পাকিস্তানের ভিতর) যদি যুদ্ধ বাধে তাহলে পাকিস্তানের হিন্দুরা সে দেশের পঞ্চমবাহিনীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারেন না। কেউ তা বরদাস্ত করবেন না। পাকিস্তানের প্রতি তাঁদের যদি আনুগত্য না থাকে তাহলে তাঁরা যেন সে দেশ পরিত্যাগ করেন। এইভাবে যেসব মুসলমান পাকিস্তানের প্রতি অনুগত তাঁদের ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত।...... শোনা যায় মুসলমানেরা বলে থাকেন যে, হাসকে লিয়া পাকিস্তান লড়কে লেঙ্গে হিন্দুস্থান।......কেউ কেউ সমগ্র ভারতবর্ষকে ইসলামে দীক্ষিত করার স্বপ্ন দেখেন। যুদ্ধের দ্বারা তা কদাচ সম্ভব হবে না। হিন্দুধর্মকে পাকিস্তান কখনই ধ্বংস করতে পারবে না। হিন্দুধর্ম ও হিন্দুদের ধ্বংস করতে পারেন একমাত্র হিন্দুরা। অনুরূপভাবে ইসলাম যদি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তবে তা হবে পাকিস্তানের মুসলমানদের হাতে।

উপযুক্ত ব্যবস্থাপিতকরণের বিশ্বজনীন উপায় হল উভয় রাষ্ট্র কর্তৃক অকপটে নিজেদের সম্পূর্ণ দোষ স্বীকার করে একটা বোঝাপড়ায় আসা। এ সম্ভব না হলে প্রচলিত পদ্ধতিতে মধ্যস্থের সহায়তা নিতে হবে। এর বিকল্প হল যুদ্ধ এবং সে বিকল্প অতীব রূঢ়।......তবে পারস্পরিক বোঝাপড়া বা মধ্যস্থের দ্বারা বিবাদের মীমাংসা না হলে যুদ্ধের হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। ইতোমধ্যে......যে সব মুসলমান ইচ্ছার বিরুদ্ধে পাকিস্তানে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন তাঁদের প্রতিবেশীদের কর্তব্য হল তাঁদের পূর্ণমাত্রায় নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিজ ভিটাতে ফিরিয়ে আনা। সেনাবাহিনীর সাহায্যে

একাজ হবার নয়। সংশ্লিষ্ট মানুষগুলির ভিতর শুভবুদ্ধির পুনরুদ্রেক হলেই কেবল এটা সম্ভব।

ভারতবর্ষ থেকে প্রতিটি মুসলমানকে এবং পাকিস্তান থেকে প্রতিটি হিন্দু ও শিখকে বিতাড়িত করার অর্থ যুদ্ধ ও দেশের স্থায়ী সর্বনাশ। উভয় রাষ্ট্র এ জাতীয় আত্মঘাতী নীতি গ্রহণ করলে পাকিস্তানে ইসলাম ও ভারতবর্ষে হিন্দুধর্মের বিনষ্টি অবধারিত। একমাত্র ভাল থেকেই ভাল-এর সৃষ্টি হতে পারে, ভালবাসা জন্ম দেয় ভালবাসার। প্রতিশোধ প্রসঙ্গে বলতে চাই যে মানুষের কর্তব্য হল দুষ্কৃতিকারীকে ঈশ্বরের হাতে ছেড়ে দেওয়া।

ভারতবর্ষ এবং হিন্দু শিখ ও ইসলাম ধর্মের ধ্বংসের অসহায় দর্শক হবার চেয়ে বরং এর হাত থেকে গৌরবজনকভাবে পরিত্রাণ পাবার জন্য মৃত্যু আমার কাছে অধিকতর কাম্য। পাকিস্তান যদি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী তার নাগরিকদের সমান মর্যাদা না দেয় ও তাঁদের জীবন ও ধনসম্পত্তির নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করে এবং ভারতবর্ষও যদি তার অনুকরণ করে তাহলে এই ধ্বংস অনিবার্য। কেবল তাহলেই দুই ভারতবর্ষে ইসলামের মৃত্যু ঘটবে, অবশ্য সমগ্র বিশ্বে নয়। কিন্তু হিন্দু ও শিখ ধর্মের ভারতবর্ষের বাইরে পৃথক কোন জগত নেই।

সংখ্যালঘুরা সবাই বিশ্বাসঘাতক হবে এই আশঙ্কায় তাদের মেরে ফেলা বা নির্বাসিত করা নিঃসন্দেহেই সংখ্যাগুরুদের পক্ষে ভীরুতার পরিচায়ক। সংখ্যালঘুদের অধিকারের প্রতি যথোচিত দৃষ্টি দেওয়া সংখ্যাগুরুদের ধর্ম। এ না করলে সংখ্যালঘুরা হাস্যাস্পদ হবেন। নিজের সম্বন্ধে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস এবং তথাকথিত বা যথার্থ বিরোধীর উপর বীরোচিত আস্থা-ই হল সব চেয়ে সেরা রক্ষাকবচ।

পাকিস্তান যদি নিছক মুসলিম রাষ্ট্র হয় আর ভারতবর্ষ হয় কেবল হিন্দু ও শিখ রাষ্ট্র এবং কোন রাষ্ট্রেই যদি সংখ্যালঘুদের কোন অধিকার না থাকে তাহলে তার পরিণামে উভয় রাষ্ট্রই ধ্বংস হবে।

কায়েদ-এ-আজম কি একথা বলেননি যে পাকিস্তান ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র নয়। এ এক খাঁটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র? একথা অবশ্য দুর্ভাগ্যজনক হলেও অতীব সত্য যে কায়েদ-এ-আজম-এর এই দাবীর যথার্থতা সর্বদা সপ্রমাণ করা যায় না। কিন্তু ভারতীয় ইউনিয়ন কি ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র হবে এবং হিন্দুধর্মের বিধিবিধান কি অহিন্দুদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে?···তাহলে ভারতীয়

ইউনিয়ন আর আশা ভরসার দেশ থাকবে না, এসিয়া আফ্রিকার জাতিসমূহ—প্রত্যুত সমগ্র বিশ্ববাসী আর তাহলে ভারতবর্ষের দিকে ভরসা করে তাকাবে না। ভারতীয় ইউনিয়ন হক অথবা পাকিস্তান—পৃথিবী এই উপমহাদেশের কাছে সঙ্কীর্ণতা ও ধর্মান্ধতা প্রত্যাশা করে না। ভারত মহাদেশের কাছে বিশ্ব আশা করে মহত্ত্ব ও সৎ উদাহরণ যাতে বর্তমানের অন্ধকারের মধ্যে তা আলোক-শিখার মত কাজ করতে পারে।

॥ আটচল্লিশ ॥

ভারত এবং বিশ্বশান্তি

আমার বিশ্বাসের পুনরুক্তি করে আমি বলতে চাই যে, যুদ্ধ এবং তার আনুসঙ্গিক বিরাট প্রবঞ্চনা ইত্যাদির উপর ভরসা ছেড়ে দিয়ে, মিত্র শক্তিবর্গ, সমস্ত জাতি ও রাষ্ট্রের সমানাধিকারের ভিত্তিতে খাঁটি শান্তি গড়ে তুলতে কৃতনিশ্চয় না হওয়া পর্যন্ত তাদের বা জগতের শান্তি নেই। যাবতীয় দ্বন্দ্বের অবসানকল্পে সচেষ্ট বিশ্বে একজাতির উপর অন্যের আধিপত্য বা শোষণের স্থান থাকতে পারে না। শুধু এই রকম বিশ্বেই সামরিক শক্তিতে দুর্বল জাতিপুঞ্জ শোষণ বা অত্যাচারের ভয় না করে টিকে থাকতে পারে।

পরস্পর সংগ্রামরত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের অস্তিত্ব আজ আর বিশ্বের মনীষীদের অভিপ্রেত নয়। মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ রাষ্ট্রসমূহের এক ফেডারেশনই তাঁদের কাম্য। হয়ত নিকট ভবিষ্যতে এ আদর্শের পরিপূর্তির সম্ভাবনা নেই। আমাদের দেশের জন্য আমি একটা বিরাট কিছু দাবী করতে চাই না। তবে স্বাতন্ত্র্যের বদলে বিশ্বজনীন পারস্পরিক নির্ভরশীলতার নীতি গ্রহণ করতে আমাদের ব্যগ্রতার কথা ঘোষণা করাকে আমি খুব একটা বিরাট বা অসম্ভব ব্যাপার মনে করি না।

ভারত কখনও কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়নি। নিছক আত্মরক্ষার জন্য কখন কখন ভারত অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত প্রতিরোধবাহিনী খাড়া করেছে। সুতরাং তার মনে আর শান্তির আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করাতে হবে না। জানা থাক্ আর নাই থাক্, শান্তির আকাঙ্ক্ষা ভারতের প্রভূত পরিমাণে আছে। শোষণকারীর বিরুদ্ধে সাফল্য সহকারে শান্তিময় প্রতিরোধ প্রয়োগ

করে ভারত শান্তির সহায়তা করতে পারে। অর্থাৎ তাকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে। এ যদি ভারত করতে পারে, তবে বিশ্বশান্তির জন্য এই ঘটনাই হবে একটি জাতির শ্রেষ্ঠতম অবদান।

আমাদের জাতীয়তাবাদে অপর কোন জাতির ক্ষতি হবে না ; যেমন কাউকে আমরা আমাদের শোষণ করতে দেব না, তেমনি আমরাও কাউকে শোষণ করব না। স্বরাজ মারফৎ আমরা সমগ্র জগতের সেবা করব।

স্বাধীনতার চেয়েও অনেক উঁচু লক্ষ্য আমার কাম্য। ভারতবর্ষের মুক্তির মাধ্যমে আমি পৃথিবীর তথাকথিত দুর্বল জাতিগুলিকে পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহের প্রাণান্তকারী শোষণ-পাশ থেকে মুক্ত করতে চাই। ভারত তার স্বাধিকার অর্জন করলে অপরাপর প্রতিটি দেশ অনুরূপ করবে।

এ কথা আমি জানি যে, অহিংস উপায়ে ভারত তার লক্ষ্যে উপনীত হলে কখনও তার এক বিরাট সৈন্যবাহিনী, সেই অনুপাতের নৌবাহিনী বা ততোধিক উৎকৃষ্ট বিমানবাহিনীর প্রয়োজন হবে না। স্বাধীনতার সংগ্রামে অহিংসভাবে বিজয়ী হবার মত উচ্চস্তরে যদি তার আত্মসচেতনতা পৌঁছায় তবে জগতের বহু পরিবর্তন সাধিত হবে এবং আজকের বহুবিধ রণসজ্জা অকার্যকরী হয়ে যাবে। এ রকম ভারত শুধু স্বপ্ন হয়েই থেকে যেতে পারে বা একে ছেলেমানুষি মনে হতে পারে। কিন্তু অহিংস উপায়ে ভারতের স্বাধীন হবার অর্থ আমার কাছে এই। সেই স্বাধীনতা আসবে…গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে এক সহজ আপোষ-নিষ্পত্তির মারফৎ। তবে সে বৃটেন উদ্ধত সাম্রাজ্যবাদ বা কৌশলে জগতে প্রাধান্য স্থাপনে ইচ্ছুক হবে না, মানবতার বিনয়ী সেবক হতে হবে তাকে।…শোষণের উদ্দেশ্যে ব্রিটেন কর্তৃক আরব্ধ সংগ্রামে তখন আর ভারতকে অসহায়ভাবে ঠেলে দেওয়া হবে না, বরং হিংসোন্মত্ত পৃথিবীর শক্তিসমূহকে সংযত করবার বাণীই তার শক্তিশালী কণ্ঠে ধ্বনিত হবে।

যথোচিত দীনতা সহকারে আমি নিবেদন করতে চাই যে, সত্য এবং অহিংসা দ্বারা ভারত তার লক্ষ্যে উপনীত হলে, যে আন্তর্জাতিক শান্তির জন্য সমগ্র জাতিপুঞ্জ প্রাণপণ চেষ্টা করছে, তার ক্ষেত্রে ভারতের অবদানকে মোটেই নগণ্য বলা চলবে না এবং তাহলে যে সমস্ত জাতি তাকে মুক্তহস্তে সাহায্য দিয়েছে তাদের সে দানের যৎকিঞ্চিৎ প্রতিদানও দেওয়া হবে।

ভারত আত্মনির্ভরশীল এবং আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠলে এবং লালসা বা শোষণেচ্ছা তার চিত্তে বিকার আনতে সমর্থ না হলে পাশ্চাত্ত্য বা প্রাচ্যের কোন শক্তিই আর লোভাতুর দৃষ্টিতে তার দিকে নজর দেবে না এবং ব্যয়বহুল রণসজ্জার বোঝা বহন না করা সত্ত্বেও ভারত নিরাপত্তা বোধ করবে। কোন বহিরাক্রমণের বিরুদ্ধে আভ্যন্তরীণ অর্থনীতিই হবে তার পক্ষে নিরাপদ দুর্গ-স্বরূপ।

বিশ্বাস করুন, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আমি এই কারণে চাইনা যে স্বাধীন হয়ে পৃথিবীর এক পঞ্চম জনসংখ্যা অধ্যুষিত একটি জাতি অন্যান্য জাতি অথবা কোন ব্যক্তিকে শোষণ করবে। দুর্বল বা শক্তিশালী নির্বিশেষে আর সব জাতিকে সমান স্বাধীনতা দিতে না পারলে এবং অপর সকলের অধিকারকে সমানভাবে শ্রদ্ধা ও সম্মান না করলে নিজের দেশের জন্য স্বাধীনতা দাবী করা নিরর্থক হয়ে যাবে।

আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে আমি অনুভব করি…যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে বিশ্ব পীড়িত, মুমূর্ষু। পৃথিবী একটা বিকল্প পথ অনুসন্ধান করছে। আমার মনে কেন জানি না এই মূঢ় আশা যে সম্ভবতঃ আমাদের এই প্রাচীন দেশ আর্ত বিশ্বকে বাঁচার পথ দেখাবে।

জাতীয় সরকার কি নীতি গ্রহণ করবে তা আমি বলতে পারি না। আমার ঐকান্তিক আগ্রহ থাকলেও সে সময় পর্যন্ত আমি নাও জীবিত থাকতে পারি। জীবিত থাকলে, অহিংসাকে যথাসম্ভব কঠোরভাবে গ্রহণ করার পরামর্শ আমি দেব। আন্তর্জাতিক শক্তির ক্ষেত্রে এবং এক নূতন দুনিয়া সৃষ্টির পথে এই হবে ভারতের শ্রেষ্ঠ অবদান। ভারতে এত সামরিক জাতি থাকার জন্য আমার মনে হয় যে তৎকালীন সরকারে তাদের যথেষ্ট প্রভাব থাকবে এবং জাতির নীতিও কিঞ্চিৎ পরিমার্জিত আকারে সামরিকতার দিকে ঝুঁকবে।—আমার আশা আছে যে, …রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে অহিংসার শক্তি প্রমাণ করার যাবতীয় প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে না এবং খাঁটি অহিংসার ধারক একদল শক্তিশালী কর্মী তখন দেশে থাকবে।

॥ উনপঞ্চাশ ॥

বিবিধ

কাশ্মীর

প্রজাগণের সুস্পষ্ট সম্মতি ব্যতিরেকে কাশ্মীরের মহারাজা-সাহেব অথবা মহামান্য নিজাম বাহাদুরের কোনো একটি (ভারত বা পাকিস্তান) ডোমিনিয়নে যোগদানের অধিকার নেই। তাঁর যতদূর জানা আছে, কাশ্মীরের বেলায় একথা স্পষ্ট ভাবেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। একা যদি মহারাজের ভারতে যোগদানের ইচ্ছা হত তাহলে গান্ধীজী সেরকম যোগদানকে সমর্থন করতে পারতেন না। কাশ্মীর ও জম্মুর জনসাধারণের প্রতিনিধি স্বরূপ মহারাজ এবং শেখ আবদুল্লা উভয়েই ভারতভুক্তি চান বলে কাশ্মীরের ভারত-ভুক্তিতে ভারত সরকার সাময়িক ভাবে সম্মতি দেন। কেবল মুসলমান সমাজ নয়, কাশ্মীর ও জম্মুর সমগ্র জনসাধারণের প্রতিনিধি বলে নিজেকে দাবী করেন বলেই শেখ আবদুল্লা ঘটনাক্ষেত্রে আবির্ভূত হন।

কাশ্মীরকে দ্বিখণ্ডিত করা হবে এবং জম্মু হবে হিন্দুদের ও কাশ্মীর মুসলমানদের—এই রকম চাপা প্রচার তাঁর কানে এসেছে। আনুগত্যের এরকম বিভাজন ও ভারতের দেশীয় রাজ্যসমূহের এরকম ছিন্নভিন্ন অবস্থার কথা তিনি কল্পনা করতে পারেন না।

আদিবাসী

আদিবাসীরা ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসী। কিন্তু তাদের ভৌতিক সম্পদের পরিমাণ তথাকথিত উচ্চবর্ণদের দীর্ঘকালের উপেক্ষার পরিণাম—হরিজনদের চেয়ে কোন অংশে বেশী নয়। গঠনমূলক কর্মসূচীতে আদিবাসীদের বিশেষ স্থান থাকা উচিত ছিল।......আদিবাসীদের ভিতর কংগ্রেসকর্মীরা সেবার এক বিপুল ক্ষেত্র পাবেন। এ ক্ষেত্রে এ যাবৎ খ্রীষ্টীয় মিশনারীরাই মোটামুটি নায়ক ছিলেন। তাঁরা যথেষ্ট সেবাকার্য করলেও আদিবাসীদের ভিতর বাঞ্ছিত সমৃদ্ধি আসে নি। এর কারণ হল এই, যে, খ্রীষ্টীয় মিশনারীদের চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল আদিবাসীদের ধর্মান্তরিত করা ও তাদের অভারতীয় করে তোলা। তবে যাই হক, অহিংসার ভিত্তিতে যে কেউ

স্বরাজের সৌধ গড়ে তুলতে চান তাঁর পক্ষে ভারতবর্ষের কোন সন্তানকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়।

শৃঙ্খলা

স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠতম স্বরূপের সঙ্গে চূড়ান্ত শৃঙ্খলা ও নম্রতা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। শৃঙ্খলা ও নম্রতার ফলে যে স্বাধানতা আসে তা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। অনিয়ন্ত্রিত স্বেচ্ছাচার নিজের এবং প্রতিবেশীদের উপর এক কদাচারের নিদর্শন।

চিকিৎসক

চিকিৎসকদের সঙ্গে আমার বিবাদের কারণ এই যে তাঁরা আত্মাকে একেবারেই উপেক্ষা করে শরীরের মত নিছক ক্ষণভঙ্গুর যন্ত্রটিকে মেরামত করার জন্য প্রাণান্তকর পরিশ্রম করেন। এই ভাবে আত্মাকে অগ্রাহ্য করার জন্য এই নেশা মানুষকে ওষুধের দাসে পরিণত করে এবং মানবীয় মর্যাদা ও আত্মসংযমের মানকে অধোগামী করার সহায়ক হয়।

পোশাক

ভারতবাসীর পক্ষে জাতীয় পোশাকই…একমাত্র স্বাভাবিক ও সঙ্গত পরিধেয়। আমার মতে আমাদের ইউরোপীয় পোশাকের নকল করা আমাদের অধোগামী ও অপমানজনক অবস্থার লক্ষণ। এ দুর্বলতারও দ্যোতক। যে পোশাক ভারতবর্ষের জলবায়ুর সর্বাপেক্ষা অধিক অনুকূল এবং অনাড়ম্বরতা কলাত্মকতা ও দামের দিক থেকে যার সঙ্গে অপর কোন পোশাক প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে না ও যা স্বাস্থ্যকর, তাকে বর্জন করে আমরা জাতীয় পাপ করছি।

পতাকা

পতাকা প্রত্যেক জাতিরই প্রয়োজন। লক্ষ লক্ষ লোক এর জন্য প্রাণ-বিসর্জন দিয়েছেন। এটা এক ধরনের পৌত্তলিকতা হলেও এ মনোভাবের বিনষ্টিসাধন পাপ। কারণ পতাকা একটি বিশেষ আদর্শবাদের প্রতীক।… ভারতবর্ষ যাঁদের আবাসভূমি তাঁরা হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান ইহুদী পার্শী বা আর যা হন এ কেন তাঁরা যেন একটি সর্বসাধারণের মান্য পতাকা গ্রহণ করেন এবং সেই পতাকার সম্মান বজায় রাখার জন্য জীবন ধারণ করেন ও তার মর্যাদা রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনে প্রাণ দেন।

নেতা

জনসাধারণ নিজেদের হাতে আইন তুলে নিক এ যদি আমাদের কাম্য না হয় এবং দেশের সুশৃঙ্খল প্রগতি যদি আমরা চাই, তাহলে জনসাধারণের নেতৃত্ব করার দাবী যাঁরা করেন দৃঢ় ভাবে, তাঁদের জনসাধারণ কর্তৃক পরিচালিত হতে অস্বীকার করতে হবে। আমি বিশ্বাস করি যে কেবল জোর গলায় নিজের অভিমত জাহির করে কার্যতঃ জনসাধারণের দাবীর কাছে আত্মসমর্পণ করা যে কেবল অপ্রতুল তা-ই নয়, বরং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জনমতকে যদি অযৌক্তিক মনে হয়, তাহলে নেতাদের কর্তব্য হচ্ছে জনমতের বিরুদ্ধে কাজ করা।

নেতা সমমর্যাদাসম্পন্ন কর্মীদের মধ্যে প্রথমের জন মাত্র। কাউকে না কাউকে সবার সামনে রাখতেই হয়। তবে তিনি শৃঙ্খলের দুর্বলতম কড়াটির থেকে অধিক শক্তিশালী নন বা হতে পারেন না। কাউকে নেতা হিসাবে নির্বাচন করার পর আমাদের তাঁর অনুসরণ করতে হবে। নচেৎ এই শৃঙ্খল ভেঙ্গে যাবে এবং সব কিছু ঢিলাঢালা হয়ে পড়বে।

পৌরসভা প্রসঙ্গে

গ্রামে আমরা অবাধে অনেক কিছু করতে পারি ; কিন্তু কোনক্রমে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করার উপযুক্ত বায়ুহীন জনাকীর্ণ পথে আসা মাত্র আমাদের অন্য ধরণের নিয়ম পালন করতে হয়। আমরা তা করি কি ? ভারতের গুরুত্বপূর্ণ নগরীসমূহে যে অবস্থা আমরা দেখি তার দায়িত্বভার পৌরসভাগুলির উপর চাপিয়ে দিয়ে কোন লাভ নেই। আমাদের স্বেচ্ছামূলক সহায়তা ছাড়া, একা পৌরসভার পক্ষে এই সব বিরাট নগরীগুলিতে বর্তমান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার মানের উন্নতিসাধন করা অসম্ভব।

আমি অবশ্য পৌরসভাগুলিকে তাদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিচ্ছি না। পৌরসভাতে এখনও বহুকিছু করার আছে ব'লে আমার মনে হয়। সঙ্ঘবদ্ধ সমাজ-জীবন অর্থাৎ নাগরিক জীবনের সর্বপ্রধান প্রয়োজনীয় বিষয় হচ্ছে বাসিন্দাদের জন্যে পরিষ্কার জলের বন্দোবস্ত করা এবং তাদের বাসস্থান-গুলিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা।

নিজেকে আমি পৌরজীবনে অনুরাগী ব'লে বিবেচনা করি। আমার মনে হয় যে, কারও পক্ষে পৌরসভার সদস্য হ'তে পারা বিশেষ ভাগ্যের কথা।

স্বার্থপ্রণোদিত হয়ে বা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে কেউ যেন পৌরসভার সদস্যপদ গ্রহণ করতে না যান। সেবার মনোবৃত্তি নিয়ে তাঁরা যেন তাঁদের পবিত্র দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ঝাড়ুদার ব'লে নিজেদের পরিচয় দিতে তাঁরা যেন গর্ব অনুভব করেন। আমার মাতৃভাষায় পৌরসভাকে বলা হয় "কাচরা পট্টি", যার শব্দগত অর্থ হচ্ছে ঝাড়ু দেবার বিভাগ, এবং সত্যসত্যই পৌরসভা যদি নগরের সাধারণ এবং সামাজিক জীবনের সকল বিভাগে সম্মার্জকের কাজ ক'রে তার মলিনতা দূর না করে, পৌরসভা যদি সাফাইয়ের প্রেরণার দ্বারা উদ্বুদ্ধ না হয়, এবং শুধু বাহ্য পরিচ্ছন্নতা নয়, নগরের অভ্যন্তরীণ পরিচ্ছন্নতার প্রতি দৃষ্টিপাত না করে, তবে সে পৌরসভার কোন মূল্য নেই।

কোন পৌরসভা বা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-প্রতিষ্ঠানভুক্ত এলাকায় যদি আমি করদাতা হতাম, তবে চতুর্গুণ প্রতিদানের সম্ভাবনা না থাকলে নিজে তো অতিরিক্ত কর হিসাবে এক পয়সাও দিতাম না, এবং অপরকেও অনুরূপ কাজে প্ররোচিত করতাম। প্রতিনিধি হিসাবে যাঁরা বিভিন্ন পৌরসভা এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করেন, তাঁরা সম্মানের জন্য বা পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মত্ত হবার জন্য সেখানে যান না। তাঁরা যান প্রেমপূর্ণ সেবা দিতে। এ সেবা অর্থের উপর নির্ভর করে না। আমাদের দেশ দরিদ্র। সত্যকার সেবা-ভাব দ্বারা আমাদের পৌরসভার সদস্যবর্গ যদি অনুপ্রাণিত হন, তবে নিজেদের তাঁরা অবৈতনিক ঝাড়ুদার, ভাঙ্গী এবং পথ-নির্মায়কে রূপায়িত করবেন এবং এর জন্য গর্ব অনুভব করবেন। তাঁদের যে সব সহকর্মী কংগ্রেস-প্রার্থী হিসাবে নির্বাচিত হননি, তাঁদেরও তাঁরা একাজে সহযোগিতা করার জন্য আহ্বান জানাবেন এবং আদর্শে যদি নিজেদের অটুট আস্থা থাকে তবে তাঁদের উদাহরণ তাঁদের ভিতরেও সাড়া জাগাবে। এর জন্য পৌরসভার সদস্যকে সারাক্ষণের কর্মী হিসাবে কাজ করতে হবে। এতে তাঁর নিজের কোন স্বার্থ থাকবে না। এর পরবর্তী কাজে হবে বিভিন্ন পৌরসভা বা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-প্রতিষ্ঠানের এলাকাভুক্ত অঞ্চলের যাবতীয় প্রাপ্তবয়স্কের হিসাব নেওয়া। পৌরসভার কার্যে প্রত্যেককে সহযোগিতা করতে আহ্বান জানানো হবে। এর একটি যথোপযুক্ত তালিকা রাখতে হবে। দারিদ্র্যবশত যে সব সুস্থ সবল ব্যক্তি পৌরসভাকে আর্থিক সাহায্য দিতে অসমর্থ, এর বদলে বিনামূল্যে তাদের কায়িক শ্রম দিতে বলা যেতে পারে।

সঙ্গীত

সত্য কথা বলতে গেলে সঙ্গীত এক সু-প্রাচীন ও পবিত্র চারুকলা। সামবেদের মন্ত্রসমূহ সঙ্গীতের খনি এবং সঙ্গীত ব্যতিরেকে কোরানের কোন আয়াৎ গান করা যায় না। ডেভিডের "সাম" বা ভক্তিমূলক সঙ্গীত মনকে আনন্দলোকে নিয়ে যায় এবং সামবেদের সুরেলা মন্ত্রের কথা মনে করিয়ে দেয়। আমরা যেন এই চারুশিল্পের পুনরুদ্ধার করি ও এই সঙ্গীতধারার পৃষ্ঠপোষকতা করি।

দল

কোন মতবাদই সত্যবিচারের একচেটিয়া অধিকার দাবী করতে পারে না। আমরা সবাই ভুল করতে পারি এবং কখনও কখনও আমাদের পূর্বতন অভিমত বদল করতে হয়। আমাদের এই বিশাল দেশে সব রকমের সৎ অভিমতের স্থান থাকা উচিত। সুতরাং নিজেদের ও অপরের প্রতি ন্যূনতম কর্তব্য হিসাবে আমাদের বিরুদ্ধপক্ষীয়ের অভিমত বোঝার চেষ্টা করা উচিত এবং সেই অভিমত যদি গ্রহণ করা সম্ভব নাও হয় তাহলে তার কাছে নিজের অভিমতের প্রতি যতটুকু শ্রদ্ধা আশা করে থাকি তাঁর অভিমতকে অন্ততঃ ততটুকু শ্রদ্ধা করা কর্তব্য। এ হল সুস্থ জনজীবন এবং সেই কারণে স্বরাজের যোগ্যতার অন্যতম অপরিহার্য শর্ত।

রাজনীতি

সত্য সুন্দরের বিশ্বজনীন ও সর্বব্যাপী প্রকাশকে প্রত্যক্ষ করতে হলে মানুষকে তুচ্ছতম সৃষ্টিকেও নিজেরই মত ভালবাসার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। আর যিনি পূর্বোক্ত লক্ষ্যের সাধক তিনি জীবনের কোন ক্ষেত্র থেকেই দূরে থাকতে পারেন না। এইজন্য সত্যের প্রতি আমার আনুগত্য আমাকে রাজনীতির ক্ষেত্রে টেনে এনেছে। নির্দ্বিধায় অথচ যথোচিত নম্রতা সহকারে আমি তাই বলতে পারি যে যাঁরা এই কথা বলেন যে ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির কোন সম্বন্ধ নেই তাঁরা ধর্ম কি তা জানেন না।

জনসাধারণের অর্থ

জনসাধারণের কাছ থেকে প্রাপ্ত প্রতিটি পয়সার সঠিক হিসাব যদি আমরা না রাখি এবং সেই পয়সার সদ্ব্যয় যদি না করি তাহলে সার্বজনিক কার্যকলাপের ক্ষেত্র থেকে আমাদের বিদায় নেওয়া উচিত।

সার্বজনিক প্রতিষ্ঠান সমূহের অর্থ ভারতবর্ষের দরিদ্র জনসাধারণের এবং তাদের চেয়ে দরিদ্র মানুষ পৃথিবীতে আর নেই। সুতরাং জনসাধারণের অর্থ সম্বন্ধে আমাদের আরও সজাগ ও সাবধান হতে হবে ও সে পয়সার আরও যত্ন নিতে হবে। জনসাধারণের কাছ থেকে যে অর্থ সংগৃহীত হয় তার প্রতিটি পাই-এর হিসাব দিতে প্রস্তুত থাকতে হবে।

সার্বজনিক প্রতিষ্ঠান

জীবনে যেসব বহুসংখ্যক সার্বজনিক প্রতিষ্ঠান আমাকে পরিচালনা করতে হয়েছে তার দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমার মনে এই বিশ্বাস দৃঢ়মূল হয়েছে যে স্থায়ী অর্থকোষের ভিত্তিতে কোন সার্বজনিক প্রতিষ্ঠান চালান ভাল নয়। স্থায়ী অর্থকোষ স্বয়ং প্রতিষ্ঠানের নৈতিক অধোগতির লক্ষণ।...স্থায়ী অর্থকোষের ভরসায় পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহ অনেক সময় জনমতকে উপেক্ষা করে থাকে এবং প্রায়শঃ তারা জনমতের বিরুদ্ধে কাজ করে থাকে। আমাদের দেশে প্রতি পদে আমরা এরকম দেখে থাকি। অনেক তথাকথিত ধর্মীয় ট্রাস্ট হিসাব দাখিল করা বন্ধ করেছে। ট্রাস্ট্রিরা স্বয়ং মালিক হয়ে বসেছেন এবং তাঁরা আর কারও কাছে দায়ী নন।...যে প্রতিষ্ঠান জনসমর্থন হারায় তার অস্তিত্ব বজায় রাখার কোন অধিকার নেই।

আমাদের আর্থিক অবস্থা বিপন্ন নয়, বিপন্ন আমাদের নৈতিক অবস্থা। যে আন্দোলন বা কর্মসূচী কর্মীদের চরিত্রের পবিত্রতা-রূপী দৃঢ় ভিত্তির উপর অধিষ্ঠিত, অর্থাভাবে তার অকাল বিলুপ্তির আশঙ্কা কদাচ থাকে না।... অন্যান্য সূত্র থেকে আমাদের সহায়তা পেতে হবে। আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজ এবং এমন কি দরিদ্ররাও বহু ভিক্ষুক ও বহু মন্দিরের পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকেন। সুতরাং তাঁরা কেন কয়েক জন ভাল কর্মীর ভরণপোষণের দায়িত্ব নেবেন না? বাড়ী বাড়ী থেকে আমাদের চাইতে হবে, বিহার ও মহারাষ্ট্রের মত চাল ও পয়সা ওঠাতে হবে।...তবে খেয়াল রাখবেন যে সব কিছু নির্ভর করবে আপনাদের উদ্দেশ্যের একাগ্রতা, কর্মনিষ্ঠা এবং চরিত্রের পবিত্রতার উপর। আমাদের নিঃস্বার্থতা সম্বন্ধে সংশয়-বিহীন না হলে জনসাধারণ সাহায্য করবে না।

জনমত

একমাত্র জনমতই সমাজকে পবিত্র ও সুস্থ রাখতে পারে।

জনমত প্রস্তুত করার পূর্বে আইন প্রণয়ন করলে অনেক সময় তার পরিণাম অপ্রয়োজনীয় থেকেও খারাপ হয়ে থাকে।

সুস্থ জনমতের এমন একটা প্রভাব আছে, যার পূর্ণ তাৎপর্য আমরা এখনও উপলব্ধি করতে পারিনি। তবে হিংস ও মারমুখী হয়ে উঠলে জনমতও অসহ্য বোধ হয়।

জনসেবক

জনসেবক যতদিন যোগ্যতা সহকারে একটি প্রশাসন যন্ত্রের অঙ্গ স্বরূপ কাজ করে, ততদিন তার চরিত্র সম্বন্ধে মাথা না ঘামাবার একটা মনোভাব বর্তমান আধুনিক লোকসমাজে প্রকট হচ্ছে। বলা হয়ে থাকে চরিত্র মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার। অনেকে এই মতে বিশ্বাসী জানা সত্ত্বেও আমি কখনও এ মতের সমর্থন করতে পারিনি—একে গ্রহণ করা তো বহু দূরের কথা। ব্যক্তিগত চরিত্রকে যেসব প্রতিষ্ঠান বিবেচনা যোগ্য বিষয় বলে মনে করে না, ভবিষ্যতে তাদের বহু বিপদের সম্মুখীন হতে আমি দেখেছি।

সময়ানুবর্তিতা

দেশের নেতা ও কর্মীরা নিখুঁত সময়ানুবর্তী হলে নিঃসন্দেহে তা জাতীয় স্বার্থের পক্ষে লাভজনক ব্যাপার হবে।...মানুষ যতটা পারে তার চেয়ে বেশী কাজের আশা কেউ তার কাছে রাখে না। দিনের শেষে যদি দেখা যায় যে উদ্বৃত্ত কাজ রয়েছে অথবা যদি দেখা যায় যে স্নান আহার ছেড়ে না দিলে অথবা নিদ্রা বা বিশ্রাম বর্জন না করলে নির্ধারিত কাজ করা যাচ্ছে না, তাহলে বুঝতে হবে যে কোথাও না কোথাও অব্যবস্থা হচ্ছে। আমার মনে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে আমরা যদি সময়নিষ্ঠ হবার অভ্যাসের অনুশীলন করি এবং যদি বিধিবদ্ধ কর্মসূচী অনুসারে কাজ করি তাহলে জাতীয় যোগ্যতার মান উর্ধ্বমুখী হবে। দ্রুত আমরা আমাদের লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হব এবং কর্মীরাও সুস্থ ও দীর্ঘজীবী হবেন।

উদ্বাস্তুদের প্রতি

নিপীড়িত প্রত্যেকটি ব্যক্তি যদি শারিরীক দৃষ্টিতে অক্ষম না হন, তাহলে পূর্ণমাত্রায় কাজ করে তার বিনিময়ে মানুষের মত খাদ্য বস্ত্র ও বাসস্থানের সংস্থান করবেন। এই ভাবে তাঁরা শ্রমের মর্যাদা উপলব্ধি করবেন ও কারও উপর ভার স্বরূপ হবেন না। নরনারী নির্বিশেষে

এ ব্যাপারে সবাই সমান। পায়খানা পরিষ্কার ও ঝাড়ু দেওয়ার মত সাফাই-এর কার্যে সবাই অংশ গ্রহণ করবেন। কোন কাজকে ছোট বা বড় মনে করা হবে না। এই রকম সমাজে নিকর্মা অলস অথবা বাউণ্ডুলেদের কোন স্থান হবে না।

নদ নদী

এদেশে গঙ্গা যমুনার সংখ্যা একটি করে নয়। আমাদের নিবাস-ভূমি এই দেশের জন্য আমাদের কত ত্যাগ স্বীকার করতে হবে তার স্মারক হল এই সব গঙ্গা যমুনা। গঙ্গা যমুনা যেমন প্রতি মুহূর্তে নিজেদের শুদ্ধ করে চলেছে দেশের এই অসংখ্য গঙ্গা যমুনাও তেমনি আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে মাতৃভূমির সেবার জন্য আমাদের প্রতি মুহূর্তে আত্মশুদ্ধির সাধনা চালিয়ে যেতে হবে। আধুনিকতার প্রবাহে দেশের নদ-নদীর সঙ্গে আমাদের প্রধান সম্বন্ধ হল আমাদের ময়লা আবর্জনা ঝেঁটিয়ে নদীতে ফেলা এবং যাত্রী ও মালবাহী নৌকা ও জাহাজ ইত্যাদি চালিয়ে সেগুলিকে আরও নোংরা করে তোলা। নদীর ধারে বেড়াবার ও শান্ত সমাহিত ভাবে তাদের কুলুকুলু স্রোতধারার মর্মবাণী শ্রবণ করার সময় আমাদের নেই।

—সমাপ্ত—

SOME IMPORTANT BOOKS—BY GANDHIJI

		Rs.p.
1.	My Experiment with Truth	4·00
2.	India of My Dreams	2·50
3.	My Religion	2·00
4.	Sarvodaya	2·00
5.	Truth is God	2·00
6.	Hind Swaraj	0·50
7.	Delhi Diary	3·00
8.	Satyagraha in South Africa	3·00
9.	Selections from Gandhi : „ Prof. N. K. Bose	2·00

To be had of

NAVAJIVAN PUBLISHING HOUSE

Ahmedabad—14

*

অনুবাদকের অন্যান্য গ্রন্থ

আমার ধর্ম	: মো. ক. গান্ধী
ছাত্রদের প্রতি	: ”
শিক্ষা	: ”
পল্লী পুনর্গঠন	: ”
আমার জীবনকাহিনী	: ”
জীবন-জিজ্ঞাসা	: আইনস্টাইন
গান্ধী ও মার্কস	: কিশোরলাল মশরুওয়ালা
বিজ্ঞান স্বাধীনতা ও শান্তি	: আলডুস হাক্সলে
এপ অ্যাণ্ড এসেন্স	: ”
সর্বোদয় ও শাসনমুক্ত সমাজ	: মৌলিক প্রবন্ধ গ্রন্থ

প্রচ্ছদচিত্র গান্ধী-স্মারক-নিধির সৌজন্যে
আলোকচিত্র-শিল্পী : শ্রীমনুজ দাস